বীরেশ্বর বিবেকানন্দ
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

॥ প্রথম খণ্ড ॥

3.12.58.

সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ১২

প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদপট : সমর দে

মূল্য : পাঁচ টাকা

শোভন সংস্করণ : সাড়ে সাত টাকা

প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৬৫

মুদ্রক : প্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

"আমরা হচ্ছি নর, ও নরের মধ্যে ইন্দ্র। পাতাল-ফোঁড়া শিব বসানো শিব নয়। যেন খাপখোলা তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্ছে। বেশি আসে না, সে ভাল। বেশি এলে আমি বিহ্বল হই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

"ত্যাগী না হলে তেজ হয় না। সকলে ভাবো, আমরা অনন্তবলশালী আত্মা—দেখ দেখি কি বল বেরোয়। কিসের দীনহীনা? আমি ব্রহ্ম-ময়ীর বেটা। কিসের রোগ কিসের ভয় কিসের অভাব? নিজের মনে মনে বলো, আমি আত্মা, আমি পূর্ণ, আমার আবার রোগ কি। বলো ঘণ্টাখানেক দুচার দিন। সব রোগবালাই দূর হয়ে যাবে।"

বিবেকানন্দ

"পড়েছ মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আমি বলি দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব। দরিদ্র মূর্খ অজ্ঞানী কাতর এরাই তোমার দেবতা হোক। যে ধর্ম গরিবের দুঃখ দূর করেনা, মানুষকে দেবতা করেনা তাকি আবার ধর্ম?"

বিবেকানন্দ

ভূমিকা

ক্লৈব্যের দেশে অনন্ত বীর্য, জাড্যের দেশে অমিত কর্ম, মূঢ়তার দেশে জ্বলন্ত জ্ঞান, বিবেকানন্দ আবির্ভূত হলেন বাংলাদেশে পুরুষসিংহরূপে। নয়নে বিভাবসু কণ্ঠে পাঞ্চজন্য। এসে ডাক দিলেন ঘরে ঘরে বজ্রের মত উদাত্তনির্ঘোষে : উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবোধত। ওঠো, জাগো, যতক্ষণ না চরমতমকে প্রাপ্ত হও ততক্ষণ পর্যন্ত বিরত হয়ো না নিবৃত্ত হয়ো না। বীজের মধ্যে সংহত ভাবে নিগূঢ় ভাবে রয়েছে যে বনস্পতি তাকে পত্রেপুষ্পেফলে স্বাদেগন্ধেশোভায় উচ্ছ্বসিত করো।

'আমি এক ধর্ম মানি, তার নাম পরোপকার।' বললেন স্বামীজি। আর সেই পরোপকার শুধু দুর্গতের দুর্দশামোচনই নয় মানুষকে তার আত্মার অবমাননা থেকে উদ্ধার করা। দীনহীন ভাগ্যের কার্পণ্যে মানুষ যে ক্ষুদ্র-খর্ব নয়, নয় সে যে অস্পৃশ্য অন্ত্যজ অধম পঞ্চম, সে যে তেজোময় অমৃতপুরুষ, তার অমোঘ মহিমা যে অমর জ্যোতিতে উদ্‌বারিত মানুষকে সেই সুমহান অধিকারে আরূঢ় করা। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে স্বীকার করা আবিষ্কার করা অভ্যর্থনা করা। বিশ্বের বিস্তারই বিষ্ণু। অকিঞ্চনের মধ্যেও অনন্ত-ঐশ্বর্য নারায়ণ। তাই স্বামীজি সোহহং বলে নিজের কাজ গুছিয়ে সরে পড়েননি, মানুষকে তার পরমতম সত্তায় পৌঁছে দেবার সাধন করেছেন। মানুষ তো শুধু অন্নের প্রত্যাশী নয়, পরমান্নের প্রসাদেরও অংশীদার। তাই বিবেকানন্দের আদর্শ জীবসাম্য নয়, শিবসাম্য।

কর্ম জ্ঞান ভক্তি ও প্রেমের জ্বলন্ত সমন্বয়। কর্ম সন্ধান জ্ঞান প্রাপ্তি ভক্তি আস্বাদন আর ভক্তির পরিপক্ক, প্রগাঢ় অবস্থাই প্রেম। কর্ম আদিকাণ্ড উত্তরকাণ্ড প্রেম। কর্ম ছাড়া জ্ঞান নেই জ্ঞান ছাড়া ভক্তি নেই ভক্তি ছাড়া প্রেম নেই। আর বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।

সূর্য-চন্দ্র একসঙ্গে। স্বামীজি একদিকে সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সূর্য, আরেকদিকে সর্বপ্রেমমোহনাত্মা সুধাংশু।

কিন্তু আমাদের কি হবে? আমাদের ত্যাগ নেই যোগ নেই জ্ঞান নেই ভক্তি নেই। শুষ্ক কাষ্ঠের অন্তর থেকে কি করে মুক্ত দেব অব্যক্ত অগ্নিকে? স্বামীজি বললেন, তুমিও নিঃস্ব নও, তোমারও অস্ত্র আছে, তার নাম কর্ম। শারীরং কেবলং কর্ম। কর্ম করেই জাগাও পুরুষকারকে। পুরুষকার জাগলেই জাগবে ঈশ্বরকৃপা, প্রজ্ঞানচক্ষু। আর সেই জ্যোতির্ময় জ্ঞান থেকেই শুদ্ধা ভক্তি। যতক্ষণ মলয় হাওয়া না আসে, পাখা চালিয়ে যাও। যতক্ষণ জল না পাওয়া যায় ততক্ষণ খুঁড়ে যাও মৃত্তিকা।

এ বই সেই জল পাবার জন্যে খননের চেষ্টা।

অচিন্ত্যকুমার

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

'বড় হয়ে কী হবি রে বিলে।' বাবা হঠাৎ জিগগেস করলেন।

বাবার চোখের দিকে তাকাল একবার বিলে। বললে, 'কোচোয়ান হব।'

তার মানে, গাড়ি চালাব। চাবুক মেরে ঘোড়া ছোটাব। কিসের চাবুক? চেতনার চাবুক। ঘোড়া দুটো কে-কে। ধর্ম আর কর্ম। আর গাড়ি! গাড়ি হচ্ছে আমাদের এই অলস দেশ। গাড়ি তো নয় গাধাবোট।

সাত বছর বয়সে অমনি একটা স্বপ্ন দেখেছিল ঐ ছেলে। শিবপুজো করে তাকে পেয়েছেন বলে মা তার নাম রেখেছিলেন বীরেশ্বর। সেই থেকেই দাঁড়িয়ে গেল বিলে।

অন্নপ্রাশনের সময় নতুন নামকরণ হল। নাম দাও নরেন্দ্র। নরের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ তার নাম আবার কী হবে ও ছাড়া!

স্নেহভরে বলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ : 'ও আমাদের গ্রাহ্যই করে না। কেনই বা করবে বলো? আমরা হচ্ছি নর, আর ও হচ্ছে আমাদের ইন্দ্র, আমাদের রাজা, আমাদের অধিপতি।'

ভালো নাম নতুন হল বটে কিন্তু ডাক-নাম থেকে গেল ঐ বিলে।

ঠাকুর বলেন, 'লরেন!'

বাপ বিশ্বনাথ দত্ত, মা ভুবনেশ্বরী। বাপ হাইকোর্টের এটর্নি, দেদার রোজগার। দানেধ্যানে মুক্তহস্ত। গানে-বাজনায় উৎসাহী। বাইবেল পড়েন আর হাফেজ আবৃত্তি করে শোনান। আর মা? রামায়ণ-মহাভারত পড়েন, সংসারের জাঁতা ঘোরান আর পুত্রের আশায় শিবপুজো করেন।

স্বয়ং শিব এসে জন্মালো তাঁদের ঘরে। গৌর মুখার্জি লেনের বাড়িতে। পৌষ মাসের শেষ দিনে, মকর সংক্রান্তিতে। সোমবারে। সূর্যোদয়ের ছ'মিনিট আগে।

বাঙলা সাল বারোশ উনসত্তর। ইংরেজি সাল আঠারোশ তেষট্টি। তারিখ ১২ই জানুয়ারি।

শিব নয় তো কি। দুর্দান্ত ছেলে। তাণ্ডব সুরু করে দিয়েছে সংসারে। এ জিনিস ভাঙছে, ও জিনিস ছুঁড়ে ফেলছে। সব এলোমেলো তছনছ করে দিচ্ছে। আদর দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে কিছুতেই শান্ত করা যাচ্ছে না। বাড়ির লোকজন সবাই হাক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মা ভুবনেশ্বরী বলছেন বিরক্ত হয়ে, 'শিব চাইলাম, এ যে দেখছি এক ভূত এসে জন্মালো।'

কি করে ঠাণ্ডা করা যায়! কি করে বন্ধ করা যায় এই উদ্দন্ড নৃত্য!

এক উপায় শুধু আছে। কি করে মাথায় এল ভুবনেশ্বরীর। 'শিব' মন্ত্র আউড়ে খানিকটা ঠাণ্ডা জল ছেলের মাথায় ঢেলে দিলেন। ব্যস, ফুসমন্তরে ঠাণ্ডা। আর চীৎকার নেই, জিনিস ছোঁড়াছুঁড়ি নেই। একেবারে ভালোমানুষ ভোলানাথ।

'এমনি ধারা দুষ্টুমি যদি করিস, শিব তোকে নিয়ে যাবে না কৈলাসে।' মা তাকে ভয় দেখান।

এ একটা সত্যি ভয়ের কথা সন্দেহ নেই। কেননা বিলের ভারি শিব হবার ইচ্ছে। শিব হয়ে ষাঁড়ের পিঠে চড়ে কৈলাস বেড়ানো।

এক টুকরো গেরুয়া কাপড় পরে সেদিন বসেছে চুপচাপ। বসেছে আসন-পিঁড়ি হয়ে, চোখ বুজে।

কি যেন ঘটবে অভাবনীয়।

মা চমকে উঠে জিগগেস করলেন, 'এ কি হচ্ছে রে বিলে?'

বিলে নিশ্চিন্তকণ্ঠে জবাব দিলে, 'আমি শিব হয়েছি।'

কে ওকে বলে দিয়েছে শিরদাঁড়া খাড়া করে চোখ বুজে ধ্যান করলেই মাথায় জটা গজায়। শুধু গজায় না, গাছের শেকড়ের মত মাটির ভিতরে গিয়ে ঢোকে। থেকে-থেকে চোখ মেলে তাকায়, কত বড় জটা না-জানি নামল পিঠ বেয়ে।

'মা এত ধ্যান করছি, জটা হচ্ছে কই?' মার কাছে এসে অভিযোগ করে।

মা বলেন, 'তুমি ধ্যানই করো বাপু শান্ত হয়ে, তোমার জটায় কাজ নেই।'

সাধু-সন্তরা আসে ভিক্ষে করতে। কারু মাথায় মস্ত জটা। তাদের দেখে বিলে মহাখুশি। কৈলাসের খবর জিগগেস করে। এই শীতে শিবই বা কেমন আছেন! যদি ভিক্ষে-টিক্ষে না দাও খোকাবাবু, কি করে কৈলাসের ভাড়া জোটাই! ঠিকই তো! মূল্যবান কী জিনিস আর বিলে দিতে পারে, পরনে আছে একখানা ছোট নববস্ত্র, তাই দিয়ে দিলে অকাতরে।

'কাপড় কি হল রে বিলে?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে মা জিগগেস করলেন।

'সাধুকে দিয়ে দিয়েছি।' পুলকিত বিস্ময়ে বললে বিলে, 'জানো মা, কাপড় বেচে পয়সা পাবে। পয়সা জমিয়ে কৈলাসের টিকিট কাটবে—'

এ আরেক নতুন বিপদ হল দেখছি। তাই দোরগোড়ায় সাধু এসে দাঁড়ালেই মা তাকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখেন। মা'র একার সাধ্যি নেই পারেন তার সঙ্গে, তাই তাকে শাসন-দমন করবার জন্যে দু-দুটো ঝি রেখে দিয়েছেন বিশ্বনাথ। তিনজনের সঙ্গে সে একা কি করে এঁটে উঠবে? ঘরের মধ্যে তাকে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজায় শেকল লাগিয়ে দেয় অনায়াসে।

তা দিক। কিন্তু ঘরের জানলা তো খোলা আছে। তারই মধ্যে দিয়ে ঘরের জিনিস ছুঁড়ে ফেলতে লাগল বাইরে। কৈলাসগামী সাধুদের উদ্দেশে। নাও তোমরা সব কুড়িয়ে, জামা-কাপড়, থালা-গেলাশ, বই-খাতা—সব তোমাদের ভিক্ষে দিচ্ছি।

তখন খুলে দাও দরজা। শিব বলে মাথায় আবার জল ঢালো।

বাড়িতে এক রাজ্যের পোষা প্রাণী। দুধেল গাই, ছাগল, ময়ূর, খরগোশ। নানা রঙের পাখি, নানা জাতের পায়রা। একটা বাঁদর। যত ভাব এদের সঙ্গে। আর ভাব, বাবার গাড়ি হাঁকায় যে কোচোয়ান সেই কোচোয়ানের সঙ্গে। মাথায় পাগড়ি, হাতে চাবুক, কেমন স্বপ্নের মত চেহারার সে লোকটা! কেমন জ্বলজ্বলে। শিব তো ষাঁড়ের উপর চড়ে, চলে ঢিমে-তেতলায়। তার চেয়ে কোচোয়ান অনেক ভালো। আমি কোচোয়ান হব। বেগবান ঘোড়া ছোটাব।

মার কাছে বসে রামায়ণ পড়ে। রামকে বড় ভালো লাগে। মাটির একটি রাম-

সীতার যুগল মূর্তি কিনে এনেছে মেলা থেকে। তাই নিরালায় বসে পুজো করে তার খেয়ালমত।

শুধু কোচোয়ানের সঙ্গে নয়, সইসের সঙ্গেও তার বন্ধুতা। কিন্তু সইসের বড় কষ্ট। কেন, কী হল তোমার? আর কি হবে, সংসারের ঝামেলা। কি কুক্ষণেই যে বিয়ে করেছিলুম, বিয়ের থেকেই সংসার, আর তার থেকেই যত দুঃখ, যত ঝকমারি।

ঠিকই তো। রাম-সীতারও যত দুঃখ সব এই বিয়ে হয়েছিল বলে। তবে? চলবেনা রাম-সীতা, যারা দুঃখ পাবার জন্যে জেনে-শুনে বিয়ে করে চলবেনা তাদেরকে ভালোবাসা। আস্তাবলের সইস বিলের মন খাঁটি করে দিয়েছে—বিয়ে ভালো নয়, বিয়ে ঝঞ্ঝেটে।

চলবেনা যুগল মূর্তি। তার চেয়ে শিব ভালো, একাকী শিব।

রাম-সীতার মূর্তি ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তায়। এতটুকু দ্বিধা করল না। তার আদর্শের সঙ্গে যার মিল নেই তাকে সে এমনি করেই নস্যাৎ করতে পারে। স্বপ্ন ভেঙে গেল বলে আফসোস করেনা। হোক তা মধুর, হোক তা স্বর্ণময়, সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি চাই। মুক্তি চাই সমস্ত আসক্তি থেকে।

বিলে যে নিজেই শিব।

ঠাকুর বলেন, 'বসানো শিব নয়, পাতাল-ফোঁড়া শিব।'

২

জাত যাবে, জাত গেল—এই কেবল কানে আসে। জাত যে কি জিনিস, কি করে কোন পথ দিয়ে যে চলে যায় ভেবে পায় না বিলে। ও কি টাকা-কড়ি যে হারিয়ে যায়? না, ও কি জামাকাপড় যে ছিঁড়ে যায়? চামড়ার মতন ও কি গায়ে লেগে থাকে?

নানা জাতের মক্কেল আসে বাবার কাছে। বৈঠকখানায় তাদের জন্যে আলাদা-আলাদা হুঁকো। এটা বামুনের এটা শুদ্দুরের ওটা মুসলমানের। এ যদি ওরটাতে মুখ দেয় তাহলেই জাত যায়। ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে যায় বোধহয়। জানতে ভারি কৌতূহল হল বিলের। আমি তো কায়েত, মুসলমানের হুঁকোতে টান দিলে জাত নিশ্চয়ই বেরিয়ে যাবে মুখ দিয়ে, কিংবা নাক দিয়ে নিশ্বাসের সঙ্গে। দেখি বেরুবার সময় আবার তাকে ধরতে পারি কিনা।

মুসলমানের হুঁকোতেই টান দিলে সটান।

'ও কি হচ্ছে রে বিলে?' বাবা কখন ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে।

'দেখছি কোনখান দিয়ে জাত যায়!'

বিশ্বনাথ তো থ।

জাত যায় না। জাত বলে কিছু নেই। যাকে ছোট করে রেখেছি, যাকে ছুঁইনা, সেও আমাকে ছোট করে রেখেছে, সেও আমাকে ছোঁয় না। কিন্তু যদি তাকে ছুঁই,

সে আমার হাত ধরে পাশে এসে দাঁড়ায়। প্রদেশ তখন দেশ আর দেশ তখন মহাদেশ হয়ে ওঠে।

প্রতিরাত্রে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে বিলে। চোখ বুজলেই দু-ভুরুর মাঝখানে একটা আলোর বিন্দু ফুটে ওঠে, সেটা ক্রমশ ঘোরে, বড় হয়, ফেটে পড়ে অসহ্য ঔজ্জ্বল্যে সর্বদেহ স্নান করিয়ে দেয়। ঘুম আসবার এইটেই বুঝি স্বাভাবিক রীতি, এই প্রথমটা মনে হয়। সমবয়সীদের জিগগেস করে, হ্যাঁ রে, ঘুমোবার সময় কপালের মধ্যে আলো দেখিস? ঘুম মানেই তো অন্ধকার, অন্ধকার দেখি। এ আরেক ভাবনা ধরল। কে এর উত্তর দেবে?

'নরেন, ঘুমিয়ে পড়বার আগে আলো দেখিস?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'তুমি কি করে জানলে?'

'যে করেই জানিনা কেন, দেখিস কিনা?'

'দেখি।'

উৎফুল্ল হলেন ঠাকুর। বললেন, 'তোর এমন চক্ষু, তুই দেখবিনে?'

পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে নানারকম খেলা খেলে বিলে। একটা খেলা হচ্ছে ধ্যান-ধ্যান খেলা। তার মানে, সবাই চোখ বুজে বসে পায়ের উপর পা মুড়ে, আর কৈলাস-বাসী শিবের কথা ভাবে। কতক্ষণ পরে বিলের কাছে তা আর খেলা থাকে না, একটা অপূর্ব তন্ময়তায় তা সত্য হয়ে ওঠে। আসন ছেড়ে আর উঠতেই চায় না। সেদিন একটা সাপ এসেছে সামনে। 'সাপ—' বলে ভয় পেয়ে সঙ্গীরা সব ছুট দিলে, কিন্তু বিলে নির্বিচল। নাগ যার শিরোভূষণ সেই মহাদেবের আকর্ষণেই এসেছে বুঝি এই বিষধর। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে সাপ আবার চলে গেল এঁকে-বেঁকে।

'সবাই ছুটে পালাল, তুই উঠলি না যে?' বাবা জিগগেস করলেন।

'কে জানে! সাপ যে এসেছে শুনতেই পাইনি। আমি এক আনন্দসাগরে ডুবে ছিলাম।' চারপাশে তাকালো একবার বিলে। 'কিন্তু কই, সাপ আমাকে কিছু করল না তো!'

ছ-বছর বয়সে বাবা পাঠশালায় পাঠিয়েছে। কিন্তু ছেলের মুখে বকাটে বুকনির আভাস পেয়ে বিশ্বনাথ প্রমাদ গুণলেন। ছাড়িয়ে আনলেন ইস্কুল থেকে। দরকার নেই আর যার-তার সঙ্গে মিশে যা-তা কথা শিখে। বাড়িতে মাস্টার রাখলেন। একা-একা পড়বে কি, পাড়ার কটি ছেলে জোটালো। দল বেঁধে পড়তে না পেলে সুখ নেই। যা কিছু করো দল বেঁধে করো। দলের দলপতি হয়ে করো।

আরেক রকম খেলা ছিল বিলের, তার নাম 'রাজা-উজির' খেলা। বাড়ির পুজোর দালানের সব চেয়ে উঁচু যে সিঁড়ি সেইটে হচ্ছে সিংহাসন। আর, সন্দেহ কি, সেখানে বিলে ছাড়া আর কারু বসবার অধিকার নেই। তার মানে সব সময়ে বিলেই হচ্ছে রাজা, আর সকলে পাত্র-মিত্র, মন্ত্রী-যন্ত্রী, সৈন্য-সেনাপতি। সিংহাসনে বসে ফরমান জারি করছে, বিচার করছে, দণ্ড-মুণ্ডের ব্যবস্থা করছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটাচ্ছে, সন্ধি-শান্তি করছে। আর সবাই বিলের হুকুমে ছুটোছুটি করছে, খাটছে-পিটছে, বিলে সিংহাসনে দৃঢ়াসীন। সে দীন-দুনিয়ার মালিক, সমুদ্রাম্বরা পৃথিবীর

সম্রাট।

অন্তত বাড়ির মাস্টারের কাছে তাই। যা একবার শোনে তাই অবিকল মুখস্থ বলে দেয় বিলে। সাত বছর বয়সে প্রায় সমস্ত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ তার ওষ্ঠাগ্রে। রামায়ণের অনেক কান্ড মহাভারতের অনেক পর্বও তাই। রামায়ণ গান করে এমন এক দল একবার এসেছিল বাড়িতে। গাইছে আপন মনে, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বিলে তাদের সংশোধন করলে। বই খুলে দেখালে তাদের ভুল হচ্ছে পাঠে। গাইয়ের দল তো অবাক্। কে এ শ্রুতিধর! কে এ স্মৃতিমান!

খেলতে-খেলতে পুজোর দালানের বারান্দা থেকে পড়ে গেল বিলে। পড়ে গেল নিচে, একটা পাথরের উপর। পড়ে কপাল ফেটে গেল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ডান চোখের উপরে কপালে ছিল সেই কাটা দাগ।

ঠাকুর বললেন, 'ঐ আঘাতে ওর শক্তি বাধা পেয়েছে, নইলে ও জগৎসংসার চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারত!'

আমি নিজেকে, নিজের অহংকে চূর্ণবিচূর্ণ করব। নেব তোমার মধ্যে [illegible] আশ্রয়, পরম আশ্রয়।

'এই দ্যাখ্, দেখেছিস আমার হাতের রেখা?' সঙ্গীদের সামনে নিজের ডান হাত মেলে ধরে বিলে। 'বল তো এ রেখার মানে কি?'

কি মানে কে জানে! সবাই তাকিয়ে থাকে হাঁ করে।

'এ রেখার মানে হচ্ছে আমি সন্নেসী হব।' কত বড় গর্বের কথা, চোখেমুখে দীপ্তি নিয়ে বলে। সন্নেসী হওয়া মানে যেন কত বড় দিগ্বিজয়ী হওয়া।

হ্যাঁ; তুই সন্নেসী হবি? তাহলেই হয়েছে। সঙ্গীরা টিটকিরি দেয়। বাপ মস্ত এটর্নি, আছিস রাজার হালে, কুসুমের বিছানায়। ফুলের ঘায়ে যারা মূর্ছা যায়—

'ছাই জানিস। কিচ্ছু জানিস না।' গর্জে ওঠে বিলে। 'আমার ঠাকুরদা দুর্গাচরণ দত্ত সন্নেসী হয়েছিলেন। তোদের বংশে আছে কেউ সন্নেসী?'

মাত্র পঁচিশ বছর বয়েস, স্ত্রী ও তিন বছরের শিশুপুত্র বিশ্বনাথকে রেখে দুর্গাচরণ চলে গেলেন বিবাগী হয়ে। সেই দুর্গাচরণের নাতি আমি। আমি বীরেশ্বর। আমি জগজ্জয় করব না তো কে করবে!

সব নিচু ক্লাশে ভর্তি করে দিল বাবা। বিদ্যাসাগরের ইস্কুলে, মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে। কিন্তু পড়ায় বিশেষ মন নেই, গল্প-গোলমাল করতে পারলেই বেশি খুশি।

পাশের ছেলেদের সঙ্গে কথা কইছে, মাস্টার হঠাৎ পড়া জিগগেস করে বসল।

সব চুপ। কারু মুখে রা নেই। পড়ার এক বর্ণও কানে ঢোকেনি। খালি আড্ডা, খালি গুলতানি। দাঁড়াও বেঞ্চির উপর।

'তুমি বলো—' বিলেকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করতে লাগল মাস্টার।

একটার পর একটা। যা-ই জিগগেস করে ঠিক ঠিক জবাব দেয় বিলে। কাঁটায়-কাঁটায়। এতটুকু ভুলচুক নেই, এদিক-ওদিক নেই। মাস্টার নিজেই হতভম্ব। শাস্তি দেওয়া আর হয়ে ওঠে না বোধহয়।

কি করে দেবে! বিলের দুমুখো মন। এক মন দিয়ে গল্প করে আরেক মন দিয়ে পড়া শোনে।

তেমনি, এক মন দিয়ে কাজ করো, আরেক মন ঈশ্বরে ফেলে রাখো। এক মন দিয়ে অভিনয় করো, আরেক মন দিয়ে দেখ কেমন করছ তোমার অভিনয়।

'যাক, তোমাকে আর দাঁড়াতে হবে না।' মাস্টার হার মানলো।

না, দাঁড়াব। সঙ্গীদের সমদুঃখভাগী হব। ওরাই শুধু গল্প করেনি, আমিও করেছি। গোলমালের জন্যেই শোনেনি ওরা পড়া। সে গোলমালে আমারও অংশ আছে। সুতরাং আমিও ওদের দলে। এক বেঞ্চিতে।

নিজের থেকেই উঠে দাঁড়াল বেঞ্চির উপর।

ঐ মাস্টারটি তবু ভালো, গোলমাল করলে বা পড়া না পারলে দাঁড় করিয়ে রাখে। কিন্তু এ মাস্টার যা এসেছে, একেবারে কালাপাহাড়। কি দেখে বিলে হেসে উঠেছে তাই দেখে একেবারে অগ্নিশর্মা। দোহাত্তা চড়-চাপড় চালাতে লাগল। বল্ আর হাস্‌বিনে। বল্ আর অবাধ্য হবিনে। কিছুতেই বলবে না বিলে। কিছুতেই ঘাড় নোয়াবে না। তখন চড়-চাপড় ছেড়ে মাস্টার কান ধরল। ধরে এমন জোরে টান মারল যে খানিকটা ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল।

যন্ত্রণায় মারমুখো হয়ে উঠল বিলে। তুমি মারবার কে! কেন তুমি আমার কান ধরবে? খবরদার, আমার গায়ে হাত দিতে পারবে না বলে দিচ্ছি।

গোলমাল শুনে স্বয়ং বিদ্যাসাগর ছুটে এলেন।

কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে সব বললে বিলে। বললে, এ ইস্কুলে আমি আর পড়ব না। বই-খাতা কুড়িয়ে নিয়ে চলল বাড়ির মুখে।

বিদ্যাসাগর তাকে কাছে টেনে নিলেন। নিয়ে গেলেন তাঁর আপিস-ঘরে। অমিয় বচনে শান্ত করলেন। বললেন, ইস্কুলে চলবে না আর শারীরিক শাসন, তারই ব্যবস্থা করছি।

ছেলের দশা দেখে ভুবনেশ্বরী তো অভিভূত। এ কি অমানুষের মত ব্যবহার! কাল থেকে তোকে আর পাঠাব না ইস্কুলে।

কে কাকে পাঠায়! পর দিন যেমন-কে-তেমন ইস্কুলে চলেছে বিলে। সদানন্দ, সুপ্রসন্ন। কালকের মারের কথা মন থেকে মুছে ফেলেছে। যেমন রাতের অন্ধকার আকাশ থেকে মুছে ফেলেছে সূর্য। কানের পিঠে এখনো দগদগে ঘা, কিন্তু মনের মধ্যে তিলমাত্র জ্বালা নেই। গত দিবসের দুঃখের কথা নতুন দিনের প্রভাতে কে আর মনে রাখে!

শোন্, সন্নেসী হবার কি মজা! মুক্ত আনন্দে সহপাঠীদের কাছে গল্প করে বিলে। স্বপ্নের সোনা-মাখানো বানানো গল্প। হিমালয় দেখেছিস? তারই ওপারে কৈলাস। বড়-বড় সাধুরা সব হিমালয়ে থাকে, গভীর গুহা আর গহন জঙ্গলের মধ্যে। কৈলাস পাহাড়ের উপর মহাদেবের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। যদি মহাদেবকে দেখতে চাস তবে আগে চেলা হতে হবে সাধুদের। কি করে হবি? আগে সাধুদের পায়ে খুব মাথা খুঁড়তে হবে। তাতে যদি ওদের দয়া হয় তবে ওরা পরীক্ষা নেবে।

ভীষণ কঠিন পরীক্ষা। ইস্কুলের পড়া বলা তো তার কাছে জল। কি রকম জানিস? প্রত্যেককে একখানি বাঁশ দেবে সাধুরা। আর সেই বাঁশের উপর শুয়ে ঘুমুতে হবে সারা রাত। পারবি? নট-নড়নচড়ন। পড়ে গেলেই ফেল। কিন্তু যদি না পড়ে রাত কাটাতে পারিস, তা হলেই সন্নেসী। প্রথম নম্বরের চেলা। আর, একবার চেলা হতে পারলেই কৈলাসে শিবদর্শন। কি রে, যাবি একবার হিমালয়?

হিমালয়ের কোলে বিরাট এক অশ্বত্থ গাছের নিচে স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যানে বসেছেন। সঙ্গে সহচর অখণ্ডানন্দ স্বামী, পূর্ব নাম গঙ্গাধর গাঙ্গুলি। ধ্যানের পর বলছেন বিবেকানন্দ : 'গঙ্গাধর, জীবনের একটি অমূল্য মুহূর্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। সমস্ত সমস্যার উত্তর পেয়ে গেলাম।'

কি উত্তর জানতে চাইল না গঙ্গাধর। পরে স্বামীজির ডায়রি খুলে দেখলে। দেখলে লেখা আছে : যা ক্ষুদ্র পরমাণু তাই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড। দুইই এক। আর, সবই আমার এই দেহের মধ্যে, তৃণখণ্ড থেকে সূর্যপিণ্ড। আমি ক্ষুদ্র নই খর্ব নই অল্প নই অকিঞ্চন নই—

এইই ভারতবর্ষ। ইউরোপ-আমেরিকা পরমাণুর মধ্যে ধ্বংসের মারণাস্ত্র দেখে, ভারতবর্ষ দেখে ছন্দোময় বিশ্বসংসার।

৩

শুধু কল্পনা নয়, বিজ্ঞানেরও চর্চা-চেষ্টা করে। একটা কিছু কল্পনা করে নিয়েই তো বিজ্ঞানের অগ্রগতি। আজ যা প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে, গত কাল তাই ছিল নিছক কল্পনা।

কলকাতায় নতুন গ্যাসের আলো বসেছে। তাই বিলেরও চাই গ্যাস বানানো।

কে বললে হবে না? পুরোনো দস্তার নল নিয়ে আয় কতগুলো, এনে দে একটা মেটে হাঁড়ি আর এক গোছা খড়। চোখের সামনে জ্যান্ত গ্যাস বানিয়ে দেব।

বার-বাড়ির উঠোনে গ্যাস-ঘর বসিয়েছে। জ্বালিয়ে দিয়েছে খড়। নল দিয়ে ধোঁয়া যাচ্ছে উপরে। বিলে মহা খুশি। কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে বলছে বুক ফুলিয়ে, দ্যাখ, এরই জোরে সারা শহরের আলো জ্বলছে। যদি কারখানা বন্ধ করে দি, দিগ্‌বিদিক অন্ধকার। কতক্ষণ পরেই বলছে আবার নিজের মনে, নাঃ, এ কিচ্ছু হচ্ছে না। সঙ্গীদের উদ্দেশ করে বলছে, আরো আগুন দে, খুব ফুঁ লাগা, গ্যাস বড় কম বেরুচ্ছে—

পুরোনো কল-কবজা টিন-কেনেস্তারা দিয়ে রেলগাড়ি বানাচ্ছে। গ্যাস দিয়ে শুধু আলো জ্বলছে না, গাড়ি চলছে। স্তব্ধতার গাড়ি চলছে চৈতন্যের আগুনে।

নতুন সোডা-লেমনেড এসেছে কলকাতায়। তবে তারও একটা কারখানা খুলে ফেল। আঙুলের একটা চাপ দিলে অমনি ঠাণ্ডা জল ভস্ করে উঠল। তাই তো চাই। কখন কোথায় একটা কল টিপে দেব অমনি বন্দী নির্জীব জল বেগোচ্ছল হয়ে

উঠবে।

সেই মন্ত্র নিয়েই তো এসেছি। মন্থরকে ত্বরান্বিত করব। নিশ্চেষ্টকে উদ্যমময়। যা দেখছ মৃত তাই উজ্জীবিত হয়ে উঠবে।

আমি সেনাপতি। ছটি সৈন্য আমার অনুচর। তাদের নামগুলি শুনে রাখো, টুকে রাখো। তারা হচ্ছে কি আর কে, কবে আর কোথায়, কেন আর কেমন করে।

পদার্থ কি? ঈশ্বর কে? সৃষ্টি কবে? স্বর্গ কোথায়? জন্ম কেন? মৃত্যু কেমন করে?

মোট কথা, ঘাড় কাত করে মেনে নেব না কিছুই। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করব। প্রশ্নের সদুত্তর নেব। ভাবের হাটে ফিরি করব না, বুদ্ধির দোকানে যাচাই করে জিনিস কিনব। অনুমানের ধার ধারব না, প্রমাণের মান রাখব।

পাড়ার কোন এক ছেলের বাড়িতে চাঁপা গাছ আছে। তার ডালে চেপে দোল খায় বিলে। বসে-বসে নয়, পায়ের সঙ্গে ডাল জড়িয়ে, মাথা নিচু করে। গেল, গেল বুঝি গাছটা। বাড়ির বুড়ো মালিক হাঁ-হাঁ করে ওঠে। গাছ না যাক, ছেলেটা যাবে। পড়বে মুখ থুবড়ে। বিন্দুমাত্র ভয় নেই বিলের। ডানপিটের মরণ গাছের আগায়।

ছেলেটাকে কি করে নিবৃত্ত করা যায় বুদ্ধি আঁচলো বুড়ো। মুখ গম্ভীর করে একদিন বললে, 'ও গাছটায় উঠিস নে।'

'কি হয় উঠলে?' সাফ প্রশ্ন করে বিলে।

'ও গাছে ব্রহ্মদত্যি আছে।'

'তাই নাকি? কি রকম দেখতে ব্রহ্মদত্যি?'

'ওরে বাবাঃ, ভয়ঙ্কর দেখতে।' বাড়ির মালিক চোখ বড় করলে। 'নিশুতি রাতে শাদা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

'তাই নাকি? তবে রাত করে আসতে হবে একদিন। গাছে চড়ে ব্রহ্মদত্যি দেখব।'

'কি সর্বনাশ!' বাড়ির মালিক মাথায় হাত দিলে। 'দিনের বেলায়ই ফেলে দেয় গাছ থেকে। রাতে চড়লে তো তার কথাই নেই। ঘাড় মটকে দেবে।'

ভয়ের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু রাত করেই এসেছে আজ বিলে। বড় ইচ্ছে ব্রহ্মদত্যির সঙ্গে একটু মোলাকাত হয়।

শতহস্তে বারণ করতে লাগল সঙ্গীরা। নির্ঘাত মারা যাবি। পৈত্রিক প্রাণটা খোয়াবি বেঘোরে।

'দিনের বেলা কিছু করতে পারল না, দেখি না এবার তার রাতের কেরামতি।' বিলে দিব্যি গাছে চড়ে বসল। আর-সব ছেলেরা মিলিয়ে গেল হাওয়ায়।

ওরে, কি হল বিলের? পরদিন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল ছেলেরা। ওরে, ভালো আছে তো! ঘাড় সিধে আছে?

মেরুদণ্ড সিধে আছে। সুস্থ আছি বুদ্ধির খররৌদ্রে। সেখানে কুসংস্কারের কুয়াশা নেই।

লোকে একটা কিছু বললেই বিশ্বাস করতে হবে? বলে কিনা, বইয়ে লেখা

আছে। বইয়ে লেখা থাকলেই মানতে হবে নির্বিবাদে? কখনো না। নিজে বাজিয়ে দেখব, খাঁটি কি মেকি নিজে নেব যাচাই করে। সত্য কি এতই সোজা? আমেরিকা আছে এ বললেই বিশ্বাস করব? যেতে হবে আমেরিকা। সংশয়ের সমুদ্র পেরিয়ে আবিষ্কার করব মহাদেশ।

রান্নায় ওস্তাদ হয়েছে বিলে। নিয়ে আয় যার যা সম্বল, চাল, ডাল, তেল, নুন, আমি নবীন স্বাদের ভোজ্য তৈরি করে দেব। গোলমরিচের গুঁড়ো একটু বেশি হবে তাতে। ঝাল হবে। বেশ তো, পরের মুখে ঝাল খাবি না, নিজের মুখেই ঝাল খাবি।

শুধু বনভোজন নয়, থিয়েটার-পার্টি খুলল বিলে। হল-ঘরে স্টেজ বাঁধল। এবার লেগে যা পার্ট মুখস্থ করতে। কেষ্ট-বিষ্টু সাজতে। কিন্তু হায়, বেশি দিন নয়, তার কাকা এসে ভেঙে দিলে স্টেজ। যাক গে স্টেজ, কুস্তির আখড়া করব। পালোয়ান হব। প্রতিকূলকে পরাভূত করব। উঠোনের এক পাশে খুলব ব্যায়ামাগার। লাভের মধ্যে হল এই, এক খুড়তুতো ভাইয়ের হাত ভেঙে গেল। খুড়ো এসে ভেঙে দিল আড্ডাখানা। ব্যায়ামের সাজ-সরঞ্জাম দিল দূর করে। যাক গে বাড়ির আখড়া, পাড়ায় নবগোপাল মিত্তিরদের যে আখড়া আছে তাতে ঢুকব সকলে।

আমাদের সকলকে বীর-বলবান হতে হবে। রুক্ষ মাটি খুঁড়ে আনতে হবে পানীয়ের জল। শুকনো কাঠ থেকে বার করতে হবে নিহিত আগুন। অন্তর-গুহায় ঘুমিয়ে আছে যে সিংহ, জাগাতে হবে সে কেশরীকে।

শুধু মস্তিষ্কে বলবান হব না, হৃদয়ে বলবান হব না—শরীরেও বলবান হব।

'তোমরা আমাদের একটু সাহায্য করবে?' নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়েই পাড়ে দেখতে পেল দুজন গোরা সৈন্য। হাতে ছোট লাঠি, তাই ঘুরোতে-ঘুরোতে হাওয়া খাচ্ছে। একটুও ভয় পেলনা বিলে। সামনে এগিয়ে এসে ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে জিগগেস করলে স্পষ্ট।

কে এই অকুতোভয় ছেলে! আশ্চর্য দীপ্তি চোখে-মুখে। সৈন্য দুজন অবাক হয়ে গেল। একে সাহেব তায় সৈন্য—এতটুকু ভড়কাল না! আর, ঐ তো স্কুলে-যাওয়া ছোট একটা ছেলে, স্পর্ধা দেখেছ?

কি হয়েছে বলো তো! উপেক্ষা করে সরে যেতে পারল না। সৈন্য দুজন দাঁড়াল নিষ্ক্রিয়ের মত।

বন্ধুদের নিয়ে যাচ্ছিলুম মেটিয়াবুরুজ, নবাবের চিড়িয়াখানা দেখতে। নৌকোয় যাওয়া-আসা। ফেরবার পথে একটি বন্ধুর অসুখ হয়ে পড়েছে। বমি করে ফেলেছে। মাঝিরা বলছে আমাদের পরিষ্কার করে দিতে। আমরা বলছি দ্বিগুণ ভাড়া দিচ্ছি, আমাদের রেহাই দাও। আমাদের কথায় কান দিচ্ছে না। এখন পাড়ে এসে বলছে, নামতে দেবনা কাউকে। মার-ধোরের ভয় দেখাচ্ছে। কি জুলুম বলো তো! আমি লাফিয়ে পালিয়ে এসেছি। বন্ধুদের এখন উদ্ধার করা চাই। তোমরা একটু আসবে এদিকে?

দুর্ধর্ষ সৈন্যের কর্কশ হাতের মধ্যে নিজের ছোট হাতটি গুঁজে দিল বিলে।

সাধ্য নেই সে স্পর্শ প্রত্যাখ্যান করতে পারে। চলো, দেখি, কোথায় তোমার নৌকো।

কি সর্বনাশ! ওরে, দু-দুটো সৈন্য নিয়ে এসেছে। কি হবে! আর এগিয়ো না বাবারা, ছেড়ে দিচ্ছি, এখুনি ছেড়ে দিচ্ছি।

অবাক্যব্যয়ে ছেড়ে দিল ছেলেগুলোকে। মুহূর্তের ইঙ্গিতে ইন্দ্রজাল ঘটে গেল।

থিয়েটরে যাচ্ছিল সৈন্য দুজন। বিলেকে জিগগেস করলে, যাবে আমাদের সঙ্গে? না, ধন্যবাদ। স্নিগ্ধ হাস্যে বিদায় নিল বিলে। নিজের বন্ধুদের সঙ্গে গিয়ে মিললে।

গঙ্গার ঘাটে ইংরেজের মানোয়ারী জাহাজ এসেছে। চল দেখে আসি।

কি করে যাবি? ছাড় লাগবে যে। বড় সাহেবের দস্তখতী ছাড়।

কেন, চাইলে দেবে না আমাদের?

ওরে বাবা, কে দাঁড়াবে ঐ লালমুখো জাঁদরেলের কাছে? হুমকে উঠলে হাত-পা সেঁধিয়ে যাবে পেটের মধ্যে। আদার বেপারীর জাহাজের খোঁজে দরকার নেই।

না, পেছপা হব না। দেখি চেষ্টা করে। চেষ্টার অসাধ্য কি।

নিজের হাতে একটা দরখাস্ত লিখল বিলে। চৌরঙ্গিতে আপিস। ঠিকানা খুঁজে নিয়ে ঠিক গিয়ে হাজির হল দরজায়। তেতলায় সাহেবের দপ্তর। বিলে লক্ষ্য করে দেখল সব লোক ঐ তেতলায় গিয়ে জড় হচ্ছে। আমিও সোজা উঠে যাব তেতলায়। পেশ করব দরখাস্ত। যদি কিছু প্রশ্ন করে, ঠিক-ঠিক জবাব দেব। আমি তো শুধু নিজের জন্যে চাইছি না, বন্ধুদের জন্যেও চাইছি।

কিন্তু সিঁড়ির প্রথম ধাপেই উদ্দণ্ড বাধা। চাপরাশ-পরা খোট্টাই দারোয়ান। তুমি কে হে বাপু? নেংটি ইঁদুর হয়ে হাতি চড়বার সখ! দেখছ না যারা হোমরা-চোমরা, সমাজের কেষ্ট-বিষ্টু, তারাই শুধু উপরে যাচ্ছে! তুমি কোথাকার পুঁচকে ছেলে, তোমার আস্পর্ধাকে বলিহারি।

ফিরিয়ে দিল বিলেকে। তাড়িয়ে দিল।

কিন্তু ফেরবার পাত্র আর যেই হোক, বিলে নয়। বলে না পারি কৌশলে আদায় করব।

তাকিয়ে দেখল, বাড়ির পিছন দিকে লোহার একটা ঘোরানো সিঁড়ি আছে। সন্দেহ কি, ও-পথে চাকর-বাকররা যাতায়াত করে। সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলে কেমন হয়! ধরা পড়লে মার না দেয়! চোর না ভাবে!

কুছ পরোয়া নেই। ছাড়পত্র আদায় করতে যাচ্ছি। যে ভাবেই হোক, আমার আদায় করা নিয়ে কথা।

ঠাকুর বলেন, অনুরক্ত করে আদায় করতে না পারিস বিরক্ত করে আদায় করে নে। সেধে-কেঁদে না পারিস ধরে-বেঁধে উশুল কর তোর হিস্‌সা।

তেতলায় উঠে গেল সটান। ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল আলগোছে। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে একমনে সই করে চলেছে সাহেব। মুখ তুলে তাকাবারও সময় নেই।

একের পর এক, আর সকলের মত, ছাড়পত্র সই করিয়ে নিল বিলে।

পলকের জন্যে চোখ তুলল বুঝি সাহেব। আর কি, আদায় করে নিয়েছি। তুমিও নাও এবার আমার চকিতদীপ্ত চক্ষুর প্রসন্নতা।

সামনের সিঁড়ি দিয়ে নামল এবার বুক ফুলিয়ে। এ কি, তুমি কি করে গিয়েছিলে? দারোয়ান অবাক হয়ে বললে।

বিলে হাসল গর্বভরে। বললে, 'আমি জাদু জানি।'

কি মনে হয় আমাকে দেখে? আমি বাজিকর। মড়ার হাড়ে ভেল্‌কি দেখাতে পারি। শুকনো কাঠে পারি ফুল ধরাতে, পাথর ভেদ করে আনতে পারি দুগ্ধধারা। এই যে দেখছ মরা নদী এতে আনতে পারি দুর্দান্ত জলোচ্ছ্বাস।

যা বাঁকা তাকে সোজা করতে পারি। জড়ত্বের মধ্যে আনতে পারি গতিদ্যুতি। যা জীবন্মৃত তাকে করতে পারি প্রাণচঞ্চল।

৪

বিপদে আমাকে রক্ষা করো এ আমার প্রার্থনা নয়। বিপদে আমি যেন নির্ভয়-নির্বিচল থাকতে পারি এই আমার প্রতিশ্রুতি।

নবগোপাল মিত্তিরের আখড়ায় ডন-বৈঠক করে বিলে। সঙ্গে অনুবর্তী বন্ধুরা। এত প্রতাপ-উত্তাপ বিলের, তারই উপর আখড়ার ভার ছেড়ে দিলেন নবগোপাল।

শুধু ডন-বৈঠক কি, ট্রাপিজ খাটাও। দোলনায় দুলতে-দুলতে কসরৎ দেখাও। বন্ধুরা ধরলে এসে বিলেকে। শুধু স্থলে-জলে নয় অন্তরীক্ষেও বলশালী হও।

সেই ট্রাপিজ খাটাতেই সেদিন মহা বিপদ উপস্থিত। গুরুভার ফ্রেম কিছুতেই খাড়া করতে পারছেনা ছেলেরা। খানিকটা খাড়া করে তো পায়ের দিকের গর্ত ফসকে যায়—আগে গর্তে পায়া ঢোকাতে চাও তো সাধ্য কি ফ্রেমটাকে উপরে তোলো।

হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে গেছে ছেলেদের কাণ্ড দেখবার জন্যে। অথচ কেউ এগিয়ে আসছেনা সাহায্যে। এ যেন এক বিনি পয়সার সার্কাস।

লক্ষ্য করে দেখল বিলে, ভিড়ের মধ্যে একজন জোয়ান ইংরেজ দাঁড়িয়ে। পোশাক দেখে মনে হচ্ছে জাহাজের লোক। সরাসরি তার কাছে এসে বিলে জিগগেস করলে, তুমি একটু হাত লাগাবে?

ইংরেজ নৌ-কর্মচারী এক কথায় রাজি হয়ে গেল। পরের উপকার করা মানেই তো ঈশ্বরের উপাসনা করা।

এবার দড়ি বেঁধে টেনে তোলো এই দারু-দৈত্যকে। পা দুটো সাহেব গর্তে ঢোকাবে, তোমরা মাথাটা টেনে তোলো। হেঁইয়ো হো, হেঁইয়ো হো—

দড়ি ছিঁড়ে গেল সহসা। দারু-দৈত্য ছিটকে পড়ল ভূতলে। আর পড়বি তো পড়, একেবারে সাহেবের মাথার উপর।

সর্বনাশ হয়েছে! সাহেবের মাথায় কাঠ পড়েছে না ছেলেগুলোর মাথায় বাজ পড়েছে। যার যে দিকে চোখ যায় ছুটে পালাল সবাই। এখুনি পুলিশ আসবে, কে জানে চামড়া ছুলে নিয়ে ডুগডুগি বানিয়ে ছাড়বে। চাচা আপন বাঁচা।

কিন্তু বিলে অচঞ্চল। আহত বন্ধুর জন্যে মন চঞ্চল হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু স্থান থেকে ভ্রষ্ট হল না। আহতকে পরিত্যাগ করে নিজেকে নিরাপদ করা কাপুরুষের কাজ। আহতকে নিরাপদ করাই পরমধর্ম। কোনো গুরুর কাছ থেকে পাঠ নেয়নি বিলে, অন্তরে যে একজন সদাজাগ্রত গুরু আছেন তিনিই বলে দিলেন।

নিজের কাপড় ছিঁড়ে ফেলল বিলে। নিজের হাতে বেঁধে দিল ব্যাণ্ডেজ। চোখে মুখে জল ছিটোতে লাগল। কোত্থেকে একটা পাখা চেয়ে এনে বসল হাওয়া করতে।

জ্ঞান হয়েছে সাহেবের। চোখ চেয়েছে।

উঠোনা, উঠোনা, ডাক্তার আনতে পাঠিয়েছি। এখান থেকে তোমাকে ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছি সামনের ইস্কুলে। সেখানে ব্যবস্থা করেছি তোমার বিছানার। ডাক্তার তোমাকে ছুটি দিলেই চলে যেও আস্তানায়।

সাত দিন লাগল সাহেবের ভালো হতে। কে এক বিদেশী নাবিক, সাত দিন অক্লান্ত তার সেবা করল বিলে। সুস্থ করে তুলল। প্রসন্নমুখে সাহেব বললে, এবার আমি বাড়ি যাই।

দাঁড়াও, তোমার জন্যে ছোট্ট এই একটি টাকার থলে সংগ্রহ করেছি।

বলো কি? বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইল সাহেব।

কত না জানি ক্ষতি হয়েছে তোমার এত দিনে। আমাদের জন্যে কত তুমি কষ্ট পেলে। আমাদের ভালবাসা, আমাদের কৃতজ্ঞতা কি করে তোমাকে জানাতে পারি বলো। কণা-কণা মধু সংগ্রহ করে রচনা করেছি এই মধুচক্র। তুমি তোমার করপুট ভরে নাও।

প্রাণপুট ভরে নিয়েছি। বন্ধু, তুমি কে?

টাকার থলে গ্রহণ করল সাহেব। অনেক দূর সমুদ্রে তাকে পাড়ি দিতে হবে, ধূসর দিগন্তরেখা অতিক্রম করে, জানেনা কোথায় তার বন্দর, কোথায় তার যাত্রা-শেষ। কিন্তু আজ এক পরম পাথেয় সে লাভ করল জীবনে। যাত্রা অনির্দেশ্য হোক, পাথেয়ও তার অক্ষয়। সে ভারতবর্ষের একটি বালকের ভালোবাসা।

সেবা আর প্রেম। এতেই আমি সব্যসাচী।

জীবে দয়া নয়, জীবে সেবা। শিখিয়ে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দয়া করবি, তোর স্পর্ধা কি! কাকে দয়া করবি? যাকে দয়া করবি ভাবছিস সে তো শুধু জীব নয়, সে শিব। সে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। সে কি ছোট, সে কি অকিঞ্চন যে তাকে দয়া করবি? সে ঈশ্বরের প্রতিভাস। তাকে তোর সেবা করতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে, ভালোবাসায় স্নান করিয়ে দিতে হবে।

মানুষের সেবাই ঈশ্বরের আরাধনা।

মানুষকে ছোঁয়াই ঈশ্বরকে ছোঁয়া।

আদ্য-অন্ত এই মানুষে বাইরে কোথাও নাই। বাইরে কোথাও নাই।

মায়ের সঙ্গে রায়পুর যাচ্ছে বিলে। মধ্যপ্রদেশের রায়পুর। বাবা আগেই গিয়েছেন। এখন মাকে নিয়ে যাবার ভার পড়েছে বিলের উপর। কি রে পারবি নে?

সবে থার্ড ক্লাশে উঠেছে তখন বিলে। তেরো-চৌদ্দ বছর মোটে বয়স। ঘাড় হেলিয়ে বললে, খুব পারব। অনায়াসে। আমি থার্ড ক্লাশের ছাত্র বটে কিন্তু একেবারে থার্ড-ক্লাশ নই।

কি কঠিন রাস্তা তখন রায়পুরের। নাগপুর পর্যন্ত ট্রেন হয়েছে, তাও এলাহাবাদ আর জব্বলপুর হয়ে—তারপর গরুর গাড়ি। ঢালা, টানা গরুর গাড়ি। প্রায় পনেরো দিনের রাস্তা। যেতে হবে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, উঁচু-উঁচু পাহাড়ের গা ঘেঁসে। অজানা বিপদের মুখ দেখে-দেখে। আসুক না চোখের সামনে, বিপদকে বিলে কানা-কড়িরও কেয়ার করে না।

একটা গাড়িতে বিলে একেবারে একা। আরেকটাতে মা আর ভাইয়েরা।

গাড়ি চলেছে তো চলেছে। চলেছে বিন্ধ্যপর্বতের রহস্যরাজ্যে। এই সেই বিন্ধ্য যে সূর্যকে প্রতিরোধ করবার জন্যে মাথা তুলেছিল। গুরু অগস্ত্য এল দেখা করতে। গুরুকে প্রণাম করবার জন্যে নত হল বিন্ধ্যাচল। গুরু বললে, যতক্ষণ না ফিরি থাকো এমনি ভাবে। তথাস্তু। অগস্ত্য আর ফিরল না, বিন্ধ্যও রইল তেমনি নত শিরে।

এই সেই হেঁটমুণ্ড পাহাড়! তবু, চোখ যায় না এত উঁচু! আর গা-ভরা কত বনশোভা। কঠিন যেন কোমলের নামাবলী পরে রয়েছে। কত গাছ, কত লতা, কত ফুল, কত পাখি। কে এসব এঁকে রেখেছে, কার জন্যে! কে এসে দেখবে এই ফুল, কে এসে শুনবে এই কাকলী! আর, যখন এসে দেখবে ফুলটিই দেখবে? যখন এসে শুনবে, কূজনটিই শুনবে? দেখবে না আর কারু আনন্দচক্ষু, শুনবে না আর কারু গভীরগুঞ্জন?

একবারও ভাববে না কে এসব করেছে? কে এসব মেলে ধরেছে চোখের সামনে?

হঠাৎ একটা মৌচাকের উপর চোখ পড়ল। কি আশ্চর্য, পাহাড়ের প্রায় চূড়া থেকে সুরু করে শেষ পর্যন্ত বিরাট একটা ফাটল, আর তারই গা জুড়ে প্রকাণ্ড এই মৌচাক। অজানা পাহাড়ে কি করে মধু-র সংবাদ পেল এই মক্ষিকারা! কিসের আকর্ষণে এসে পড়েছে দলে-দলে!! মক্ষিকার অক্ষৌহিণী। প্রত্যেকের শ্রমে, প্রত্যেকের আহরণে গড়ে তুলেছে এই মধুসৌধ। তিল-তিল শ্রম, কণা-কণা আহরণ! কত শক্তি, কত সংগ্রাম, কত ধৈর্য, কত নিষ্ঠা!

অনন্তের ভাবে ডুবে গেল বিলে।

রায়পুরে ইস্কুল নেই, কোথায় তবে পড়ি এবার? ভালোই হল, বাবা পড়াতে বসলেন। নিজের চিন্তাকে উস্কে দেবার জন্যে পড়ানো, পরের চিন্তাকে চাপিয়ে দেবার জন্যে নয়। তেমনি করেই পড়াতে লাগলেন বিশ্বনাথ। ভালোই হল,

বিদ্যেবুদ্ধি কতদূর হল কে জানে একটি জাগ্রত মনের সংস্পর্শে এসে দীপ্ত বুদ্ধির স্বাদ পেলাম!

আচ্ছা, আমার এমন কেন হয় বলতে পারো? এক জায়গায় গিয়েছি, নতুন জায়গা, কিন্তু দেখে হঠাৎ মনে হয়েছে, এ আমার চেনা, কোন দিন যেন এসেছিলাম এখানে! ভেবে আর কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না! এ যেন সেই বাড়ি সেই গাছপালা, সেদিনও যেন এমনি ধরনেরই হয়েছিল কথাবার্তা! কিন্তু কবে বলো তো? এখানে আবার কবে এসেছিলাম এর আগে!

এপারের বাতাসে ওপার থেকে চেনা দিনের গন্ধ ভেসে আসছে।

দুবছর পরে ফিরলেন বিশ্বনাথ। তখন বিলেকে ইস্কুলে ভর্তি করানো নিয়ে মুস্কিল। তিন বছরের পড়া এক বছরে সেরে দিল বিলে। তখন আবার নিলে তাকে ইস্কুলে। প্রথম বিভাগে পাশ করলে এণ্ট্রান্স। সারা ইস্কুলে সেই একমাত্র প্রথম বিভাগ।

কি নিবি রে বিলে? খুশি হয়ে বাবা দিতে চাইলেন পুরস্কার।

বিলে বললে, আপনার যা ইচ্ছে।

বাবা একটি ঘড়ি দিলেন।

সূর্যের সঙ্গে ঘড়ি মেলাও। জীবনের চলার ছন্দকে মেলাও তেমনি ঈশ্বরের সঙ্গে।

ইস্কুল ডিঙিয়ে ঢুকল এসে কলেজে। প্রথমে প্রেসিডেন্সি, এক বছর পরে জেনারেল এসেম্বলি ইনস্টিটিউশনে বা স্কটিশ চার্চ কলেজে।

অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেস্টি ইংরিজি পড়াচ্ছেন। পড়াচ্ছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা। প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে কবির যে তন্ময়তা এসেছিল আর তন্ময়তা থেকে যে ভাবাবেশ, তারই বর্ণনা করেছেন কবি। ছেলেরা কিছুই বুঝছে না। কাকেই বা বলে তন্ময়তা, কাকেই বা ভাবাবেশ!

ঐ অবস্থা আসে ধ্যানমগ্নতা থেকে। আর তেমনি ধ্যানে আবিষ্ট হতে হলে চাই মনের ঐকান্তিক বিশুদ্ধি। তেমনি দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না আজকাল। ছেলেদের বোঝাচ্ছেন হেস্টি-সাহেব। একমাত্র একজনকে জানি, একজনকে দেখেছি, যিনি পৌঁচেছেন সেইখানে। সেই অত্যুজ্জ্বল পবিত্রতায়। তিনি হচ্ছেন দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস।

কে রামকৃষ্ণ? কোথায় দক্ষিণেশ্বর?

৫

ইস্কুলে থাকতে একবার বক্তৃতা দিয়েছিল বিলে। পুরোনো মাষ্টার চলে যাচ্ছে বিদায় নিয়ে, সেই উপলক্ষে সভা। সভাপতি স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশনেতা বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ, বানান পালটে শুরেন্দ্রনাথ। এখন তাঁর সামনে উঠে

দাঁড়িয়ে কিছু বলো কেউ ছেলেরা! ছেলেরা লজ্জায় মরে গেল, এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। অথচ ছেলেদের তরফ থেকে কেউ না বললেও ভালো দেখায় না। তাদের শিক্ষক চলে যাচ্ছেন চিরদিনের মত, এতটুকু কৃতজ্ঞতাও কি তাদের নেই?

তুই বল। তুই বল। ঠেলাঠেলি করতে লাগল এ ওকে। কিছু লিখে এনে বলতে বললে বরং হত! এ একেবারে এক্ষুনি-এক্ষুনি বলা, বিন্দুমাত্র তৈরি হবার সময় না পেয়ে। তাও কিনা মাতৃভাষায় নয় রাজভাষায়। বাঙলায় নয় ইংরিজিতে।

কোনো ভয় নেই। উঠে দাঁড়াল বিলে। সুরু করল বক্তৃতা।

কি উদাত্ত-গম্ভীর সে কিশোর কণ্ঠস্বর। দাঁড়াবার কি সে তেজ-ঋজু ভঙ্গি। কি সে সাহস-সহজ ভাষা!

প্রায় আধ ঘণ্টা বললে একটানা। প্রথমে শিক্ষকের গুণবর্ণনা করলে, পরে বললে নিজেদের বিচ্ছেদদুঃখের কথা। বক্তৃতার মধ্যেও একটি গঠনশিল্প আছে। ষোলো বছরের ছেলে দেখালে সে কৌশলকলা।

মুগ্ধ হলেন সুরেন্দ্রনাথ। মুগ্ধ হল শ্রোতৃমণ্ডলী। সবাই দেখলে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের রূপকার দাঁড়িয়ে আছে চোখের সামনে।

বিশ্বনাথ দত্ত উদার হাতে খরচ করেন টাকা-পয়সা। কে একজন আত্মীয় শিখিয়ে দিল বিলেকে, এমনি করে যদি টাকা ওড়ান, কি রেখে যাবে তোদের জন্যে? যা, গিয়ে জিগগেস কর বাবাকে।

তাই করল বিলে। কি রেখে যাচ্ছেন আমাদের জন্যে?

বিশ্বনাথ দত্ত একবার তাকালেন পুত্রের দিকে। বললেন, 'আরশিতে নিজের চেহারাটা দ্যাখ। তাহলেই বুঝবি কী তোকে দিয়ে গেলাম।'

দেয়ালে ঝুলছে লম্বা আয়না। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়েও দেখল না বিলে। বুঝতে পেরেছে সহজে, বাবা কি বলতে চান। বলতে চান, দিয়ে গেলাম তোকে বলদৃপ্ত ভঙ্গি, সাহসবিস্তৃত বুক, দৃঢ়োদ্ধত মেরুদণ্ড। দিয়ে গেলাম তোকে পাহাড়-টলানো শক্তি, আঘাতবিজয়ী নিষ্ঠা, পৃথিবী-জাগানো ভালোবাসা। আর চেয়ে দ্যাখ তোর চোখ দুটির দিকে। একেই বলে পদ্মপলাশলোচন। তুই পদ্মপলাশলোচন হয়ে অখিললোকলোচনকে দেখবি।

ঠাকুর বললেন, 'নরেন যেন খাপখোলা তলোয়ার।'

আবার বললেন, 'ও বড় ফুটো-ওলা বাঁশ, অনেক জিনিস ধরে। আর সকলে কাঠিবাটা, নরেন রাঙাচক্ষু রুই।'

শুধুই কি বাবার জন্যে? মা ছাড়া কি কোনো ছেলে বড় হতে পেরেছে? চন্দ্রমণির জন্যে রামকৃষ্ণ, ভুবনেশ্বরীর জন্যে নরেন্দ্রনাথ।

রাগের মাথায় বিলে মাকে কি একটা কটু কথা বলে ফেলেছিল। কথাটা কানে উঠল বিশ্বনাথের। অন্য কোনো শাসন করলেন না বিশ্বনাথ, ঘরের দেয়ালে কয়লা দিয়ে বড়-বড় অক্ষরে লিখে রাখলেন, নরেনবাবু এই কটু বাক্য বলেছেন তাঁর মাকে। তোমরা, বন্ধুরা, যারা আস নরেনের কাছে, দেখে যাও নরেনের কীর্তি।

মর্মদাহ আর কাকে বলে! লজ্জায় মাথা তুলতে পারছে না বিলে। মাগো, তুমি মধুময়ী, জীবনে আর কটু বলব না তোমাকে।

তখন, বিলে অনেক ছোট, মার কাছে একদিন কেঁদে পড়ল, মাগো, হনুমান তো এখনো এলো না—

ভুবনেশ্বরী প্রথমটা কিছু বুঝতে পেলেন না। বললেন, 'সে কি কথা? হনুমান আসবে কী!'

'বা, এই যে বললেন কথকঠাকুর, কলাবাগানে খোঁজ গে, দেখা পাবি। কত খুঁজলুম, কত বসে রইলুম, কই এলো না তো—'

ব্যাপারটা বুঝে নিলেন ভুবনেশ্বরী। সারা রামায়ণে হনুমানের মত আর কাউকে অত ভালো লাগে না বিলের। শুধু বীর নয় মহাবীর হনুমান। সাগর লাফালো লঙ্কা পোড়ালো সূর্যকে বগলদাবা করল, গন্ধমাদন পাহাড় আনলে মাথায় করে। চিরব্রহ্মচারী, মৃত্যুহীন হনুমান। কথকতা শুনতে গিয়েছে বিলে, কথায়-কথায় হনুমানের প্রসঙ্গ এসেছে। বিলে কান খাড়া করে রইল। হনুমানকে নিয়ে রঙ্গরসের ঢেউ তুললে কথকঠাকুর। কত বা তার অঙ্গভঙ্গি। যাও না ঐ সামনের কলাবাগানে, দেখতে পাবে মুঠোয় চেপে কলা খাচ্ছে হনুমান।

কথকঠাকুরের কথা, মনে-প্রাণে বিশ্বাস করল বিলে। বাড়ির পাশে বাগান, সেখানে এক কলাগাছের নিচে বসে রইল চুপচাপ। কখন না জানি আসবে সেই বায়ুনন্দন। কিন্তু বৃথাই বসে থাকা। এলো না।

সেই দুঃখই মার কাছে নিবেদন করছে বিলে। মা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আজ হয়তো রামের কাজে আর কোথাও গিয়েছে, আরেকদিন আসবে। তুমি বসে আছ আর সে আসবে না?'

কোথায় সেই হনুমান? সেই বলকান্তিমান মহাতেজা?

'দে দিকি দেশে মহাবীর হনুমানের পুজো চালিয়ে।' 'সিংহবিক্রমে হুঙ্কার দিলেন বিবেকানন্দ : 'দুর্বল বাঙ্গালী জাতের সামনে এই মহাবীর্যের আদর্শ তুলে ধর। দেহে বল নেই, হৃদয়ে তেজ নেই—কি হবে এইসব জড়পিণ্ডগুলো দিয়ে। ঘরে-ঘরে মহাবীরের পুজো লাগা।'

বি-এ পরীক্ষার মোটে একমাস বাকি, গ্রীন-এর "ইংরেজ জাতির ইতিহাসের" এক পৃষ্ঠাও পড়া হয়নি। পড়বে কি, একখানা বই-ও বিলের নেই। কষ্টেসৃষ্টে একখানা যোগাড় করল এক সহপাঠীর থেকে, অনেক চেয়ে-চিন্তে। মাত্র তিন দিনের কড়ার। তাই সই। তিন দিনেই ঘুরে আসব তিন-ভুবন।

দরজা বন্ধ করল বিলে। আদ্যোপান্ত আয়ত্ত করবার আগে বেরুচ্ছিনা ঘর থেকে। শুধু চোখের সামনে তিনবার সূর্যকে উঠতে দেখব আকাশে আর তিনবার নামতে দেখব অস্তাচলে। এর মধ্যে দু-চোখের পাতা আর এক করব না।

কী সুন্দর হয়ে উঠছে দেখতে। আনন্দসুন্দর নরেন্দ্রনাথ। সবল-সুঠাম দেহ, বিশাল দুটি চোখ, শানিত দীপ্তির সঙ্গে ভাবভোর স্নিগ্ধতা। বীর্যের সঙ্গে মাধুর্যের কোলাকুলি। যেন একটি নির্মল-নির্ধূম শিখা জ্বলছে ব্রহ্মচর্যের।

তারপর কী সুন্দর গান গায় বিলে। ওস্তাদ আহম্মদ খাঁর চেলা বেণীগুপ্ত, সেই তার গানের গুরু। তারপর মৃদঙ বাজায়, সেতার বাজায়, তানপুরা তো আছেই। শুধু তাই? নাচে। যেন মহাকাল মহাদেবের নৃত্য। তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ।

বাড়িতে বড় গোলমাল, তাই নিরিবিলি পড়াশুনা করতে চলে এল মামাবাড়ি। রামতনু বোসের গলিতে, দোতলায় একটি ছোট্ট চোরকুঠুরিতে। দিব্যি ফাঁকা বাড়ি, কোনো ঝামেলা নেই। আর এই চোরকুঠুরি তো নয় যেন মন্দিরের মণি-কোঠা। ঘরের নাম দিয়েছে টঙ। আট হাত লম্বা, চার হাত চওড়া। সরু একটা ক্যাম্বিশের খাট, মেঝেতে ছেঁড়া মাদুর, ময়লা বালিশ, দুটো বাঁয়া-তবলাও গড়াগড়ি যাচ্ছে। বাঁয়া কখনো বা খাটিয়ার নিচে, কখনো বা তা বিলেরই বসবার চেয়ার। একপাশে সেতার-তানপুরা, আরেকপাশে থেলো হুঁকো, গুল আর ছাই ঢালবার সরা, তামাক-টিকে-দেশলায়ের সরঞ্জাম। আর বই? বই সর্বত্র। তাকে, খাটের উপর, খাটের নিচে, এখানে-সেখানে। দেয়ালে দড়ি ঠাঙানো, একখানি কাপড়, একটা জামা, আরেকটা চাদর ঝুলছে। মলিন, ছিন্নপ্রায়।

বেশে-বাসে আরামে-বিলাসে লক্ষ্য নেই। কি যেন একটা অসাধ্যসাধন করবে সেই তপস্যায় সমাসীন।

অন্য গোলমাল নেই কিন্তু বন্ধুদের ভিড় আছে। বেলা এগারোটা, খেয়েদেয়ে এসে পড়ছে একমনে, কোত্থেকে আড্ডাধারী বন্ধু এসে হাজির। ভাই, রাত্তিরে পড়িস, এখন দুটো গান গা।

গানের কথা একবার বললেই হল! নে, তবে বাঁয়াটা নে। বই ঠেলে ফেলে সেতার তুলে নিল বিলে। নে, ঠেকা দে।

'ওরে বাবা, তোর সঙ্গে বাঁয়া ধরব আমি?' বন্ধু কুঁকড়ে গেল। 'কলেজে টেবিল চাপড়ে বাজাই বলে সত্যি-সত্যি কি আর বোল ফোটাতে পারি?'

বেশ করে দেখে নে। বাজনার বোল তোকে বলে দিচ্ছি। এমন কিছু শক্ত নয়।

গলা ছেড়ে গান ধরল বিলে। শোকস্তব্ধ দেশে নেমে এল যেন আনন্দের নির্ঝরিণী। আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান, দাঁড় ধরে আজ বস্ রে সবাই, টান্ রে সবাই টান্। এই বিষণ্ণ-বিবর্ণ দেশকে নিয়ে যাব আনন্দের বন্দরে।

দিন যে কোনখান দিয়ে চলে গেল খেয়াল নেই কারুর। খেয়াল নেই কখন চাকর মিটমিটে দীপ রেখে গেছে এক কোণে। রাত দশটার সময় খেয়াল হল খিদে পেয়েছে। আর, যাই বলো, খিদের কাছে আর গান নেই।

আজ বি-এ পরীক্ষার প্রথম দিন। সূর্য ওঠবার আগেই উঠে পড়েছে বিছানা ছেড়ে। একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, হঠাৎ কি খেয়াল হল, চোরবাগানে এসে উপস্থিত। বন্ধু দাশরথি আর হরিদাসের বাড়ি। তারা তখনো ঘুমে, তাদের শোবার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল বিলে। উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরল :

"অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি,
গাও আনন্দে সবে রবি চন্দ্র তারা—
সকল তরুরাজি সাজি, ফুলে ফলে গাও রে—"

কার কণ্ঠস্বর? ধড়মড় করে উঠে বসল বন্ধুরা। বাইরে ছুটে এল। তুই, নরেন? আর একখানি গা। আর একখানি ধর।

সুরের সুরধুনী নেমে এল পাষাণী মাটিতে। সুরের আগুন লেগে গেল পুষ্পে-পর্ণে, পক্ষিকাকলীতে। বিলে আবার গান ধরল :

"মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ
তোমারি রচিত ছন্দ মহান বিশ্বের গীত।
মর্ত্যের মৃত্তিকা হয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত।"

কোথায় সকালে উঠে পড়বে, তা নয়, গান ধরেছে। কি হবে পড়ে-শুনে যদি তা না ঈশ্বররহস্যের মীমাংসা করে? পড়ে ইতিহাস বুঝব, অঙ্ক বুঝব, কিন্তু বুঝব কি ঈশ্বরকে? আর ঈশ্বরকে না জানা পর্যন্ত জ্ঞান নেই।

সেই এক জানার নাম জ্ঞান, অনেক জানার নাম অজ্ঞান। বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

কিশোর গদাধর যখন এসেছে প্রথম কলকাতায়, তার দাদা রামকুমার তাকে টোলে ভরতি করে দিতে চাইলেন। বললেন, এবার একটু লেখাপড়া কর।

লেখাপড়া? লেখাপড়া করে কি হবে?

বা, রোজগার করতে হবে না? কিছু শাস্ত্র-ব্যাকরণ পড়ে নিলে অন্তত পুরুত-গিরিটা তো করতে পারবি।

'দাদা, চালকলা-বাঁধা বিদ্যে দিয়ে আমার কি হবে? তা দিয়ে আমি কি করব?' বললে সেই সরল-তরল গদাধর।

তার মানে? তবে তুই কী চাস?

আমি চাই জ্ঞান। সেই একটা মহান আবিষ্কারের উদার আনন্দ। যিনি আকাশের তারায় থেকেও আবার চোখের তারায় আছেন, সূর্যে থেকেও আছেন আবার শিশিরে, কে তিনি? যাঁর গুণে সবাইকে সুন্দর বলে দেখি, প্রিয় বলে ভালোবাসি, তিনি না জানি কত সুন্দরপ্রিয়! একবার জানতে হবে না তাঁকে? যিনি গভীরের চেয়েও গভীর নিবিড়ের চেয়েও নিবিড় তাঁর ঠিকানাটা একবার খুঁজে নেব না? এ জীবনটা বয়ে যেতে দেব? বাজে-খরচে উড়িয়ে দেব পুঁজিপাটা?

আবার গান ধরল বিলে :

"হরিরসমদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে,
একবার লুটায়ে অবনীতল, হরি হরি বলে কাঁদো রে।"

'এ কি, আজ পরীক্ষা না?' পাশের বাড়ি থেকে আরেক সহপাঠী এল ছুটে। 'কোথায় সকালবেলা ফুটোফাটা একটু ঝালিয়ে নেবে, তা নয়, উলটে ফুর্তি ওড়াচ্ছে!'

'তাছাড়া আবার কি। মাথাটা সাফ রাখছি।' নরেন বললে দরাজ গলায়: 'ঘোড়াটা খেটে এলে তাকে ডলাই-মলাই করে তাজা করে নিতে হয়। তেমনি গান গেয়ে শরীর-মনকে শান্তি দিচ্ছি!'

৬

কিন্তু ঈশ্বর বলে সত্যি কি কেউ আছেন? চোখ দিয়ে দেখা যায়না, হাত দিয়ে ধরা যায়না, কান দিয়ে শোনা যায়না এমন কি কেউ থাকতে পারে? থাকতে পারে তো কোথায়? কোন সমুদ্রে, কোন পর্বতে, কোন অটবীতে?

তোমার মনের মধ্যেই একটি মৌনী সমুদ্র আছে। আছে একটি তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ। একটি গহন কান্তার। সেখানেই তাকে সন্ধান করো।

ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে মিশেছে নরেন। সেখানে বিচার-বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরের কিনারা করতে চায়, শুধু অন্ধ বিশ্বাস দিয়ে নয়, তাদেরকে তার ভালো লাগে। কঠোর ব্রহ্মচারীর মত দিন কাটায়। মাটিতে শোয়, নিরামিষ খায়, পরনে থান ধুতি ও গায়ে চাদর, এর বেশি আর পোশাক নেই। সমাজে গান গায়। প্রার্থনা করে। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ধ্যানে নিশ্চল হয়ে থাকে।

তবু, কই সেই ঈশ্বর? সাড়া নেই শব্দ নেই, নিথর সমুদ্রে এতটুকু বুদ্বুদ ফোটে না। রন্ধ্রহীন অন্ধকার। আলোক-কণিকার আভাস নেই এতটুকু।

কি করে থাকবে? যদি তার হাতে সত্যিই প্রদীপ থাকত একবার অন্তত দেখতে পেতুম তার মুখ!

দ্বিধায়-দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে নরেন। কে তাকে সন্ধান দেবে, কে দেবে সিদ্ধান্ত! কে জানান দেবে সেই মহা অজানার।

সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তাঁর সৌম্যসহাস্য বদান্য জীবন বড় আকর্ষণ করেছে নরেনকে। নরেনের মনে হল যদি ঈশ্বরসন্ধান কেউ দিতে পারে তো তিনি। তার এই উন্মাদ জিজ্ঞাসার পরম নিবৃত্তি তাঁর হাতে।

গঙ্গার উপর নৌকোয় বাস করছেন মহর্ষি। একদিন হঠাৎ তাঁর সামনে এসে আবির্ভূত হল নরেন। যেন দৈত্যের মত কি-এক অতিকায় প্রশ্ন তাকে তাড়া করেছে, সমাধানের আশ্রয় তাকেই নিতে হবে। আর বহুশাখাবিস্তীর্ণ বটবৃক্ষের মত এত বড় আশ্রয় আর কে আছে মহর্ষি ছাড়া?

শান্ত মনে চোখ বুজে উপাসনা করছিলেন মহর্ষি। উত্তেজিত ঝড়ের মত তাঁর নিভৃতকক্ষে ঢুকে পড়ল নরেন। জিগগেস করল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে, 'আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?'

মহর্ষির ধ্যান ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখলেন, নরেন। দুটি বিশাল-বিশদ চোখ যেন ভাগবতী দীপ্তিতে জ্বলছে।

এই যে তোমাকে দেখছি চোখের সামনে এই কি ঈশ্বরকে দেখা নয়? এই যে জ্যোতিরাত্মা সূর্য, গভীরাত্মা সমুদ্র, গহনাত্মা পর্বত এ কি ঈশ্বরের প্রকাশ নয়? এই যে ফুল হয়ে ফোটা তারা হয়ে ফোটা এটি কি নয় ঈশ্বরের প্রস্ফুটন? পত্রপুঞ্জে এই যে সমীরমর্মর, এই যে কলিতললিত বিহগকূজন এইটিই কি নয় ঈশ্বরসঙ্গীত? হৃদয়ে যে একটি আনন্দের বাসা এইটিই কি তাঁর সুগন্ধ নয়? আর এই যে নদী-নির্জনে পরিব্যাপ্ত একটি প্রশান্তির অনুভব এইটিই কি নয় তাঁর স্পর্শস্নান?

'দেখেছেন আপনি ঈশ্বর?'

অপূর্ব প্রশ্ন। ভাগবতী মতি না হলে কি এই জিজ্ঞাসা কারু কণ্ঠে ফোটে?

মহর্ষি উদারনেত্রে হাসলেন। কিন্তু হাঁ-না সরাসরি উত্তর দিলেন না। তার অর্থ হয় তো এই, আমি দেখলে তোমার কী লাভ? তোমাকে নিজে দেখতে হবে। খনির অন্ধকারে দেখবে সেই হিরণ-মণি।

তাই বললেন, 'কী সুন্দর উজ্জ্বল তোমার দুটি চোখ! যেন যোগীচক্ষু!'

যোগীচক্ষু নয়, চর্মচোখে দেখতে চাই তাঁকে। দেখাতে পারেন?

কেউ দেখাতে পারো?

এখানে-ওখানে ঢুঁড়তে লাগল নরেন, খুঁড়তে লাগল মাথা। মন্ত্র-যন্ত্র-ইন্দ্রজাল নয়, একেবারে স্পষ্ট, সুপ্রত্যক্ষ, দেখাতে পারো ঈশ্বরকে? জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দিয়ে অজ্ঞানতিমিরান্ধের চোখ খুলে দিতে পারো কেউ?

আমি পারি।

তুমি পারো, কে তুমি?

আমি কেউ নই, কিছু নই। আমি এক মুখখু গেঁয়ো পূজুরী ব্রাহ্মণ।

পুজো করো তুমি?

আমি শুধু মা-মা বলে কাঁদি। মাকে ভালোবাসি। সেই ভালোবাসাই আমার পুজা। আর কান্নাই আমার সে-পুজার গঙ্গাজল।

'ওরে বিলে, বাড়ি আছিস?'

কে যেন ডাকছে বিলেকে।

কে? পাড়ার সুরেশ মিত্তির দরজায় দাঁড়িয়ে। 'চল আমার বাড়ি চল। গান গাইবি।'

গান গাইতে সব সময়েই নরেন গলা বাড়িয়ে আছে। তবু উপলক্ষ্যটা কি!

'আমাদের বাড়িতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ এসেছেন। নাম শুনেছিস তো? সেই রাসমণির বাগানে দক্ষিণেশ্বরে যিনি থাকেন। কেশব সেন যাঁর কথা লিখেছেন কাগজে।'

অমন কত লোক লেখে! ভূ-ভারতে সাধুসন্নেসীর কি কোনো অভাব আছে? এসেছেন তো এসেছেন তাতে আমার কি!

'ওরে গান গাইবি। তিনি বড় ভজন শুনতে ভালোবাসেন। ভালো গাইয়ে কাউকে যোগাড় করতে পারিনি। শেষে তোর কথা মনে পড়ল।' কাঁধের উপর অনুনয়ের হাত রাখল সুরেশ। 'চল দু'খানা গাইবি চল।'

এ কে! চমকে উঠলেন রামকৃষ্ণ। যেন আগুনের সঙ্গে বারুদের দেখা হল, চুম্বকের সঙ্গে লোহার। পূর্ণিমার চন্দ্রের সঙ্গে ফেনিল-নীল জলনিধির। কোথায় একে আগে দেখেছি বলো তো?

দেখেছি এক জ্যোতির্ময় স্বপ্নে। সাতটি ঋষি বসে আছে ধ্যানমগ্ন হয়ে। আকাশের সেই সাত তারা। অত্রি অঙ্গিরা ক্রতু পুলস্ত্য পুলহ মরীচি আর বশিষ্ঠ। যে জ্যোতির্মণ্ডলে এরা বসে আছে তারই কিয়দংশ ঘনীভূত হয়ে ছোট একটি দেবশিশুর আকার নিলে। দেবশিশু একজন ঋষির কোলে চড়ে দু' হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল, তার ধ্যান ভাঙাবার জন্যে ডাকতে লাগল মৃদু-মৃদু। ঋষি চোখ মেললেন। শিশু বললে, আমি চললুম, তুমিও এস।

রামকৃষ্ণ দেখলেন, এ যে সেই ঋষি। শিশুর টানে ঠিক চলে এসেছে পৃথিবীতে। শিশুর টান মানে রামকৃষ্ণের টান। রামকৃষ্ণই সেই শিশু।

শিশুর মত সরল। শিশুর মত পবিত্র। শিশুর মত শরণাগত।

আর বিবেকানন্দ ঋষির মত যোগী, ঋষির মত তেজস্বী।

পরিপূরক হিসেবে আরেকজনকে চাই। রথী আর সারথি। ভাব আর রূপ। দেহ আর আত্মা। শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন। বুদ্ধদেব আর আনন্দ। গৌরাঙ্গ আর নিত্যানন্দ। তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ আর নরেন্দ্রনাথ।

ওরে কোথায় ছিলি তুই এতদিন? কি করে ভুলে ছিলি আমাকে?

মনের ভাব মনে রেখে শান্ত হয়ে গান শুনলেন রামকৃষ্ণ। কি সুন্দর গায়!

কাদের বাড়ির ছেলে? কোথায় থাকে? কে ডেকে আনল?

'ও সুরেশ, ওকে আরো একখানা গাইতে বলো।'

আরো একখানা গাইল নরেন। তন্ময়, বিভোর হয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ।

গান শেষ হলে কাছে এগিয়ে এলেন ব্যাকুল হয়ে। তৃপ্ত চোখে দেখতে লাগলেন দেহলক্ষণ। কী সুন্দর দেখতে! যেন রামায়ণের রামের মত। দুই হাতে সেই হরধনুভঞ্জন বিপুল বিক্রম। আবার দুই চোখে সেই কমলকোমল শিশিরশান্ত করুণা। কথার সুরে মিনতি মাখিয়ে বললেন, 'একবারটি যাবে দক্ষিণেশ্বর? আমি বড় একা। আমার দিন আর কাটেনা।'

কি মিষ্টি করে কথা বলে এই সাধু। সলজ্জ মুখে হাসল নরেন। বললে, 'যাব।'

যাব বললে, কই, আর এলো না তো! তখন কেন কাপড়ের খুঁটে বেঁধে আনলাম না? বাঁধতে চাইলেই যেন বাঁধা যেত! আমি তার কে! আমাকে সে মানবে কেন? কোন সুখে সে ধরা দেবে?

কোনো খোঁজ নিইনি, রাখিনি কোনো ঠিকানা। কার ছেলে তুই, কত তোর বাড়ির নম্বর। তোকে দেখেই আর সব হিসেব আমার ভুল হয়ে গেল। এখন কাকে

পাঠাই, কোথায় পাঠাই, কোন দেশ থেকে ডেকে আনি। তুই নিজের থেকে একবার আসতে পারিস না দয়া করে? আমি মুখখু বামুন, আমার বাইরে কোনো জৌলুস নেই, কিন্তু শোন, তোকে বলি অন্তরে আমার অনন্ত স্নেহ। সে সমুদ্র কি তুই শুকিয়ে দিবি? তুই কি তাতে স্নান করবিনে? করবিনে সন্তরণ?

ওরে, একবার আয়। এক জীবন মা'র জন্যে কেঁদে মরেছি—এখন বুঝি তোর জন্যে ফের কেঁদে মরব। তুই তো ঐ পাষাণীর মত কঠিন নোস, তুই তো রক্ত-মাংসের, তবে তুই কেন সাড়া দিবিনে?

যেমন গামছা নিংড়োয় তেমনি বুকের ভিতরটা কে যেন মুচড়ে দিচ্ছে হাত দিয়ে। এদিক-ওদিক তাকান রামকৃষ্ণ, এই বুঝি সে এল। ঐ বুঝি তার পায়ের শব্দ। অন্ধকারে চোখ খুললেই যেন দেখতে পাব সেই নয়নলোভন ভুবনশোভনকে।

রাত্রে স্বপ্ন দেখেন, যেন সে এসেছে।

গা ঠেলে তুলে দিল ঠাকুরকে, বললে, ওঠো, চেয়ে দেখ, আমি এসেছি—

এসেছিস? সত্যি? এত রাত্রে? কিন্তু কই, কোথায় তুই? অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ান রামকৃষ্ণ। গঙ্গার ব্যথিত কলকলস্বর ভেসে আসে বাতাসে—সে নেই, সে আসেনি, সে এসে আবার চলে গেছে।

শেষকালে মার মন্দিরে গিয়ে কেঁদে পড়লেন। মা, কৃপা কর, মুখ তুলে চা। একবারটি তাকে এনে দে। তার মুখখানি একবার দেখি। দেখি সেই তার অরবিন্দ নেত্র দুটি। তোর কাছে কিছু চাইনি, আর কিছু চাইওনা। রাজ্য চাই না, রত্ন চাই না, মোক্ষ চাই না, তুই শুধু একবারটি ওকে এখানে নিয়ে আয়। ও নইলে আমার প্রাণের কথা বুঝবে কে? আর কাকেই বা তা কইব প্রাণ খুলে?

তুই সব জানিস, সব বুঝিস, আর এটুকু বুঝবি নে?

৭

কি ঘুরছিস তুই এখানে-সেখানে? যদি মূর্তিমান ধর্মকে দেখতে চাস চলে যা দক্ষিণেশ্বর। দেখে আয় রামকৃষ্ণকে। সুদক্ষিণকে।

বিলেকে বললেন একদিন রাম দত্ত। দূর সম্পর্কের আত্মীয়। বিশ্বনাথের ঘরে থেকেই মানুষ।

যাব বললেই কি যেতে পারি? তুমি যদি না টানো। তুমি যদি না পথের সন্ধান দাও!

নতুন গাড়ি কিনেছে সুরেশ। গাড়ি মানে ঘোড়ার গাড়ি। একদিন বললে এসে বিলেকে, ওরে, যাবি দক্ষিণেশ্বর?

যাব।

কেন যাবে বিচার করেও দেখল না। ও কি একটা যাবার মত জাগয়া? কে-না-কে এক সাধু সেখানে আস্তানা গেড়েছে—গাছতলায়-বসা সাধু নয় তো পেটবোরেগী—

তার কাছে যাবার এত তাড়া কিসের? বোলে-চালে কিছু আছে বলে তো মনে হয় না। শাস্ত্র-দর্শন দূরের কথা, এক অক্ষর লেখাপড়া শেখেনি বলেই তো শুনেছি। কী সে দেবে, কী বা পারে সে দিতে? জীবনের এত সব জটিল দুরূহ রহস্যের উপর কী করবে সে আলোকপাত?

তবু এক কথায় নিজেরও অজানতে বলে উঠল বিলে, 'যাব।'

চোখ দুটি যেন ভরে আছে ভালোবাসায়। সেই আলোকপাতেই যেন সমস্ত জীবন-রহস্যের অর্থোন্মোচন হবে।

তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে পড়ল। শরীরের দিকে লক্ষ্য নেই, মন উড়ে চলেছে কোন সুদূরের সন্ধানে। মাথার চুল অগোছালো, বেশবাস উদাসীন, শুধু ময়লা একখানি চাদর গায়ে। পরিচিত সংসার থেকে যেন আলাদা হয়ে এসেছে। যেন সংসারই বিদেশ, চলেছে অন্য নিকেতনে, নিজ নিকেতনে।

মনকে শান্ত হতে বললেন রামকৃষ্ণ। ওরে, এসেছে। এত ডেকেছি এত কেঁদেছি, না এসে কি পারে? তুই চঞ্চল হোসনে, উদ্বেল হোসনে। আগে ওর গান-টান শুনি। মুখখানি দেখি তৃপ্তি করে।

এসেছিস? আয়—

সঙ্গে আবার কটা ছোকরা বন্ধু নিয়ে এসেছিস কেন? একা-একা আসতে পারলিনে?

মেঝেতে মাদুর পাতা, বসতে বললেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'একটা গান ধর।'

গান তো নয়, ধ্যান। ধ্যানে যেন আরূঢ় হয়ে আছে নরেন। উন্মুক্ত, উদাত্ত গলায় গান ধরল :

মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে॥

ষোল-আনা মন-প্রাণ-ঢালা গান। শুনে ঠাকুর আর সামলাতে পারলেন না নিজেকে। উঠে নরেনের হাত ধরলেন, হাত ধরে টেনে আনলেন উত্তরের বারান্দায়। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন বাইরে থেকে।

শীতকাল বলে উত্তর দিকের থামের ফাঁকগুলো ঝাঁপ দিয়ে ঘেরা। সুতরাং ঘরের দরজা বন্ধ হতেই বেশ একটু নিরিবিলি হল জায়গাটা। কারুর কিছু দেখবার জো নেই।

নরেন ভাবল সাধু বুঝি কিছু উপদেশ দেবেন। ঝুলি ঝাড়বেন মামুলি কথার।

ঠাকুর, ও সব ঢের শুনেছি। মুখের কথা পচে গিয়েছে। ছাপার অক্ষরও ঝাপসা হয়ে মুছে গিয়েছে এত দিনে।

কিন্তু এ কি, শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁদছেন। অঝোরে কাঁদছেন। যেন কত পরিচিত,

কত অন্তরঙ্গ, এমনি অনুযোগের সুরে বলছেন, 'ওরে, আমাকে ছেড়ে এতদিন কোথায় ছিলি?'

নরেন তো নিস্তব্ধ, নির্বাক।

'এত দিন পরে আসতে হয়? তোর জন্যে কত দিন ধরে আমি বসে আছি একবারও ভাবলিনে সে কথা? তুই এত নির্মম? একবারও মনে পড়ল না আমাকে?'

এ কি পাগলের প্রলাপ? কিন্তু, পাগল তো, কাঁদে কেন এমন করে?

'বিষয়ী লোকের কথা শুনে-শুনে আমার কান দগ্ধ হয়ে গেল। এবার, আয়, তোর মুখে একটু হরিকথা শুনি। আমার কান জুড়োক, আমার প্রাণ জুড়োক। শুধু শুনব না, বলব। তোকে কত কথা আমার বলবার আছে। কত কথা। মনের কথা, প্রাণের কথা। সে সব কথা বলতে না পেয়ে এই দ্যাখ আমার পেট ঢাক হয়ে রয়েছে—'

হাসবে না কাঁদবে কে বলে দেবে নরেনকে।

'শেষকালে মা'র কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লাম। মা, ওকে একবারটি এনে দে। অমনিধারা শুদ্ধ ভক্ত না পেলে বাঁচব কি করে? কার সঙ্গে কথা কইব? কাঁদতে-কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর কি হল জানিস না বুঝি?'

পাথুরে চোখে তাকিয়ে রইল নরেন।

'মাঝরাতে তুই আমার ঘরে এলি। হ্যাঁ, তুই, স্পষ্ট তুই। এসে আমায় তুললি গা ঠেলে। বললি, আমি এসেছি—'

'কই আমি তো কিছু জানি না।' কৌতূহলের অলস একটি হাসির রেখা ফুটল বিলের মুখের উপর : 'আমি তো তখন আমার কলকাতার বাড়িতে তোফা ঘুম মারছি।'

'তুমি জানো না বৈ কি। তুমি যদি না জানো তবে আর কে জানে।' বলে অকস্মাৎ হাত জোড় করে দাঁড়ালেন সামনে। যেমন লোকে মন্দিরে দেবতার সামনে দাঁড়ায়। গাঢ়-গদ্‌গদ স্বরে বললেন, 'কিন্তু আমি জানি প্রভু, তুমি সেই পুরাণ পুরুষ, তুমিই সেই পরমনিধান, তুমিই সেই সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি। তুমি নররূপী নারায়ণ। তুমি জীব-জগতের দুঃখ হরণ করতে আবার শরীর ধরেছ—'

আমি এটর্নি বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে, কলেজে বি-এ পড়ছি, সামান্য ছাত্র—আমাকে এ সব কথা! আমি কি পৃথিবীতে আছি, না কি চলে এসেছি গন্ধর্বনগরে?

'তুই একটু বোস, তোর জন্যে খাবার নিয়ে আসি।' দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন রামকৃষ্ণ।

চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল নরেন। এ কে, কাকে সে দেখতে এসেছে? এক মুহূর্তের পরিচয়, তাইতে এত ভালোবাসা! ভেবেছিলুম, পাগল। কিন্তু পাগল কি ভালোবাসে? মধুর করে কথা কয়? সুধাসমুদ্রের ঢেউ তোলে অন্তরে?

চকিতে ফিরে এলেন রামকৃষ্ণ। হাতে সন্দেশের থালা।

হাতে করে নরেনের মুখের কাছে সন্দেশ তুলে ধরলেন। বললেন, 'নে, খা,

হাঁ কর।'

মুখ সরিয়ে নিল নরেন। বললে, 'সে কি, সঙ্গে আমার বন্ধুরা রয়েছে। থালাটা আমার হাতে দিন, বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খাই।'

থালা ছাড়বার পাত্রই কিনা রামকৃষ্ণ! জোর করে সন্দেশ মুখে পুরে দিতে লাগলেন : 'ওরা পরে খাবে'খন। তুই আগে খা। কৌশল্যা হয়ে রামকে খাইয়েছি, যশোদা হয়ে ননীগোপালকে। নে, হাঁ কর—'

'অত পারবনা খেতে।'

'তা পারবেনা বৈ কি!' জোর করে খাইয়ে দিলেন সমস্ত।

পরক্ষণেই নত হলেন মিনতিতে। বললেন, 'বল, আবার আসবি?'

কণ্ঠস্বরের কাকুতি মর্মমূল পর্যন্ত স্পর্শ করল। না করে এমন শক্তি যেন খুঁজে পেলনা শরীরে। বললে, 'আসব।'

'আর দ্যাখ, শিগগির করে আসবি।'

'তাই আসব।'

'আর শোন্,' একটু যেন গলা নামালেন রামকৃষ্ণ : 'একা-একা আসবি। অত বন্ধুবান্ধবের কি দরকার!'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল নরেন। বন্ধুদের নিয়ে ফিরে এল কলকাতা।

ফিরে এলেই কি চলে আসা যায়? মন যে পড়ে থাকে। দূরে এলেও মন যায় উড়ে-উড়ে।

কিন্তু এ সে কী দেখে এল দক্ষিণেশ্বরে? একজন মাত্র সাধু, না, আর কিছু? যদি শুধু একজন মাত্র সাধু, তবে এমন করে টানে কেন? কত সাধু দেখেছে সে গাছতলায়, মঠে-মন্দিরে, হাটে-বাজারে। দেখে বরং বিতৃষ্ণা হয়েছে। কিন্তু এর মুখের দিকে চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ মনোহর চোখ দুটির দিকে। কি যেন আছে যা পৃথিবীর আর কিছুতে নেই। আর কিছুতে দেখনি। না সূর্যে না চন্দ্রে না সমুদ্রে না নীলাম্বরে।

তবে কি পাগল? পাগল কি এত আনন্দে ভরা থাকে? এত লাবণ্যে? এত স্নিগ্ধতায়?

তবে কী দেখে এলাম? স্বপ্ন, না ইন্দ্রজাল?

বা, এমন সে কী করেছে? সন্দেশ খাইয়েছে আর বলেছে, 'তত্ত্বমসি,' অর্থাৎ তুমিই সেই ঈশ্বর। এতে এমন আর কী বাহাদুরি! প্রত্যেক মানুষই তো ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, ঈশ্বরের প্রতিভাস। সেইটেই একটু উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছে শুধু।

শুধু কি তাই? শুকনো কাঠে যে আগুন ঘুমিয়ে ছিল তাকে যেন চকিতে জাগিয়ে দিয়েছে। অব্যক্তকে প্রকাশিত করেছে। নিহিতকে নিষ্কাশিত। তুমি শুধু সাড়ে তিন হাত লম্বা মাংসপিণ্ডময় সামান্য দেহ নও, তুমি অনন্তের আয়তন, তুমি অমিতবলশালী পরমাত্মা। নিয়ে এসেছে সে বৃহতের সংবাদ, মহতের সংবাদ। একটি শঙ্খের মধ্যে ধ্বনিত করেছে উদার সমুদ্রকে।

তুমি অল্প নও, তুমি অতিশয়। তুমি ক্ষুদ্র নও, তুমি অপরিমেয়। তুমি

অনৃতের সন্তান নও, তুমি অমৃতের সন্তান।

দূর ছাই, কি হবে অত ভাবনা ভেবে! আমার কলেজের পড়া পড়ে রয়েছে, তাইতে মন দিই। আমি কে তা জেনে আমার কী এসে যাবে? এদিকে পাশ করতে না পারলে সব ফক্কা!

বিলে বই নিয়ে বসল।

কিন্তু, কি সর্বনাশ, আসল কথাই তো জিজ্ঞেস করা হয়নি। শুধু সন্দেশ খেয়ে আর স্তব শুনে চলে এলাম, যা জানতে গিয়েছিলাম তাই জানা হল না? সব ভুল হয়ে গেল?

কী জানতে চাস? স্মিতস্নিগ্ধহাস্যে সেই দুইটি মনোহর চোখ মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

দেখা যায় ঈশ্বরকে?

তিনি যখন আছেন, তখন তাঁকে আর দেখা যাবে না? যেকালে তিনি আছেন দ্রষ্টব্য হয়েই আছেন।

আছেন?

জগৎ দেখলেই বোঝা যায় তিনি আছেন। প্রাণরঙ্গশালায় এত যে দীপ জ্বলছে সেখানে নেই কেউ নাট্যকার? এত যেখানে শ্রী আর শৃঙ্খলা সেইখানে নেই কেউ শিল্পী? এত যেখানে সুর আর ছন্দ সেখানে নেই কেউ কাব্যকর্তা? নিয়ম আছে নিয়ামক নেই?

দূর ছাই, পড়ার বই ছুঁড়ে ফেলে দিল টেবিলে। কথা দিয়ে এসেছি যাই আরেকবার। তাঁকে দেখে আসি। নিয়ে আসি প্রথম প্রশ্নের শেষ উত্তর।

ওরে আয়, দেখা দে। এদিকে কাঁদছেন বসে রামকৃষ্ণ। সেই যে আসবি বলে গেলি আর এলিনে। আমি যে তোর জন্যে পথ চেয়ে বসে আছি। তুই এলে আমি বিহ্বল হই, বিবশ হয়ে পড়ি—জানি, সব জানি, তবু তুই আয়। দেখা দে।

৮

সেদিন গাড়িতে গিয়েছিল, আজ চলেছে হেঁটে।

গাড়িতে গিয়েছিল বলে পথের দূরত্ব ঠিক বুঝতে পারেনি সেদিন। এ যে পথ আর ফুরোয় না! আর কত দূর?

আরো উত্তরে যা। উত্তরে গেলেই উত্তর মিলবে। সেখানেই আছেন সেই লোকোত্তর।

সেদিনের মতই ছোট তক্তপোশটিতে বসে আছেন। যেন কার জন্যে অপেক্ষা করছেন স্তব্ধ হয়ে। মুহূর্ত গুনছেন। ঘরে লোকজন আর নেই। যেন সবাইকে সরিয়ে দিয়ে বসে আছেন একজনের জন্যে। উদাস, উচ্চকিত।

নরেন এসে দাঁড়াল সামনে।

ওরে, এসেছিস? শিশুর মত আহ্লাদে ফেটে পড়লেন রামকৃষ্ণ। তোর জন্যে বসে আছি কখন থেকে। আয় আয় বোস আমার পাশটিতে। আহা, মুখখানি শুকিয়ে গেছে দেখছি। কিছু খাবি?

নরেন একটু দূরে সরে বসল কুণ্ঠিত হয়ে। একটু কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। পাগল আবার হঠাৎ কি করে বসে কে জানে।

তোর কুণ্ঠা, আমার অকার্পণ্য। তোর নিষেধ, আমার অবারণ। তোর ভয়, আমার অভয়-প্রসন্নতা। তুই দূরে বসিস, আমি কাছে আসি সরে-সরে।

ঠাকুর সরে-সরে কাছে এগুতে লাগলেন। এবার বুঝি ধরে ফেলবেন নরেনকে। কি-এক অঘটন ঘটিয়ে দেবেন না জানি।

ঠিকঠাক কিছু একটা ভেবে নেবার আগেই তার গায়ের উপর ডান পা তুলে দিলেন রামকৃষ্ণ। মুহূর্তে সব যেন ওলটপালট হয়ে গেল। মনে হল দেয়াল-ছাদ সব যেন উড়ে গিয়েছে, ঘরে লোক নেই, জিনিস নেই, শুধু আকাশময় নিঃসীম শূন্যতা। সেই পরিব্যাপ্ত শূন্যতায় যেন মিশে যাচ্ছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে নরেন্দ্রনাথ।

আমি বলে যে একটা আলাদা অস্তিত্ব তা যেন আর থাকছে না। বিশ্বময় একটিমাত্র চেতনার মধ্যে মিশে যাচ্ছে এই শরীরাবদ্ধ সংকীর্ণ চেতনা।

এই বোধ হয় মৃত্যু।

আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল নরেন : 'ওগো, তুমি আমার এ কী করলে? আমার যে মা আছেন, বাবা আছেন—'

খল খল করে হেসে উঠলেন রামকৃষ্ণ। ও, তাই আছেন নাকি? তোর সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয়েছিল জিগগেসও করিনি, তুই কার ছেলে, তোর বাপের নাম কি, কি করে, তোর কে-কে আছে? কী দরকার আমার ও-সব খোঁজ-খবরে? তুই আছিস, তুই এসেছিস, এই তোর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। আমি আম খেতে এসেছি, আম খেয়ে যাব। বাগানে কত আম গাছ আছে কত তার শাখা-প্রশাখা এ হিসেবে আমার কী হবে? আমটি খাব আর তার সংবাদটি দিয়ে যাব জনে-জনে।

নরেনের আর্তস্বর কি-রকম যেন বাজল বুকের মধ্যে। পা সরিয়ে নিলেন তার গা থেকে। স্নেহসুধাসিঞ্চিত কোমল হাতখানি বুকের উপর বুলিয়ে দিতে লাগলেন। বললেন, 'তবে থাক, এখন থাক। একবারে হয়ে কাজ নেই। আস্তে আস্তে হবে। কালে হবে। কালের ফলের মত মিষ্টি আর কি আছে!'

নিমেষে আবার সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। ছাদ-দেয়াল ঠিক ঠিক বসল এসে যে-যার জায়গায়। জিনিসপত্র ফিরে পেল তাদের আগের অস্তিত্ব, আগের অবস্থান। গাছপালা নদী-মাঠ সব আবার চিত্রাঙ্কিত হল। ফিরে এল আবার সহজের সুষমা।

তবে এটা কী হয়ে গেল পলকের মধ্যে? ভেলকি? ভোজবাজি? তাছাড়া আবার কি! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উড়ে গেল চোখের সামনে? সাধু নিশ্চয়ই কোনো ম্যাজিক জানে। ব্ল্যাক আর্ট। নয়তো বা হিপনটিজম!

বললেই হল? আমি একজন সুস্থ-সমর্থ দৃঢ়কায় যুবক, এত আমার মনের জোর, এত প্রবল আমার ব্যক্তিত্ব, এত সহজে আমাকে অভিভূত করে ফেলবে? কে জানে কি, অভিভূত তো করল, চক্ষের সামনে ঘটালো তো দৃশ্যান্তর, জন্মের মধ্যে জন্মান্তর—দরকার নেই ওঁর কাছে এসে। ঘরের ছেলে ঘরে পালাই। কখন কি ভেলকি লাগিয়ে দেয় ঠিক নেই।

পরক্ষণেই মন আবার রুখে দাঁড়াল। যদি ভেলকিই হয় বের করে দিতে হবে সে বুজরুকি। যদি পাগলামিই হয় প্রমাণ করতে হবে সে উন্মত্ততা। ছেড়ে দেওয়া হবে না। বিচার-বিশ্লেষণ করে পৌঁছুতে হবে স্থির সিদ্ধান্তে।

ওরে, আমি পাগল। শিশুর চেয়ে সরল, ফুলের চেয়েও শুচি, জননীর চেয়েও স্নেহময়—সেই আত্মভোলা সাধু যেন বলছে নরেনের কানে-কানে। পাগল না হলে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? লোকে টাকার জন্যে পাগল, নাম-যশ প্রভাব-প্রতাপের জন্যে পাগল, একবার ঈশ্বরের জন্যে পাগল হতে দোষ কি। আমায় দে মা পাগল করে, আমার কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে।

শোন, আরো শোন। আমি ভেলকি জানি। মরা নদীতে বান ডাকাই। শুকনো কাঠে ফোটাই বসন্তমঞ্জরী। যে তুচ্ছ তাকে অসামান্য করি। যে ম্রিয়মান তাকে অমিতজীবনের আস্বাদ দিই।

যাই কেননা বলো, ঠিক ধরে ফেলব। তাই সাবধান হয়ে আবার গিয়েছে নরেন। দূরে-দূরে থেকে লক্ষ্য করতে হবে। আর যদি ব্যাকুল হয়ে স্পর্শও করে অমনি একেবারে আচ্ছন্ন হতে দেব না নিজেকে। রূঢ়, দৃঢ় থাকব।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের কাছেই, প্রায় গা-ঘেঁসে, যদু মল্লিকের বাগান-বাড়ি। বেড়াতে-বেড়াতে সেখানেই সেদিন ঠাকুর নিয়ে এসেছেন নরেনকে। কত কথা বলছেন তার ঠিক নেই। কত আনন্দের কথা, ভালোবাসার কথা।

আমি তোমাকে ভালোবাসি। এ-কথা বলার মত আনন্দ আর কি আছে? যদি ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারি, জগতের জনকে জনে-জনে জানাতে পারি সে-কথা। তবে সে আনন্দ দেশহীন দিকহীন আদি-অন্তহীন। অবধি-পরিধিহীন। বল জগতে এসে তুই এই বড় আনন্দটা থেকে কেন নিজেকে বঞ্চিত রাখবি?

যদু মল্লিকের বৈঠকখানায় গিয়ে বসেছেন ঠাকুর। পাশে নরেন। এই ভুবন-লোভনের সান্নিধ্য ছেড়ে দূরে সরে বসে নরেনের সাধ্য কি।

কখন আবার তাকে ছুঁয়ে দিয়েছেন ঠাকুর। কত অবহিত কত ধীর-স্থির করে রেখেছিল নিজেকে, বেঁধেছিল কত অটুট শাসনে, সব এক নিঃশ্বাসে নস্যাৎ হয়ে গেল। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল বুদ্ধি-বিজ্ঞানের অহঙ্কার। আবার ঘটল সেই দৃশ্যান্তর, উঠে গেল ইন্দ্রিয়ের যবনিকা।

কি ঘটল কে জানে।

খানিক পর চর্মচক্ষে চেয়ে দেখল ঠাকুর তার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। সিঞ্চন করছেন করুণার ধারাপাত।

আসল কথাই জিগগেস করা হয়নি এতদিন। সেদিন তাই সেই সরাসরি প্রশ্নই

করে বসল বিলে : 'এত যে মা-মা করো মাকে দেখতে পাও তুমি?'

'দেখতে পাই কি রে!' অগাধ সারল্যে ঠাকুর হেসে উঠলেন : 'তার সঙ্গে বসে কথা কই, খাই, মার পাশটিতে ছোট্টটি হয়ে ঘুমুই—'

বিলেও হেসে উঠল। হেসে উঠল বিদ্রূপে। এ কখনো সম্ভব হতে পারে? একটা পাথরের পুতুল, ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে, বোবা অন্ধ একটা জড়পিণ্ড, সে নড়ে-চড়ে হাঁটে-চলে এ নিছক আজগুবি। কায়াহীন কাব্যকথা। শুধু হাঁটে-চলে না, কথা কয়, হাসে, এমনকি টাকরায় জিভের শব্দ করে খায় নাকি তারিয়ে-তারিয়ে। গাঁজাখুরি আর কাকে বলে? আর, মায়ের ওই তো একটুখানি খাট, তার মধ্যে জড়সড় হয়ে শোন কি করে ঠাকুর?

কিন্তু তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতেও জোর পায় না। এমন যার লাবণ্যঢালা মুখ সে কি মিথ্যে কথা বলতে পারে? কোথাও কি ছলনার এতটুকু তন্তু আছে, কুয়াশার এতটুকু রেখা?

তাই বলে তো বুদ্ধি-বিবেচনা বিসর্জন দিতে পারিনা। ষোলআনা যাচাই করে নেব। যুক্তির শানের উপর আছড়ে ফেলে বারে-বারে বাজিয়ে তবে দেখব খাঁটি না মেকি। ছেড়ে কথা কইব না।

'ও তো একটা পাষাণের পুত্তলী। স্থবির জড়পিণ্ড।'

'জড়পিণ্ড!' ঠাকুরের বিন্দুবিসর্গ রাগ নেই। 'ওরে জড় তো চৈতন্যের ছদ্মবেশ। আর জীব তো ঈশ্বরের প্রতিরূপ।'

'বললেই হল? সব ঈশ্বর?'

'সমস্ত। ধূলিকণা থেকে নক্ষত্রকণা।'

'ঘটি বাটি থালা গ্লাশ—সব?' পরিহাসের ঝাঁজ আর লুকোতে চাইলনা বিলে। ঠাকুর স্নিগ্ধহাস্যে অথচ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'নিশ্চয়। ঘটি বাটি থালা গ্লাশ—সমস্ত।'

হয় এ লোক জেগে-জেগে ঘুমোয় নয়তো ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও দেখে। এর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। তার চেয়ে হাজরার সঙ্গে দুটো কথা কই।

পুরো নাম প্রতাপ হাজরা। বাড়িঘর ছেড়ে দক্ষিণেশ্বরে এসে বসেছে, মতলব ঠাকুরকে ধরে যদি কিছু সুরাহা হয়। ঠাকুর বলেছেন, রাজার বেটা হ, মাসোয়ারা পাবি। রাজার বেটা হবার দিকে ঝোঁক নেই, হাজরার লক্ষ্য মাসোয়ারার দিকে।

কেন থাকবেনা লক্ষ্য? সব পরিশ্রমেরই পুরস্কার আছে আর এই যে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করছি, আসনে বসে এত জপতপ, এত মালাফেরানো, এর বাবদ কোনো মুনফা মিলবেনা? বড়লোকের খোসামুদি করে কত কিছু আদায় করা যায়, আর সকলের যিনি বড়লোক তাঁকে স্তবস্তুতি করে মিলবেনা কিছু চালকলা, দুটো নেহাৎ আলুমুলো? নইলে খাটনি পোষাবে কেন?

'হাজরা শালার ভারি পাটোয়ারি বুদ্ধি।' ঠাকুর সাবধান করে দেন ভক্তদের। 'ওর কথা শুনিসনে। ও জপতপ করে আবার দালালিও করে। টাকাওয়ালা লোক দেখলে কাছে ডাকে।'

বিনিময়ে সুখের বস্তু একটা পাব তার জন্যে ডাকব ঈশ্বরকে? আমি যে ঈশ্বরকেই পেতে চাই—সর্বোত্তম যে সুখ, পরমতম যে প্রাপ্তি। সোনার বদলে গিলটি দিয়ে মন ভোলাব? মণির বদলে কাচ? সোনা ফেলে গ্রন্থি দেব অঞ্চলে?

ঈশ্বর পাওয়ার মানে কি? ঈশ্বর হওয়া। নদী কি সমুদ্রকে পায়? নদী সমুদ্র হয়। ঈশ্বর হওয়া যায় কি করে? মানুষ হয়ে। মানুষ বলে প্রমাণিত হয়ে। সে প্রমাণ হবে কিসে? বড় হয়ে ও ভালো হয়ে। বৃহৎ হয়ে ও মহৎ হয়ে। যখনই মানুষ বৃহৎ আর মহৎ তখনই মানুষ ঈশ্বর।

অত তত্ত্বকথার ধার ধারিনা। হাজরা যা বলে মন্দ বলে না। নরেনের তাই অভিমত। জুটবেনা নগদ বিদায়, হা-পিত্যেশ করে মরব, এমন রাজার দুয়ারে মাথা কুটতে যাব কেন? খাটিয়ে নেবে অথচ জুটিয়ে দেবেনা এ কেমনতরো কারিগর? শুধু ঘসা পয়সা আর পাঁচহাতি একখানা ঠেঁটির বদলে করব না পুরুতগিরি।

ঠাকুর পরিহাস করে বলেন, 'হাজরা হচ্ছে নরেনের ফেরেন্ড।'

বারান্দায় বসে হাজরা তামাকে সাজছে। তার পাশে এসে বসল নরেন। টিকে ধরিয়ে হুঁকোটা নরেনের দিকে বাড়িয়ে দিল। টানতে লাগল নরেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'শুনেছেন, বলছে কী অসম্ভব কথা!'

'কী বলছে?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল প্রতাপ।

'বলছে, ঘটি বাটি থালা গ্লাশ সব নাকি ঈশ্বর। ইট কাঠ লোহা লক্কড়—সমস্ত।'

'পাগলে কি না বলে!' হুঁকোর জন্যে হাত বাড়াল হাজরা।

'শুধু তাই নয়। আমি আপনি—রাস্তার ঐ লোক, নৌকোর ঐ মাঝি—সব নাকি ঈশ্বর।'

হো-হো-হো করে হেসে উঠল হাজরা। যেন কী এক অলীক অসার কথা বলেছে এক অর্বাচীন। সেই ব্যঙ্গের হাসিতে যোগ দিল নরেন।

ঠাকুর ঘরে ছিলেন, সেই ব্যঙ্গের হাসি তাঁর কানে ঢুকল। নিমেষে তিনি একটি বালকের মতন হয়ে গেলেন। বাহ্যজ্ঞানের লেশমাত্র রইলনা। পরনের কাপড়খানি বগলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

'কি বলছিস রে নরেন?' হাসতে হাসতে কাছে এসে ছুঁয়ে দিলেন নরেনকে। ছুঁয়েই সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

সর্ব-অঙ্গে শিউরে উঠল নরেন, নিগূঢ়তম শিরাতন্তুতে। যেমন বসন্তস্পর্শে পুষ্পতরু। অন্ধকারের স্পর্শে তারা-ফুটে-ওঠা ধূসরাম্বর।

বুঝি একেই বলে স্পর্শমণি। লোহার সোনা হয়ে ওঠা। মৃত্তিকার হয়ে ওঠা স্বর্গ।

যেন চোখের সমুখ থেকে একটা পর্দা সরে গেল। দুই চর্মচক্ষু বুজে গিয়ে জেগে উঠল অমর্তচক্ষু, অমৃতচক্ষু। চেয়ে দেখল সমস্ত কিছু প্রাণময় গতিময় জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। সমস্ত কিছু একটা দীপ্ত সত্তায় উচ্চারিত। সমস্ত কিছু ঈশ্বরময়, ঈশ্বরঝঙ্কৃত।

একেই বুঝি বলে মুক্তি। দৃষ্টির মুক্তি। অন্তরের সুইচবোর্ডে অজানা একটি

সুইচ টিপে দিল কে, নবীন আলোকে অদেখা আলোকে সমস্ত কিছু আলোকময় হয়ে উঠল। নতুন চেতনায় নতুন চাঞ্চল্য। নতুন পরিধেয়ে নবতন পরিচয়।

দেখল নিজেকে। দেখল ঈশ্বরকে। দেখল ঈশ্বরছাড়া কিছু নেই। ঘটি বাটি থালা গ্লাশ হুঁকো কলকে হাজরা দত্ত সব ঈশ্বর। মাঝিমাল্লা মুটে মজুর কামার ছুতোর জেলে জোলা সব ঈশ্বর। ব্রাহ্মণ-আচণ্ডাল। আব্রহ্মস্তম্ব।

এমনিতরো দেখাই বুঝি ঈশ্বরকে দেখা।

এ কি, চোখে ঘোর লাগল নাকি? চোখ বুজল নরেন। অন্ধকারেও সেই ঈশ্বর। সেই চৈতন্যদ্যুতি। হাজরা রইল সেই শুকনো কাঠ হয়ে, উদ্‌ভ্রান্তের মত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল নরেন। পথঘাট গাড়িঘোড়া সব যেন জ্বলন্ত প্রাণস্রোত। অনন্তযাত্রার বেগোচ্ছ্বাস।

বাড়িতে এসেও সেই ভাব। ইট কাঠ কড়ি বরগা দরজা জানালা কিছুই আর জড়বস্তু নয়, সব প্রাণচঞ্চল, বেগচঞ্চল। খাট চৌকি চেয়ার টেবিল বিছানা বালিশ—সমস্ত। সব কিছুর মধ্যে ঈশ্বরই বসে আছেন, ঈশ্বরই নড়ছেন-ফিরছেন। কোনো কিছুকে ঈশ্বর থেকে আলাদা করে নেওয়া যাচ্ছে না। সব কিছু ঈশ্বর-বহমান ঈশ্বর-ভাসমান।

মা খাবার দিয়ে গেলেন। নরেন খেতে বসল।

আশ্চর্য, ডাল-ভাত মাছ-তরকারি, তারও মধ্যে ঈশ্বর বসে আছেন।

'কি রে, বসে আছিস কেন? খা।' মা তাড়া দিলেন।

কে পরিবেশন করছে? কে খাচ্ছে? কাকেই বা খাচ্ছে? সব সেই ঈশ্বর। দাতা ঈশ্বর, ভোক্তা ঈশ্বর, ভোগ্যভোজ্যও ঈশ্বর।

বিরাট একটা অনুভূতির দেশে চলে এল নরেন। যেন ডাঙায়-ওঠা মাছ নেমে পড়ল তার আপন সরোবরে। স্বধাম-সরোবরে।

কিন্তু এ কি আনন্দ, না, যন্ত্রণা? নাকি যন্ত্রণাময় আনন্দ?

পরদিন সকালে রাস্তায় নেমেও সেই দশা।। ঐ যে গ্যাসপোস্ট দাঁড়িয়ে আছে ও কি শুধু গ্যাসপোস্ট? ও তো ঈশ্বর, ও তো আমি। ঐ যে গাড়ি আসছে ছুটে ওই তো ঈশ্বর ছুটে আসছে, আমাকে, ঈশ্বরকে জড়িয়ে ধরতে। যে মারে আর যে মরে সব ঈশ্বর। হাড়িকাঠ বলি খড়্গ ঘাতক—সমস্ত। বিনাশও ঈশ্বর উদয়ও ঈশ্বর। বিনাশের পৃষ্ঠপটে অবিনাশী আবির্ভাব।

বিকেলে বেড়াতে এসেছে হেদোয়। লোহার রেলিঙে মাথা ঠুকছে নরেন। আর আর্তনাদ করছে, বল তুই কে? তুই কি ঈশ্বর? তুই কি আমি?

৯

যদু মল্লিকের বাগানে গিয়ে আবার কাঁদতে বসেছেন ঠাকুর।

ওরে আয়, দেখা দে। সেই যে চলে গেলি আর এলিনে। তোকে না দেখলে

যে চোখ ব্যথা করে। বুকটা শূন্য ঠেকে। ক্ষুধা-নিদ্রা উড়ে পালায়।

ওরে আয়। বিনিদ্র চোখে শীতলবাহিনী সুষুপ্তির মত। শোকার্ত বুকে সন্তাপনাশিনী সান্ত্বনার মত। ওরে আয়, শুকনো মাঠে যেমন আকাশঢালা বৃষ্টি নেমে আসে।

আশেপাশের লোক বিদ্রূপ করে ঠাকুরকে। 'কে না কে এক কায়েতের ছেলে তার জন্যে এত আকুলিব্যাকুলি।'

সত্যিই তো, কার ছেলে, বাপ কি করে, কেমন অবস্থা, কোথায় ঠিকানা, কিছুই তো জিগগেস করিনি। কি আশ্চর্য, ভুলে গিয়েছিলাম একেবারে। এমন ভুলও হয় মানুষের!

কি করব, ও যে সব-ভোলানো! কী হবে জেনে আমার ওর নামগোত্র, ওর কুলকোষ্ঠী, ও আপনাতেই আপনার পরিচয়। নিজের কীর্তিতে নিজের দীপ্তিতে চরিতার্থ। নিজের অস্তিত্বে অর্থান্বিত। ওকে দেখলেই সব দেখা, শেষ দেখা হয়ে গেল। ও যে আর কিছু দেখতে দেয় না।

'কি যে বলেন মশাই তার ঠিক নেই।' আরেকজন টিপ্পনি কাটে : 'ঐ তো ওর সামান্য পড়াশুনো, দুটো মোটে পাশ করেছে। ওর জন্যে অধীর হওয়া কি সাজে?'

তোর জন্যে অধীর হব তুই কী পড়াশুনো করেছিস তার বিচার করে? লোকে যখন কাঁদে তখন কি শাস্ত্র-ব্যাকরণের খবর নেয়?

সামান্য পড়াশুনো? বলো কি তোমরা? ওর জুড়ি আর একটাও ছেলে আছে ত্রিসীমায়? যেমন গাইতে-বাজাতে তেমনি বলতে-কইতে তেমনি আবার লেখায়-পড়ায়। এতটুকু মেকি নেই ওর মধ্যে, বাজিয়ে দেখ গিয়ে, টং টং করছে। তাছাড়া জানো আসল খবর? রাতভোর ধ্যান করে ও। ধ্যান করতে-করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁস থাকে না। ও কি হেঁজিপেঁজি? ও ব্রহ্মময়ীর বেটা।

কিন্তু যার জন্যে এত মমতা এত আকুলতা তার এতটুকু করুণা নেই।

সেদিন যদি বা এল, বললে মুখের উপর, 'তুমি ঈশ্বরের রূপ-টুপ যা দেখ সব তোমার মনের ভুল।'

আবার সেই কথা?

হ্যাঁ, আবার সেই কথা। ঘুরে-ফিরে আবার সেই সন্দেহ। বারে-বারে পড়ি, বারে-বারে উঠি। একবেলা মানি তো আরেকবেলা মাথা ঠুকি। এক ঢেউয়ে উঠে আরেক ঢেউয়ে তলিয়ে যাই।

'সে কি রে? নিজের চোখে দেখি যে সব। শুনি সব স্বকর্ণে। নিজের চোখ-কানকে অবিশ্বাস করব?' শিশুর সহজ সারল্যে তাকিয়ে থাকেন ঠাকুর।

'মাথার গরমে ছায়া দেখেন।' জোর গলায় বললে নরেন, প্রায় নিষ্ঠুরের মত, 'হাওয়ায় কোথায় কি শব্দ হয় আর ভাবেন ছায়া বুঝি কথা কইছে!'

'তুই বললেই হল?'

'আর আপনি বললেই বা হবে কেন? প্রমাণ কি?' নরেন রুখে দাঁড়াল।

প্রমাণ কি! ঠাকুর তাকিয়ে রইলেন আবিষ্টের মত। কি হলে, কেমন করে হলে

প্রমাণ হয়? সামনে যে ওটা একটা গাছ কি করে প্রমাণ করবে? বৃক্ষরূপে ও যে ঈশ্বর দাঁড়িয়ে নেই তাই বা তোমাকে কে বললে?

'পশ্চিমের বিজ্ঞান হাতেনাতে দেখিয়ে দিয়েছে চোখ-কান অনেক জায়গায় ভুল দেখে, ভূত দেখে।' বললে নরেন। 'আপনি যা সব দেখছেন-শুনছেন সব আপনার সেই চোখ-কানের ভুল। নইলে যা সত্যি অদৃশ্য তাকে দেখা যাবে কি করে? যা অচল তা কি করে নড়বে-চড়বে?'

(আমার মধ্যে তো প্রাণ আছে। বের করে দেখাও সেই প্রাণ। না দেখেও সেই প্রাণকে তো স্বীকার করছ। আমার মধ্যে তো মন আছে। কত সে উড়ছে-ঘুরছে, দশদিগন্ত পার হয়ে কত দেশ-দেশান্তর। সে মনকে স্থূল চক্ষুর বিষয়ীভূত করো। মন আবার ব্যথা পায়, মন আবার তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। প্রমাণিত করো সেই মন, দেখাও তার আকার-প্রকার। পারো, পারো দেখাতে?)

ওধার থেকে হাজরা আবার ফোড়ন দেয় : 'শুধু হাঁটে-চলে নয়, হাত বাড়িয়ে সন্দেশ-কলা খায়। নূপুর বাজিয়ে নাচে।'

'সব ধোঁকা, ধাপ্পাবাজি।' বলে চলে গেল নরেন।

সব যেন ফাঁকা মরুভূমি হয়ে গেল। এ কখনো হতে পারে? যা তিনি এতদিন দেখে এসেছেন চোখের উপর, অনুভব করেছেন স্পর্শের মধ্যে, সব ভুয়ো, ভিত্তিহীন? মন্দিরে গিয়ে মায়ের কাছে কেঁদে পড়লেন ঠাকুর। মা, নরেন যা বলে গেল এ সত্যি? তুই শুধু পাথরের পুতুল? তুই বোবা, কথা কইতে পারিস না? তুই কালা, শুনতে পাস না আর্তনাদ? তুই অনড়, অচল, তুই শুধু আলস্যের পিণ্ড?

মা নড়ে উঠলেন। কথা কয়ে উঠলেন। বললেন, ওর কথা শুনিস কেন? যাক না কিছুদিন, ও নিজেই একদিন দেখতে পাবে আমাকে। মন্দিরে এসে দাঁড়াবে আমার সামনে। কিছু ভাবিসনে। আজ কঠিন হয়ে আছে, থাক, দেখবি কদিন পরেই নেই আর কাঠিন্য। বিশ্বাসে ঘনীভূত, ভক্তিতে দ্রবীভূত হয়ে গিয়েছে।

তাই বলো। আশ্বস্ত হলেন ঠাকুর। আসুক আরেকবার, সোজা তাড়িয়ে দেব এখান থেকে। যাকে মানে না, গ্রহণ করে না, তার কাছে আসা কেন?

ঘনঘোর দুর্যোগের রাত্রে এসেছে এবার। তাও নৌকোয় করে, আকাশজোড়া বিপদ-বাধা মাথায় নিয়ে।

ধাপ্পাবাজি বলে তো চলে এলাম, কিন্তু আগাগোড়া বুজরুকি এই বা প্রাণে ধরে বলতে পারি কই? সত্যের দ্বারা বাক্যের শোধন হয়। এঁর যা বাক্য এ তো দহন-উত্তীর্ণ সোনার মত পরিশুদ্ধ, ধূমলেশহীন আগুনের মত পরিচ্ছন্ন। এর মধ্যে অপলাপের ছায়া কোথায়? তাই বলে, আবার খটকা লাগে নরেনের, তাই বলে একটা প্রস্তরপুত্তলি হাঁটে-চলে তাই বা সশরীরে বিশ্বাস করি কি করে? নিশ্চয় কোনো গোপনরহস্য আছে। সে রহস্য আবিষ্কার করতে হবে। নইলে সুখ নেই, স্থৈর্য নেই।

এই দুর্যোগের রাত্রিই সেই আবিষ্কারের সুবর্ণক্ষণ। নিশ্চয়ই এখন কেউ নেই ঠাকুরের আশেপাশে। তার মত ডানপিটে আর কে আছে যে ঝড়জল মাথায় করে

চলে আসবে অসময়ে? শয্যার আরাম ছেড়ে? একলাটি আছেন ঠাকুর, চুপিচুপি উঁকিঝুঁকি মেরে এবার ঠিক দেখে নেব কাণ্ডখানা, জারিজুরি ধরে ফেলব।

ঠাকুর ঠিক টের পেয়েছেন পায়ের শব্দ।

'কে?'

নরেন চুপ।

'কে, নরেন?' ডেকে উঠলেন ঠাকুর। 'আয় ভিতরে আয়।'

কত বড় আশ্রয়ের ডাক। অমৃতনির্ঝর। কেন সংশয়সন্দেহের ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস? আয় আমার এই স্নেহচ্ছায়ানিবিড় পক্ষিনীড়ে।

দরজা খোলা। ঢুকে পড়ল নরেন।

আসনে বসে আছেন ঠাকুর। কোথায় কি ভোজবাজি, কোথায় কি ভানুমতীর খেলা, সহজ আনন্দে বসে আছেন তন্ময় হয়ে। যা সহজ তার রহস্যভেদই বোধহয় সব চেয়ে কঠিন। যা সরল তার কে পরিমাপ করবে?

বিরক্তির ভাব দেখিয়ে ধমকের সুরে ঠাকুর বললেন, 'তুই আমাকে নিস না, মানিস না, তবু তুই আসিস কেন?'

সত্যিই তো, কেন আসি? চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল নরেন।

হ্যাঁ, কেন আসিস? উত্তর দিতে হবে তোর। কোথাকার কে এক মুখখু পুজুরী বামুন, দক্ষিণেশ্বরের কালীঘরে পড়ে থাকে, সে কী করে না করে, কী দেখে না দেখে, তাতে তোর কী মাথাব্যথা? আরো কত হয়তো পুজুরী বামুন আছে এখানে-ওখানে, তাদের কাছে যাস, না, তাদের ঘরে গিয়ে উঁকি মারিস? কী এমন তোর দায় যে দুর্যোগ মাথায় করে আসতে হবে? বাড়ির কাছের গলি নয়, নয় বা কিছু এক-ডাকের পথ, তাও এই রাতে, নৌকা করে! কিসের গরজ, কিসের কি! আমি কার সঙ্গে কি কইলুম বা না-কইলুম, কার নড়াচড়া দেখলুম কি না-দেখলুম তাতে তোর কি এসে গেল? যাকে বিশ্বাস করিস না তার কাছে কেন আসিস? কেন?

যে প্রশ্ন নিয়ে এসেছিল ঠিক সেই প্রশ্নেরই মুখোমুখি দাঁড়াতে হল নরেনকে। দাঁড়াতে হল উত্তরের জন্যে! সে উত্তর ঠাকুরকে নয় তাকেই এখন দিতে হবে। ঠাকুরের রহস্য নয়, তার নিজের রহস্যেরই উন্মোচন চাই। সত্যি, সে কেন আসে? কেন এসেছে এই দুর্যোগের নদী পেরিয়ে? যার সঙ্গে মতান্তর তার প্রতি আবার মমতা কেন? যাকে সে মানেনা সেই আবার টানে কি করে? যাকে তাড়িয়ে দেয় আবার গিয়ে তারই পায়ে পড়ে? যে আক্রমণ সয় তারই এত আকর্ষণ?

উত্তরের জন্যে অন্ধকার হাতড়াতে লাগল নরেন। অন্তরের অন্ধকার। সত্যি, কেন আসি?

চুপ করে থাকতে দেব না। দেব না পাশ কাটাতে। সোজাসুজি মুখোমুখি উত্তর দে। কেন এই অসাধ্য-আয়াস? এত কষ্টক্লেশ? এত ছুটোছুটি। কেন আসিস? আমাকে নিসনা, মানিস না, তবু আসিস কেন?

'কেন আসি?' উত্তর পেয়েছে নরেন। চোখে জল এসে গিয়েছে। গদ্গদভাবে

বললে, 'কেন আসি? আসি, তোমাকে ভালোবাসি বলে।'

ভালোবাসা। মহাশক্তি, অনন্তশক্তি ভালোবাসা। জানিনা তবু টানে। মানিনা তবু টানে। এক ফোঁটা চাঁদ, বিশাল বারিধিকে উত্তাল করে তোলে। এতটুকু একটা ছুরির আঘাত, সমস্ত রক্তকে নিরর্গল করে দেয়।

আনন্দে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ঠাকুর। দু বাহু মেলে বুকের উপর জড়িয়ে ধরলেন নরেনকে। বললেন, 'আর সকলে স্বার্থের জন্যে আসে। নরেন আসে আমাকে ভালোবাসে বলে।'

অহেতুক ভালোবাসা। কিছু চাই না তবু ভালোবাসি। এই ভালোবাসার টানেই রাজপুত্র সিংহাসন ছেড়ে চলে যায় বনবাসে। এই ভালোবাসার স্পর্শেই সমুদ্ধত পাহাড় একতাল নবনী হয়ে যায়। মেদুরমধুর নবনী।

ওরে, এই অহেতুক অকপট ভালোবাসার নামই ভগবান।

•

১০

বিনা মেঘে বাজ পড়ল। বিশ্বনাথ দত্ত হঠাৎ মারা গেলেন।

বরানগরে বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্নে এসেছে নরেন। খেয়েদেয়ে রাত্রে ঘুমিয়েছে, খবর এল, বাবা হার্ট ফেল করে মারা গেছেন।

আরামশয্যা থেকে কে সহসা উপড়ে তুলে আনল নরেনকে। প্রথমটা বিমূঢ় হয়ে গেল। বাবা নেই? এই দেখে এলাম স্পষ্ট সতেজ, সুস্থসমর্থ, চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতেই নেই? এ কখনো হতে পারে?

হতে পারে কি, হয়েছে।

মৃত্যু এসে মনে করিয়ে দিয়েছে, জীবনের কত নিকটতম সে প্রতিবেশী। সুদূরতম নয়, নিকটতম। কেউ অপেক্ষাও করেনা, দুয়ারে এসে দেখা দেয় অতিথির মত। ভিক্ষার ধন আদায় করে নিয়ে যায়। কোনো কৈফিয়ৎ দেয় না, প্রস্তুত নই বলে শোনেনা কোন কাকুতি-মিনতি। কালাকালের ধার ধারেনা। ছোঁ মেরে নিয়ে যায় ছিনিয়ে।

শুধু তাই? মৃত্যুর মানে শুধু এইটুকু?

জানা-র দিগন্তরেখা যেখানে শেষ হয়েছে তার বাইরে যেন আরেক জগৎ আছে, অজানা-র জগৎ, সে জগৎ দিগন্তহীন। জানা-র রঙ্গমঞ্চে যেখানে শেষ পর্দা পড়েছে, মৃত্যু এসে সেই পর্দা একটু সরিয়ে দিল। সরিয়ে দিয়ে দেখাল অজানা-র নেপথ্যলোক। অনন্ত জগৎ, অনন্ত যাত্রা। জন্ম-মৃত্যু আছে বলেই একটি ছন্দোবন্ধ কবিতা আছে। সমমাত্রিক কবিতা। আর, কবিতা যদি থাকে, তবে নিশ্চয়ই তার একজন রচয়িতা আছেন। সে রচয়িতার নামই ঈশ্বর।

অনেক ভাবে বোঝান, আমি আছি। শেষে মৃত্যু হয়ে বোঝান।

তুমি তো আছ, বুঝলাম, কিন্তু আমার এখন গতি কী হবে! কি করে সংসার

চালাব? ছোট ভাইবোনদের খাওয়াব কি! মায়ের মুখের দিকে চাইব কোন মুখে?

প্রথমটা মন্ত্রের মত হয়ে গেল নরেন। শেষে একেবারে মাটিতে বসে পড়ল যখন জানল বাবা এক পয়সাও রেখে যাননি।

কিন্তু মাটিতে বসে পড়বার ছেলে নরেন নয়। সে উঠে দাঁড়াল। আর কিছু না থাক, তার দুই দৃপ্ত বাহু আছে। আর আছে ক্লান্তি-না-মানা নগ্ন দুই পা।

পরাঙ্মুখ মাটিকে পরাভূত করে খুঁজে আনব তৃষ্ণার পানীয়। হটবনা, হারবনা কিছুতেই।

পায়ে জুতো নেই, গায়ের জামাটা ছেঁড়া, চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল নরেন। এ অফিস থেকে ও অফিস। এ দরজা থেকে ও দরজা। সর্বত্র এক জবাব। নো ভেকেন্সি। স্থান নেই, সংস্থান নেই। অন্যত্র পথ দেখ। নেই ভিক্ষান্নমুষ্টি। দারিদ্র্যের দাবদাহে নেই এতটুকু করুণার মেঘখণ্ড।

বন্ধুরা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। সুখীরা অনুকম্পা দেখায়। আর উদাসীন জনস্রোত ফিরেও তাকায় না। মায়ের অসহায় মুখখানি মনে পড়ে। ছোট-ছোট ভাইগুলির আর্ত অবোলা চোখ চোখে ভাসে।

হা ঈশ্বর, তুমি আছ? আছ তো, তোমাকে লোকে দয়াময় বলে কেন? উপবাসী শিশুর মুখ দেখেও যার মন গলেনা, সে দয়াময়?

শূন্যের দিকে চেয়ে কার কাছে প্রার্থনা করব? কে সে তা কে বলবে? সে কানে শোনে কিনা চোখে দেখে কিনা তারও বা ঠিক কি। তার চেয়ে নিজের কাছে প্রার্থনা করি। প্রার্থনা করি আত্মশক্তির কাছে। আমি যেন না ভেঙে পড়ি, আমি যেন না ক্ষান্ত হই, আমি যেন না হার মানি কিছুতেই।

'এ কি স্নান করে উঠেই চললি কোথায়?' সকালবেলা মা এসে দাঁড়ালেন পথের সামনে। 'খাবিনে?'

চোখ নামাল নরেন। বললে, 'বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে।' বলে শুকনো মুখে বেরিয়ে গেল।

মনে কেমন খটকা লাগল ভুবনেশ্বরীর। তবে কি নরেন ছলনা করল? ঘরে আজ যথেষ্ট খাবার নেই, ছোট ভায়েদের স্বল্প গ্রাসে ভাগ বসাবেনা তারই জন্যে কি মায়ের চোখে ধুলো দিল? তবে কি নরেন সারা দিন অনশনে থাকবে?

খালি পায়ে ঘুরে-ঘুরে পায়ের নিচে ফোস্কা পড়েছে। এখন একটু বিশ্রাম না করলে আর নয়! গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের নিচে একটু বসছে নরেন। কিন্তু একটু নিরিবিলি থাকবে তার সাধ্য নেই। কোত্থেকে এক বন্ধু এসে হাজির। সুখী, ধনী বন্ধু। যখন দেখতে পেয়েছে নরেনকে তখন নিশ্চয়ই দুটো সহানুভূতির কথা বলবে। সব সহ্য হয়, অসহ্য শুধু ধনী বন্ধুদের সমবেদনা। ধার-করা ভদ্রতার বুলি।

কিন্তু এ বন্ধুটি অভিনব। গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠেছে। 'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিশ্বাস পবনে—'

শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল নরেন। বললে, 'রাখ তোর ব্রহ্মনিশ্বাস।

যারা খেয়ে-পরে সুখে-শান্তিতে আছে তারাই বলতে পারে, বুঝতে পারে ব্রহ্মনিশ্বাস। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে টানাপাখার হাওয়া খাচ্ছে, ভাবতে পারছে ব্রহ্মনিশ্বাস খাচ্ছি। আর যার মা-ভাইয়েরা উপোস করে আছে, দোরে-দোরে ঘুরে যে আজ পর্যন্ত একটা চাকরি জোটাতে পারল না, তার কাছে আর ব্রহ্মনিশ্বাস নেই, যা আছে তা বজ্রনিশ্বাস।'

বন্ধুর গান বন্ধ করে দিল নরেন। যার পেটে ভাত নেই তার আবার ভগবান কি! যার ভাত নেই তার জাত নেই, তার ভগবানও নেই। এখন অন্নের কথা বলো। তারপরে শোনা যাবে অন্যকথা।

ঠনঠনের ঈশান মুখুজ্জেকে ধরেছেন ঠাকুর।

বললেন, 'হ্যাঁ গা, নরেনকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারো? বাপ মারা গেছে, আঁধার দেখছে চারদিক। কত ঘোরাঘুরি করছে, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।'

নরেনকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কত যুগ হয়ে গেল আর আসেনা এদিকে।

এসে কি করবে? একটা চাকরি জুটিয়ে দেবার ক্ষমতা আছে তোমার? তোমার মা তো কত শক্তি ধরেন শুনি, একটা চাকরি পাইয়ে দিতে পারেন না?

তবু কি ভেবে গেল ঠাকুরের কাছে। প্রণাম করে পাশটিতে এসে বসল।

ঠাকুর তাকে কাছে টেনে নিয়ে কানে-কানে বলার মত বললেন, 'ওরে আর ভাবনা নেই। তোর কথা ঈশানের কাছে বলেছি। বহুৎ লোকের সঙ্গে তার আলাপ আছে। একটা কিছু শিগগিরই যোগাড় হয়ে যাবে দেখিস—'

নরেন হাসল। এমন কত আশ্বাস কত জনে দিয়েছে। মৌখিক একটা আশা দিতে আর পরিশ্রম কি!

কিন্তু ঈশানের কাছে কেন? তোমার ঈশানীকে একটু বলতে পারো না?

কত লোককে যে সাধছেন নরেনের জন্যে তার লেখাজোখা নেই। ওগো, আমার নরেনকে দেখেছ? দেখ দেখি কেমন সে হয়ে যাচ্ছে দিন-দিন। তার গৌর তনু কালো হয়ে গেল! এক পা ধুলো, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, পরনের কাপড়খানি ময়লা। সারাদিন টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে পথে-পথে। ওগো তোমরা ওর একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারো না? যাতে ও একটু শান্তি পায়, সুদিনের মুখ দেখে।

শেষ পর্যন্ত নরেনের বন্ধু অন্নদা গুহকে ধরলেন।

'তোমরা তো নরেনের সব বন্ধুবান্ধব—'

অন্নদা থমকে দাঁড়াল। অন্নদার সঙ্গে নরেন মেলামেশা করে বলে ঠাকুর খুশি নন। অন্নদা ভাবল, সেই সূত্র ধরে কিছু তিরস্কার করবেন বোধহয়।

না, তিরস্কার নয়, অনুনয়। প্রার্থনা।

'তোমরা নরেনের সব বন্ধুবান্ধব যদি তার এই অভাবের দিনে কিছু-কিছু সাহায্য করো তো বেশ হয়।'

কথাটা কানে উঠল নরেনের। শেষকালে, আর লোক পেলেন না, অন্নদার কাছে সাহায্য চাইলেন!

তেড়েফুঁড়ে চলে এল ঠাকুরের কাছে। বকতে লাগল। 'আপনার কি কান্ডজ্ঞান বলে কিছু নেই? অন্নদা—অন্নদাকে বলতে গেলেন? দুনিয়ায় আর আপনি লোক পেলেন না?'

ঠাকুরের দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। বললেন, 'ওরে তোর জন্যে যে আমি দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষে করতে পারি।'

যাই বলো, ঠাকুরের কাছটিতে এসে বসলে মনপ্রাণ ঠাণ্ডা হয়, দেহের ক্লান্তি উড়ে পালায়। অভাবের কথা মনে থাকে না। মনে হয় অপারেরও বুঝি পার আছে। কষ্টের উপলখণ্ডের মধ্যেই আছে কৃপার নির্ঝরধারা।

ঠাকুর বললেন, একটা গান গা।

'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিশ্বাস পবনে—' গান ধরল নরেন।

পঞ্চবটীতে নরেনকে ডেকে নিয়ে এলেন ঠাকুর। নির্জনে, নিরালয়ে। নিম্ন-গাঢ়স্বরে বললেন, 'শোন, তোকে একটা কথা বলি।'

মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল নরেন।

'শোন আমার মধ্যে অষ্টসিদ্ধির আবির্ভাব হয়েছে। আমি তোকে তা দিয়ে দিতে চাই। নিবি?'

এ নিলে বোধহয় সব অভাব অনটন মিটে যায়। সংসার বোধহয় স্বাচ্ছন্দ্যে হেসে ওঠে। সুখের জোয়ারে আবার সবাই গা ভাসাই।

'কিন্তু' নরেন বললে, 'ও নিলে কি আমার ঈশ্বরদর্শন হবে?'

'না, তা হবেনা। ঈশ্বরদর্শন ছাড়া আর সব কিছু হবে। যা তুই চাস।'

'চাই না।' অর্থ যশ শক্তি প্রতিপত্তি সব থু করে দিল নরেন। 'যা দিয়ে আমার ঈশ্বরদর্শন হবেনা তা নিয়ে আমার লাভ কি?'

যা নিয়ে আমি অমৃত হতে পারবনা তা দিয়ে আমি করব কি!

গৌরবে ভরে উঠলেন ঠাকুর। এই না হলে নরেন! ওরে আমরা হলুম নর আর ও নরের মধ্যে ইন্দ্র!

১১

'কোথায় চলেছেন!' পথের মধ্যে কে যেন হঠাৎ ডেকে উঠল চেনা সুরে।

এদিক ওদিক তাকাতে লাগল নরেন।

'এই যে, আসুন না, আমার গাড়িতে—'

ছ্যাকড়া গাড়ির কোচোয়ান। খালি গাড়ি নিয়ে চলেছে এদিক দিয়ে। অনেক দিনের চেনা। অনেক দিনই ভাড়া খেটেছে নরেনের। নিয়েছে ভাড়ার উপরে ভারি হাতের বকশিশ।

মিছিমিছি হেঁটে-হেঁটে চলেছেন কেন? আমার গাড়ি যখন খালি—আসুন, আসুন, আকুল হয়ে ডাকতে লাগল কোচোয়ান।

আমার পকেটও খালি। জামার পকেট দুটো উলটো করে দেখাল নরেন।

'তাতে কি? আপনার পয়সা লাগবেনা গাড়ি চড়তে। অনেক নিয়েছি, অনেক খেয়েছি আপনার'—

ত হোক। তুমি এগোও, অন্য সোয়ারী ধরো। আমি হেঁটে-হেঁটেই কিনারা করব এ পথের। আর যদি কোনোদিন গাড়ি পাই, সোয়ারী হব না, তোমার মত কোচোয়ান হব। বাঁ হাতে লাগাম আর ডান হাতে চাবুক তুলে নেব। কর্ম আর ধর্ম দুই ঘোড়া ছুটিয়ে দেব দুর্জয় উৎসাহে। ছ্যাকড়া গাড়ি এ দেশ, শুধু জাড্যের জড়পিণ্ড, তাকে নিয়ে যাব রাজসিকতার রাজধানীতে। ঘোড়ার খুরে-খুরে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাবে দারিদ্র্য আর পরাধীনতার পাথর।

আমি এমনি হেঁটে-হেঁটেই চলে যাই।

কথাও কানে হাঁটে। হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। ভাসতে-ভাসতে এসে পোঁছল একদিন ঠাকুরের কাছে।

কি কথা?

নরেন বকে গিয়েছে। সংসারের দুঃখদুর্দশা ভুলতে বিপথে পা বাড়িয়েছে। আরেক পা এগুলেই জাহান্নম।

ভবনাথ এসে কেঁদে পড়ল ঠাকুরের পায়ে। বললে, 'এমন যে হবে স্বপ্নেরও অগোচর।'

'কি হয়েছে?' ঠাকুর থমকে দাঁড়ালেন।

'নরেন যে এমন সর্বনাশ ঘটাবে—সেকি, আপনি শোনেন নি?'

'চুপ কর্। ফের নরেনের বিরুদ্ধে কোনো কথা কইবি তোদের মুখ দেখবনা বলে দিলুম।'

রাত্রে চলে গেলেন মন্দিরে মায়ের কাছে। নরেনের জন্যে কাঁদতে, প্রার্থনা করতে।

আরো একবার গিয়েছিলেন। তখন তার বাপ বেঁচে। কোথায় কোন বড়-লোকের মেয়ের সঙ্গে নরেনের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছেন ঠাকুরের কানে এসেছে। তাহলে কি হবে, নরেনও যদি বাঁধা পড়ে যায়! চুপিচুপি মায়ের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লেন। মা, বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা বলে-বলে জিভ জ্বরে গেল, নরেন আর ভবনাথের মত গোটাকয়েক ছেলে রেখে দে আমার জন্যে, যাদের সঙ্গে কইতে পারি দুটো প্রাণের কথা, যাদের দেখে যাদের শুনে স্নিগ্ধ হতে পারি অমৃতে—

মা বলে দিয়েছিলেন, ভয় নেই। হবেনা বিয়ে।

আবার তেমনি কেঁদে পড়লেন মায়ের কাছে। মা, নরেন আমার এমন রাঙা চক্ষু রুই, ডোবা পুষ্করিণীর মধ্যে বড় দিঘি, সে কখনো বকে যেতে পারে? যে খাপখোলা তলোয়ার, তাতে কখনো ধরতে পারে মর্চে? সংসারে এমন কি মোহবন্ধন থাকতে পারে যে তাকে বশীভূত করবে? জলগুল্ম দিয়ে কি বাঁধা যায় হাতিকে? মা, তুই বলে দে—

মা বলে দিলেন, ভয় নেই। নরেন নির্মল, নির্মুক্ত, প্রকৃতিবিকৃতিশূন্য। ধোঁয়া

ছাদ-দেয়াল মলিন করতে পারে কিন্তু আকাশের কি করবে? পাশবদ্ধ জীব নয় ও, ও পাশমুক্ত শিব।

কে এক ধনীর সুন্দরী মেয়ে নরেনকে পতিরূপে বরণ করতে চায়। এ প্রস্তাব গ্রহণ করলে নরেনের দুর্দিনের অবসান হবে। কে জানে এই দুর্দিনই চিরন্তন দাক্ষিণ্য। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল নরেন।

কিন্তু সেই মেয়ে দেখা করতে এল গোপনে। হয়তো সাক্ষাৎদর্শনে ফল ফলবে এই ভেবে। নরেন বিচলিত হলনা। কাঁদতে বসল মেয়ে। নরেন বিগলিত হবার নয়।

নিশ্চিন্ত হলেন ঠাকুর।

আমি জানিনা ও কে! ও সপ্তর্ষির এক ঋষি। ওর পুরুষের সত্তা, অখণ্ডের ঘর। ও স্বতঃসিদ্ধ। কেশবের যদি একটা শক্তি থাকে নরেনের তেমনি আঠারোটা শক্তি আছে। কেশবের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলছে আর নরেন স্বয়ং জ্ঞান-ভানু। আর সকলকে সেবা করতে দিই, নরেনকে দিই না। ওরে আমিই যে তার সেবক, তার দাসানুদাস।

সবই জানি, তবু মাকে জিগগেস করে পাকাপাকি নিশ্চিন্ত হলুম।

কিন্তু নরেন নিশ্চিন্ত হতে পারছে কই?

এটা-ওটা অনুবাদ করে সামান্য কিছু মাঝে-মধ্যে রোজগার করছে বটে, কিন্তু তাতে সংসারের বিরাট গ্রাসের আচ্ছাদন অসম্ভব। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করতে না পারি, কেন তবে জন্মালুম মানুষ হয়ে?

ঠাকুর বলেন, কে মানুষ? যে মান-হুঁস সেই। অর্থাৎ নিজের মান সম্বন্ধে যে সচেতন সেই মানুষনামবাচ্য। আর, মান অর্থ যেমন সম্মান তেমনি আবার পরিমাণ। অর্থাৎ দুই অর্থেই যে সজ্ঞান সেই মানুষ। অর্থাৎ যে জানে সে কে, সে কতটা। সে যে ছোট নয়, তুচ্ছ নয় সে যে অমৃত সে যে অনন্ত এই বোধে যে উদ্বোধিত। সে যে শুধু বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নয়, সে যে স্বয়ং বিশ্বনাথ এই সংজ্ঞায় যে চৈতন্যময়।

পরনে শতচ্ছিন্ন চেলী, পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলের সামনে পড়ে গিয়েছেন ভুবনেশ্বরী। যেন ধরা পড়ে গিয়েছেন। বললেন, 'আমাকে একখানা চেলি কিনে দিতে পারিস? ওটা পরে আর পুজো করা যায় না।'

নরেন চোখ নামাল। দু মুঠো ভাত জোগাড় করতে পারছে না, সে চেলি কিনে দেবে!

না বললেও পারতেন, মনে হ'ল ভুবনেশ্বরীর। কিন্তু কেন কে জানে, মুখ দিয়ে কেমন বেরিয়ে এল কথাটা। এখন আর প্রতিকার নেই। ছেলের মনে ঘা দিলেন অকারণে।

এর দিন দুই পর দক্ষিণেশ্বরে এক ভক্ত মাড়োয়ারী এসে উপস্থিত। ঠাকুরের জন্যে এক থালা মিছরি এনেছে সঙ্গে। মিছরির উপরে একখানা গরদের কাপড়।

আর, সেই দিনই বলা-কওয়া নেই, নরেন এসে হাজির।

নরেনকে দেখে ঠাকুরের খুশি আর ধরে না। বলে উঠলেন, 'ওরে, নরেন এসেছিস? আয়। আয় আমার কাছটিতে।'

পাশে এসে বসতেই ঠাকুর বললেন গলা নামিয়ে, 'শোন, এই গরদের কাপড় আর মিছরির থালা তুই বাড়ি নিয়ে যা।'

নরেন হেসে উঠল। মিছরির থালা নিয়ে আমি করব কি? আমি কি কচি খোকা?

'বেশ, তবে শুধু গরদখানা নিয়ে যা।' ঠাকুর পিড়াপিড়ি করতে লাগলেন।

আরেকবার হাসির রোল তুলল নরেন। বললে, 'আমি গরদ পরব নাকি শেষকালে?'

'ওরে তুই না। তোর মা পরবেন। পরে আহ্নিক করবেন।'

'মা?' নরেনের বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

'হ্যাঁ রে, তোর মার পুজোর চেলিখানা ছিঁড়ে গিয়েছে।'

'আপনি কি করে জানলেন?' চমকে উঠল নরেন। ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

'যে করে হোক পেরেছি জানতে।' ঠাকুর উড়িয়ে দিতে চাইলেন কথাটা। বললেন অনুনয় মিশিয়ে, 'তুই নিয়ে যা। তোর মাকে গিয়ে বল, আমি দিয়েছি।'

'আপনি দিলেই বা তা নেব কেন?' সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল নরেন।

'তার মানে?'

'মা আমার কাছে চেয়েছেন, আমি যখন সক্ষম হব উপার্জন করে কিনে দেব মাকে। আপনার কাছ থেকে ভিক্ষে নিতে যাব কেন?'

আহা, এই না হলে নরেন! তেজোদৃপ্ত পুরুষসিংহ! একবার না বলেছে তো, না! শুনলে একবার মরদের মত কথাটা! তোমার বলে নিতে পারবো না আমার বলে নেব। যাচ্ঞা করে নেব না, নেব অর্জন করে।

কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে এঁটে ওঠে কার সাধ্য।

পরদিন রামলালকে ডেকে বললেন, 'শিগগির করে খেয়ে নে। আর খেয়ে উঠেই এই গরদ আর মিছরির থালা শিমলেয় গিয়ে নরেনের মার হাতে দিয়ে আয়। খবরদার, আর কারু হাতে যেন না পড়ে, স্বয়ং নরেনের হাতেও যেন নয়। ওরে শুধু কর্মের স্পর্ধায় হবে না, কৃপা চাই।'

যেমন বলা তেমনি করা। দুপুরের রোদে গৌর মুখার্জি স্ট্রিটে গ্যাসপোস্টের নিচে ঘাপটি মেরে বসে আছে রামলাল। নরেন যেই বেরিয়ে গেল অমনি নিশ্চিন্ত হয়ে সোজা ঢুকতে পারল বাড়ির মধ্যে। আর ঢুকেই সটান ভুবনেশ্বরীর এলেকায়।

থালাশুদ্ধ গরদ ভুবনেশ্বরীর হাতে পৌঁছে দিয়ে রামলাল বললে, 'ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন আপনাকে।'

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন ভুবনেশ্বরী। বললেন, 'এইখানে ছেলেকে কি বললুম তা দক্ষিণেশ্বরে তক্ষুনি টেলিগ্রাফ হয়ে গেল!'

প্রার্থনার মধ্যে যখনই আর্তির আন্তরিকতার ছোঁয়া লাগে, নির্ভুল শুনতে

পান অন্তর্যামী।

না, নরেনের আর অভিমান নেই। সে শুকনো মাঠ কর্ষণই করতে পারে কিন্তু আকাশ ভেঙ্গে করুণার বর্ষণ যদি নেমে আসে সে তা ঠেকাবে কি করে?

আবার এসেছে দক্ষিণেশ্বর। ঠাকুর জানেন নরেন তামাক খায়। নিজের ছোট হুঁকোয় তাকে তামাক খেতে দিলেন। ওরে খা, খা, লজ্জা নেই, আমি দিচ্ছি—

'মশাই, এত ভালবাসার কি হয়েছে?' কে একজন টিপ্পনি কাটল। 'এদিকে আপনার হুঁকোটা যে এঁটো হয়ে গেল। ও যে হোটেলে খায়, ওর এঁটো কি খেতে আছে?'

'ওরে শালা, তোর কি রে?' ঠাকুর ফোঁস করে উঠলেন। 'নরেন হোটেলে খাক বা যাই খাক তাতে তোর কি? তুই শালা যদি হবিষ্যিও খাস আর নরেন যদি হোটেলেও খায় তাহলেও তুই নরেন হতে পারবিনে।'

তারপর নরেনকে ডেকে এনে শুধোলেন, 'তুই কি বলিস? সংসারী লোকেরা কত কি বলে! কিন্তু দ্যাখ্, হাতী যখন চলে যায় পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চেঁচায়। কিন্তু হাতী ফিরেও তাকায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দে করে তুই কি মনে করবি?'

'মনে করব কুকুর ঘেউ-ঘেউ করছে।'

ঠাকুর হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'না রে, অত দূর নয়, অত দূর নয়।'

শুধু ভালোবাসায় গলে গেলে চলবে না। বাজিয়ে নিতে হবে। যাচাই করে নিতে হবে। সহজে ছেড়ে দেব না। শুধু মন খুশি হলেই হয়ে গেল তা হবে না, চর্মচক্ষুকেও প্রসন্ন করা চাই।

এক হাতে টাকা আরেক হাতে মাটি নিয়ে গঙ্গার পারে বসেছিলেন ঠাকুর। টাকা মাটি মাটি টাকা বলছিলেন বার-বার। কোন হাতে যে টাকা আর কোন হাতে যে মাটি আলাদা আর কোনো চেতনা ছিল না। দুইই এক। সমতুল্য তো বটেই, সমমূল্য।

দুইই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন গঙ্গায়।

সেই থেকে ঠাকুর টাকাকড়ি ছুঁতে পারেন না। কামনা আর কাঞ্চন দুইই ত্যাগ করেছেন।

কিন্তু মুখের কথা মেনে নিতে রাজি নয় নরেন। দেখতে হবে পরীক্ষা করে। ধরতে হবে কোথায় রয়েছে কপটতা।

চুপিচুপি চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের ঘরটিতে উঁকি মেরে দেখল ঠাকুর নেই। কোথায় তিনি? কলকাতায় গিয়েছেন। ফিরবেন কখন? এই এলেন বলে।

এইই উপযুক্ত সময়। কেউই জানতে পারবে না নরেনের কারসাজি।

ঘর ফাঁকা হতেই পকেট থেকে একটা টাকা বের করল নরেন। রুপোর টাকা। ঠাকুরের বিছানার নিচে আলগোছে লুকিয়ে রাখলে। কেউ দেখতে পায়নি তো?

না, কেউ নেই ধারে-কাছে। সন্তর্পণে তারপর সরে পড়ল নরেন। সে তল্লাটেই আর রইল না। সিধে চলে গেল পঞ্চবটী।

কতক্ষণ পরেই ফিরে এলেন ঠাকুর। তাঁকে দেখে সবাই ভিড় করে দাঁড়াল ঘরের মধ্যে। ভালোমানুষের মত মুখ করে নরেনও এসে দাঁড়াল এক কোণে। মনে-মনে আস্ফালন করতে লাগল এবার বোঝা যাবে কাঞ্চনত্যাগের মহিমা। যত লম্বাই-চওড়াই।

ঘুণাক্ষরে কিছুই জানেন না ঠাকুর। যেমন নিত্য বসেন তেমনি বসলেন তাঁর বিছানায়। কিন্তু মুহূর্তমাত্রমধ্যে এ কী হল! যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে বসেছেন এমনি আর্তনাদ করে উঠলেন। লাফিয়ে উঠলেন বিছানা থেকে। এ কি, বিষাক্ত কিছু হঠাৎ দংশন করল নাকি? ত্রস্তব্যস্ত হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল সকলে। কই কিছু দেখছি না তো কোথাও।

নরেনই শুধু নড়ল না এক চুল।

একজন সহসা ঝাড়তে লাগল বিছানা। টং—টং করে একটা আওয়াজ হল মেঝের উপর। ওটা কি? ওটা কি ছিটকে পড়ল? একটা টাকা না? আশ্চর্য, বিছানায় এল কি করে?

তাড়াতাড়ি কেটে পড়ল নরেন।

পলকে বুঝতে পারলেন ঠাকুর। নরেন আমাকে পরীক্ষা করছে। কোথায় বিরক্ত হবেন, তা নয়, আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন।

এই তো চাই। মুখের কথায় মেনে নিবি কেন? শক্ত হাতে বাজিয়ে নিবি যেমন করে শানের উপর আছড়ে-আছড়ে মহাজনে টাকা বাজায়। বেপারী যেমন তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নেয় মালের দোষত্রুটি। ভক্ত হয়েছিস তো বোকা হবি কেন? কেন পরের মুখের ঝাল খাবি? নিজে দেখে-শুনে বুঝে-সমঝে নিবি। হয় এসপার নয় ওসপার। সন্দেহ রাখবিনে। হয় স্বীকৃতি নয় প্রত্যাখ্যান। চলে আয় সত্যের স্থৈর্যে। সিদ্ধান্তের শান্তিতে।

লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারি এসেছে দক্ষিণেশ্বরে।

এসে দেখলে ঠাকুরের বিছানা ময়লা। বললে, 'আমি তোমাকে দশ হাজার টাকা দিচ্ছি, তার সুদে তোমার সেবা চলবে।'

ঠাকুরের মাথায় যেন কে লাঠির বাড়ি মারল। টাকার কথা শুনে প্রায় মুহ্যমান হয়ে গেলেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে বললেন, 'তুমি যদি অমন কথা আর মুখে আনো তাহলে আর এসো না এখানে। জানো না, আমার টাকা ছোঁবার জো নেই। কাছে রাখবারও জো নেই।'

লক্ষ্মীনারায়ণ তখন আরেক বুদ্ধি ফাঁদল। বললে, 'বেশ তো, আপনি না রাখুন, আপনার ভাগ্নে হৃদয়ের কাছে রেখে যাই। সেই নাড়বে-চাড়বে, খরচ করবে।'

'তোমার কি বুদ্ধি! হৃদয়ের কাছে রাখা যা আমার কাছে রাখাও তাই।'

লক্ষ্মীনারায়ণ তাকিয়ে রইল বোকার মত।

'হৃদয়ের কাছে থাকলে একে দে, ওকে দে, আমাকেই বলতে হবে।' ঠাকুর প্রাঞ্জল

করলেন কথাটা। 'আমার কথা মত না দিলে আমি হয়তো রেগে উঠব, নানারকম বিকার সুরু হবে। টাকা কাছে থাকাই খারাপ। আরশির কাছে জিনিস থাকলেই ছায়া পড়বে। ও সব হবে না। ও সব মুখে এনো না খবরদার।'

দশ-দশ হাজার টাকা ফিরিয়ে দিলেন অক্লেশে। মথুরবাবু তালুক-মুলুক দিতে চেয়েছিলেন, হ্যাক-থু করে দিলেন।

অথচ সামান্য কটা টাকার জন্যে নরেন হা-পিত্যেশ করছে। দোরে-দোরে ঘুরছে হন্যের মত।

এবার আর ছাড়াছাড়ি নেই। যে করে হোক ধরতে হবে জোর করে। আদায় করে নিতে হবে। নইলে তিনি আছেন কি করতে? তিনি আপনার লোক থাকতে নরেনকে সইতে হবে অনটন?

'আপনার মাকে একবারটি বলুন।'

'কি বলব?' যেন কত অসহায় এমনি করে তাকালেন ঠাকুর।

'যাতে আমার টাকা পয়সার কিছু সংস্থান হয়, স্থায়ী একটা চাকরি-বাকরি জোটে! মা-ভাই-বোনের কষ্ট আর দেখতে পারি না।' নরেন বললে প্রায় পরাভূতের মত।

'ওরে ওসব বিষয় বলতে পারি না মাকে।'

'ও সব বাজে কথা। আপনি বললে নিশ্চয়ই মা মুখ তুলে চাইবেন। বলতেই হবে আপনাকে।' নরেন পিড়াপিড়ি সুরু করল। 'নইলে ছাড়ব না আজ কিছুতেই। আপনার পা ধরে পড়ে থাকব।'

ঠাকুরের চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। বললেন, 'ওরে জানিস না কতবার বলেছি তোর হয়ে। বলেছি মা, নরেনের দুঃখকষ্ট দূর কর। নরেনকে টাকা দে, চাকরি দে—'

'বলেছেন?'

'কতবার বলেছি।'

'কী বললেন আপনার মা?'

'বললেন, তোমার ডাকে হবে কেন? যার অভাব সে এসে বলুক। সে এসে চা'ক।'

'সে কি, আমাকে বলতে হবে?'

'হ্যাঁ, তুই গিয়ে একবার বল। মার কাছে বসে মাকে একবার মা বলে ডাক।'

'আমার ডাক আসেনা।'

'সে জন্যেই তো হয় না কিছু। তার জন্যেই তো এত কষ্ট। তুই মাকে মানিসনা বলে মা আমার কথাও কানে নেন না। শোন্।' নরেনের কাঁধে হাত রাখলেন ঠাকুর। 'আজ মঙ্গলবার। শুভদিন। রাত্রে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম কর। তারপর যা চাইবি মার কাছে মা দিয়ে দেবেন।'

'সত্যি?'

'তুই দ্যাখই না চেয়ে।'

এত সহজ সমাধান। শুধু প্রণাম আর প্রার্থনা! শুধু স্বীকৃতি আর সমর্পণ! এতেই ইন্দ্রত্বলাভ!

রাত্রি এক প্রহর কেটে গেল। ঠাকুর নরেনকে পাঠিয়ে দিলেন মন্দিরে। প্রাণ ঢেলে প্রণাম কর্। তারপর চা প্রাণ ভরে।

মন্দির নির্জন। চার দিক নিস্তব্ধ। নরেন ভবতারিণীর সামনে দাঁড়াল মুখোমুখি।

ভুবন আলো করে আছেন মা। সমস্ত অঙ্গ থেকে যেন ঝরে পড়ছে প্রসন্নতা। স্নেহপরিপূর্ণ বিশাল দুটি চোখে চেয়ে আছেন। যেন কোথাও শোকদুঃখের লেশ নেই, নেই অভাবের মেঘচ্ছায়া।

তন্ময়ের মত তাকিয়ে রইল নরেন। তন্ময়ের মত ফিরে এল ঠাকুরের কাছে।

হাসিমুখে সম্ভাষণ করলেন ঠাকুর। 'কি রে গিয়েছিলি মার কাছে? চেয়েছিলি টাকাকড়ি?'

'কি আশ্চর্য, সব ভুল হয়ে গেল।' তন্ময়ের মতই বললে নরেন।

'ভুল হয়ে গেল কিরে! যা যা ফের যা। গিয়ে ফের প্রার্থনা কর।' ঠাকুর আবার তাকে ঠেলে দিলেন! 'কেন ভুল হবে? মাকে গিয়ে বল্ মা, আমাকে চাকরি দে, সুখৈশ্বর্য দে।'

নরেন আবার গিয়ে দাঁড়াল ভবতারিণীর সামনে।

যেন চোখের উপর চোখ রেখে তাকালেন ভবতারিণী। যেন হাসলেন মৃদু মৃদু। দশদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুছে গেল দৈন্যকালিমা।

আবার ফিরে এল ঠাকুরের কাছে।

'কি রে, চেয়েছিলি?'

'পারলুম না। বেরুলনা মুখ দিয়ে।' মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল নরেন।

'তুই তো আচ্ছা বোকা দেখছি।'

'মাকে দেখামাত্রই চোখে কেমন ঘোর লাগে। কি যে চাই তা আর মনে করতে পারিনা।'

'দূর ছোঁড়া। ঘোর লাগলেই বা তুই ঘুরে পড়বি কেন? নিজেকে সামলে নিবি। মাথা ঠান্ডা করে চাইবি যা চাইবার। যা, আরেকবার যা। ঘাবড়াসনে—'

আরেকবার গিয়ে দাঁড়াল নরেন। দেখল চোখের সামনে সর্বকামবরদা বসে আছেন। যা চাইব তাই দিয়ে দেবেন অকাতরে।

আর দাঁড়াল না, আভূমি নত হয়ে পড়ল নরেন। বললে, 'মা, আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও।' প্রণাম করতে লাগল বারে-বারে—।

'কি রে চাইলি এবার?' ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন ঠাকুর।

মাথা নত করল নরেন। বললে, 'চাইতে লজ্জা করল।'

'লজ্জা করল। লজ্জা করল।' আনন্দে বিহ্বল হয়ে হাসতে লাগলেন ঠাকুর। নরেনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললেন, 'যা, কিছু ভয় নেই। মা বলে দিয়েছেন তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবেনা কোন দিন।'

সারা রাত কালীর গান গাইল নরেন। ঘুমুতে গেল সকালবেলা, দুপুর পর্যন্ত ঘুম।

'মাকে আগে মানতনা, কাল মেনেছে।' পরদিন বৈকুণ্ঠকে বলেছেন ঠাকুর। 'কষ্টে পড়েছিল বলে পাঠিয়েছিলুম মার কাছে। টাকাকড়ি সুখসম্পদ বলে দিয়েছিলুম চাইতে। কিন্তু পারল না, লজ্জা করল! চেয়ে নিল জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্য! কি মজা! কালী মেনেছে নরেন, মা মেনেছে—'

১২

মা মেনেছে নরেন।

অরণ্যকুটিল পাহাড়ের দেশে হাঁটতে-হাঁটতে তার মিলে গিয়েছে ঝরনা। স্বচ্ছচক্ষু স্নিগ্ধগাত্রী প্রবাহিনী। জ্ঞান-তর্ক-সন্দেহ-বিচারের দেশে মিলে গিয়েছে তার ভক্তি, অচলা ভক্তি। বিগলিত তরলতা।

আর কি চাই! মা আছেন আর আমি আছি।

নির্ভূষণ নিষ্কিঞ্চন শিশু হয়ে মায়ের কোলে চড়ে বসেছে নরেন। ক্ষেমঙ্করীর খাসতালুকের প্রজা হয়েছে। এবার কে উচ্ছেদ করে! কে নামায় কোল থেকে! কোল থেকে নামাবেই বা কোথায়! যেখানে নামাবে সেখানেই মায়ের কোল। মায়ের কোলের বাইরে অকূল বলে কিছু নেই।

কলকাতার চাঁপাতলায় মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের একটা শাখা বসেছে। বিদ্যাসাগরের সুপারিশে সে ইস্কুলে হেডমাস্টার হল নরেন। বি-এ পাশ করেছে ভাবলে এবার আইন পড়ি। কালসাপ সরিকের দল পৈত্রিক বাড়ি-ঘর কেড়ে নিয়েছে, ছিনিয়ে নিতে হবে সেই ন্যায্য স্বত্ব। লড়তে হবে আইনের জোরে। নির্মূল করতে হবে বে-আইনি।

কিন্তু কী হবে শুধু শুকনো কথার বোঝা বয়ে? ঠাকুর বলেছিলেন না, চাল-কলাবাঁধা বিদ্যে দিয়ে আমি কী করব? আর মৈত্রেয়ী বলেছিল না ভারতবর্ষের সেই শাশ্বতী বাণী, যেনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কুর্যাম?

'আমি পঞ্চবটীতে বসে সাধন করব।' একদিন বললে এসে ঠাকুরকে।

'সে কি রে?' সস্নেহ কৌতূহলে তাকালেন ঠাকুর।

'হ্যাঁ, এ জন্ম বয়ে যেতে দেব না। যখন খবর একবার পেয়ে গেছি, যে করেই হোক বার করব তাঁকে। এ দেহের খনির ভিতর থেকেই উদ্ধার করব সেই স্পর্শমণি।'

দীপ্ত চোখে হাসলেন ঠাকুর। শুধোলেন, 'পড়াশুনো ছেড়ে দিবি?'

'ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে আরো কিছু বেশি চাই।'

'সে আবার কি!'

'দেবেন, একটা ওষুধ দেবেন আমাকে?' হাত পাতল নরেন।

'কেন, কি হ'ল তোর?'

'এমন একটা ওষুধ যা খেয়ে সব ভুলে যেতে পারি। এ পর্যন্ত যা-কিছু পড়েছি যা-কিছু শিখেছি—সমস্ত। পড়াশুনো ছেড়ে দেওয়া সহজ, কিন্তু যা-কিছু এতদিন জেনেছি-শুনেছি তা ছাড়ি কি করে? না ছাড়লে যে প্রাণ বাঁচে না।'

পঞ্চবটীতে ধুনি জেবলে সাধন করে নরেন। বাইরে যেমন আগুন অন্তরেও তেমনি। পাবক শুধু জবলে না পবিত্র করে। শুধু দগ্ধ করে না দীপ্ত করে। অদৃশ্যকে দর্শন করায়।

মাস্টারি ছেড়ে দিল নরেন। ছেড়ে দিল আইন-পড়া। সিদ্ধিও চাই না ঋদ্ধিও চাই না, শুধু তোমার দর্শন চাই। তুমি আমার চোখের জিনিস আমার স্পর্শের জিনিস হয়ে থাকো।

চোখের জিনিসে তুমি জ্ঞান, স্পর্শের জিনিসে তুমি ভক্তি। তোমাকে শুধু দেখে ষোলআনা সুখ নেই। পরিপূর্ণ আনন্দ তোমাকে ধরে।

আরেক দিন ছুটে গেল ঠাকুরের কাছে। বললে, 'আমাকে সমাধিস্থ করে দিন।'

ঠাকুর স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

'যেমন শুকদেবের হত। এক-নাগাড়ে পাঁচ-ছ দিন সমাধিতে ডুবে থেকে শরীর রাখবার জন্যে খানিকটা নেমে আসতেন। আবার তক্ষুনিই উঠে যেতেন উপরে। তেমনি ইচ্ছে করে আমার। দেহটাকে কোনো রকমে টিঁকিয়ে রেখে সমাধিতে ডুবে যাই।'

মুখের উপর ধিক্কার দিয়ে উঠলেন ঠাকুর। 'ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা! তোর এত ছোট নজর!'

স্তব্ধ হয়ে রইল নরেন।

'তুই শুধু তোর নিজের মুক্তি চাস? আর এই যে সব অসংখ্য অসহায় জনগণ, তাদের কি হবে? তারা কোথায় যাবে?'

চুপ করে রইল নরেন।

'ভেবেছিলুম তুই বিশাল একটা বটগাছের মত হবি আর তোর ছায়ায় হাজার-হাজার লোক আশ্রয় পাবে। তা তোর কিনা এই ছোট নজর! আর সবাইকে বঞ্চিত করে নিজে শুধু রাজভোগ খাবি? সেই রাজভোগের ভাগ দিবিনে আর সবাইকে?'

নরেনের মুখে কথা নেই।

'শোন, জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণবপূজন—বৈষ্ণবধর্মের এই সারকথা। কিন্তু জীবে দয়া আমি বলতে পারব না। দয়ার মধ্যে একটা অহংকারের ভাব আছে। যে অর্থী সে নিচে দাঁড়িয়ে আর যিনি দাতা তিনি যেন টঙে ব'সে। দূর শালা! কীটানুকীট, তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? তোর কিসের স্পর্ধা?' উত্তেজিত কণ্ঠস্বর অনুরাগে গাঢ় হ'ল ঠাকুরের : 'না, না, জীবে দয়া নয়, জীবে শ্রদ্ধা জীবে প্রেম জীবে সেবা। শুধু অমনি-অমনি সেবা নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা। তখন সে সেবা পূজা, সে সেবা আরতি!'

ঠাকুরের নতুন সাম্যবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হ'ল নরেন। মানুষকে অন্নের ক্ষেত্রে

নামিয়ে এনে সমান করা নয়, অমৃতের ক্ষেত্রে উন্নীত করে সমান করা। শুধু পঙক্তির সাম্য নয়, পাত্রের সাম্য। সকলে আমরা অমৃতের সন্তান, ঈশ্বরের বিত্তে আমাদের সমান অংশ, এই সাম্যবাদ।

ঈশ্বরকে কোথায় খুঁজছ, বললেন তাই বিবেকানন্দ। বহুরূপে তোমার চোখের সামনেই তিনি বিরাজ করছেন। এঁদেরকে উপেক্ষা করে কোথায় খুঁজছ সেই অশরীরীকে? হাতের কাছে রয়েছে যেসব দুঃস্থ আর দুর্গত, পীড়িত আর বঞ্চিত, তাদের সেবা করো, ভালোবাসো, হাত ধরে টেনে তোলো দুঃখ আর দারিদ্র্যের পঙ্ককুণ্ড থেকে। সেই সেবা সেই ভালোবাসাই ঈশ্বরপূজা।

দয়া নয়, দ্বেষ নয়, দম্ভ নয়—ভালোবাসা। আর, সংসারে কে না জানে ভালোবাসতে? সে শুধু নিজেকে ভালোবাসা, নিজের স্বার্থবুদ্ধিকে ভালোবাসা। এবার একটু পরকে ভালোবাসতে শেখো। পরই পরম। পরকে ভালোবাসা মানেই পরমকে পুজো করা।

যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়—এ গানটা একদিন গেয়েছিলি না? আবার গা সেই গান। সব তিনি। কাঠে-মাটিতে তিনি থাকতে পারেন, রক্তে-মাংসে থাকতে পারবেন না? প্রতিমায় তাঁর আবির্ভাব হয় মানুষে হবে না? তিনি-কে তুমি কর্। তিনি হচ্ছেন জ্ঞান, তুমি হচ্ছে ভালোবাসা। মানুষকে যখন ভালোবাসতে পারবি তখনই তিনি তুমি হয়ে উঠবেন।

আমিই সেই, এ-কথা নয়। ও-ই সেই, এ-কথাও নয়। তুমিই সেই, এইটিই আসল সাধন।

নরেন গান ধরল।

শুনতে-শুনতে ঠাকুর সমাধিস্থ। বলেন, 'নরেনের গান শুনলে আমার ভিতর যিনি আছেন তিনি ফোঁস করে ওঠেন।'

'নরেন আমার নিত্যসিদ্ধ।' বলছেন ঠাকুর, 'জন্মে-জন্মে ঈশ্বরভক্ত। অনেকের সাধ্যসাধনা করে একটু-একটু ভক্তি হয়, নরেনের আজন্ম ভক্তি।'

সেই ধ্রুবের কথা মনে করো। বিষ্ণুকে দর্শন করে বালক ধ্রুবের বড় অহঙ্কার হয়েছিল। ভাবলে, এই একটু ডেকে এমনি কম সাধনায় ঈশ্বর পাওয়া যায়? এমন সময় নারদ এসে হাজির। এসো, আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে চলো। হাঁটতে-হাঁটতে দুজনে চলে এল একটা পাহাড়ের কাছে। মস্ত উঁচু পাহাড়। শাদা ধবধব করছে। ধ্রুব জিগগেস করলে, ওটা কি? নারদ বললে, হাড়ের পাহাড়। কার হাড়? মানুষের? হ্যাঁ, তোমার। বললে নারদ, যতবার আসা-যাওয়া করেছ সংসারে ততবারের হাড় ওখানে জমা আছে। এত? এতবার জন্মেছি-মরেছি? ধ্রুবের মুখে আর কথা নেই। আমি মাথা হেঁট করল ধ্রুব। ধুলো হয়ে গেল তার অহঙ্কার।

কিন্তু লক্ষ জন্মেও নরেনের ভয় নেই।

'লাখ জন্ম হলেই বা আমার ভয় কি।' বললে বিবেকানন্দ, 'আমি ভক্তি নিয়ে থাকব। ভালোবাসার বেসাতি করব। আকণ্ঠ পান করব প্রেমসুধা।'

আবার বললে, আমি হব বৃষ্টিবিন্দু। বারে-বারে ঝরে পড়ব। কিন্তু সমুদ্রের

মধ্যে নয়। সমুদ্রে পড়লে আমি তো লুপ্ত হয়ে যাব, সিন্ধুর মাঝে লয় হয়ে যাবে আমার বিন্দুসত্তা। আমি নির্বাণ চাই না, চাই না বিলুপ্তি। আমি ঝরে পড়ব শুকনো-মলিন ধূলির উপর। মুছে দেব তার দাহ, মিটিয়ে দেব তার তৃষ্ণা। আর্দ্র করব স্নিগ্ধ করব পবিত্র করব।

ঠাকুর বললেন, 'নিত্যসিদ্ধ যেমন মৌমাছি। কেবল ফুলের উপর বসে মধু পান করে। নিত্যসিদ্ধ হরিরস আস্বাদন করে বেড়ায় বিষয়রসের দিকে যায় না।'

'নরেন আমার খানদানী চাষা।' বললেন আবার ঠাকুর, 'বারো বচ্ছর অনাবৃষ্টি হলেও খানদানী চাষা চাষ ছাড়ে না। মা-ভাইয়ের কষ্ট শুনে বলি, যা, কালীঘরে যা, যা চাইবি মা তাই দেবে। তা টাকাকড়ি চাকরি-বাকরি না চেয়ে চাইলে কিনা বিবেক-বৈরাগ্য!'

কেশব সেনকে বললেন ঠাকুর, 'মা তোমাকে একটি শক্তি দিয়েছেন বলে তুমি জগৎমান্য হয়েছ, কিন্তু মা দেখাচ্ছেন নরেনের মধ্যে আঠারোটা শক্তি।'

নরেন তো অপ্রস্তুত কিন্তু কেশব মহা খুশি। পরশ্রীতে আনন্দিত হওয়াই ঈশ্বরভক্তি।

কেশবের বাড়িতে 'নব বৃন্দাবন' নামে নাটক হচ্ছে। তাতে এক সাধুর পার্ট নিয়েছে নরেন। ঠাকুর দেখতে এসেছেন। সাধুর সাজে কেমন না জানি দেখতে হয়েছে নরেনকে।

'ঠিক হয়েছে। এই ঠিক হয়েছে।' রঙ্গমঞ্চে নরেনের আবির্ভাব হওয়ামাত্রই ঠাকুর তাঁর সিট ছেড়ে লাফিয়ে উঠে সোল্লাসে বলতে লাগলেন, 'এমনটিই সেদিন দেখিয়েছিল মা। এমনি হুবহু।'

নেমে আসতে সঙ্কেত করলেন নরেনকে। সঙ্কেতে কিছু হবে না। সোজাসুজি ডাকতে লাগলেন চেঁচিয়ে, 'ওরে নেমে আয়, কাছে আয় আমার, তোকে একটু দেখি ভালো করে।'

এমন অবস্থায় কখনো নামা যায় নাকি? নরেন রাজি হ'ল না।

তখন কেশব পিড়াপিড়ি করতে লাগল। যাওনা নেমে উনি যখন বলছেন অত করে।

নেমে এল নরেন। ব্যাকুল হয়ে ঠাকুর তার হাত চেপে ধরলেন। বললেন, 'দ্যাখ তোকে এই বেশে একদিন দেখিয়েছিল মা। এই আলখাল্লা এই পাগড়ি এই লাঠি। ঠিক-ঠিক মিলে গেছে। আহা, কী সুন্দর তোকে দেখতে হয়েছে নরেন!'

১৩

কই, নরেন কই? নরেনকে দেখছি না কেন?

সিমলেয় মধুরায়ের গলিতে রাম দত্তের বাড়ি এসেছেন ঠাকুর। একঘর লোক অথচ নরেন নেই। একথালা ব্যঞ্জন কিন্তু নুন নেই। সেই তীক্ষ্ণতম আস্বাদটি

নেই।

'তার মাথার অসুখ করেছে।' বললে রাম দত্ত।

'সে কি?'

'মাথায় ভিজে গামছা দিয়ে অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছে বাড়িতে। ভীষণ যন্ত্রণা।' কে আরেকজন বললে, 'আলোয় চোখ খুলতে পারছে না।'

'ওরে তাকে কেউ এখানে ডেকে নিয়ে আয়।' ঠাকুর চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কাতর মুখে বললেন, 'তাকে না দেখে যে থাকতে পারছি না।'

কালিপ্রসাদ আর নিরঞ্জন—ঠাকুরের আর দুই ভক্ত—গেল নরেনের বাড়ি। সত্যিই তো। নিচের ঘরে দরজা-জানলা বন্ধ করে তক্তপোষে শুয়ে আছে নরেন। মাথায় গামছা বাঁধা। মুখে অস্ফুট আর্তনাদ।

'রামবাবুর বাড়িতে পরমহংসদেব এসেছেন।' বললে কালীপ্রসাদ। 'তোমাকে দেখতে চাইছেন একবার।'

'আমার প্রণাম জানিও তাঁকে।' বেদনাচ্ছন্ন স্বরে নরেন বললে। 'বোলো আমি মাথা তুলতে পারছি না। মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। সাধ্য নেই উঠে বসি।'

'তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আমাদের পাঠিয়েছেন তিনি।'

'কিন্তু কি করে যাই। আলোয় তাকাতে পারছি না। আলোয় চোখ খুললে আরো বেশি যন্ত্রণা!'

'কিন্তু ও সব আমরা শুনছি না।' দুই বন্ধু পিড়াপিড়ি করতে লাগল। 'ঠাকুর যখন তোমাকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন তখন তোমাকে যেতেই হবে। যে করে হোক নিয়েই যাব তোমাকে।'

'চোখ খুলতে না পারলেও?'

'হ্যাঁ। থাক না তোমার চোখ বাঁধা, আমরা দুজনে তোমার হাত ধরে নিয়ে যাব রাস্তা দিয়ে।'

নরেন উঠল। চোখের উপর দিয়ে আঁট করে বাঁধন দিল। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'ধরো।'

কষ্টের মধ্যে দিয়ে ডাকলে, হাঁটিয়ে নিয়ে চললে কণ্টকের উপর দিয়ে। কিন্তু আমি জানি এই কষ্টই তোমার কৃপা, এই কণ্টকেই তোমার কুসুমের অঙ্গীকার। অন্ধের মত চোখ বন্ধ করে হাঁটি বা মোহান্ধের মত খোলা-চোখের অহঙ্কারে, জানি, প্রভু, তোমারই ডাকে চলেছি, চলেছি তোমারই দুয়ারে। পথ জানি আর না জানি, পথই আমাকে পথ দেখাবে। পথে যখন একবার নেমে পড়েছি তখন জানি তুমিই পথ ভেঙে আসবে এগিয়ে, পথের দৈর্ঘ্য কমাবে, ক্লান্তি কমাবে। তুমি তো শুধু পথের শেষে নও, তুমি যে পদে-পদে।

নরেনকে দু-বন্ধু হাজির করল ঠাকুরের কাছে। সামনাসামনি বসিয়ে দিল।

'কি রে, কি হয়েছে তোর মাথায়?' পদ্মহাতখানি সস্নেহে তার মাথায় বুলিয়ে দিলেন।

ভোজবাজি হয়ে গেল। সকল যন্ত্রণা উড়ে গেল কর্পূরের মত।

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল নরেন, 'এ কি, কি আশ্চর্য, আমার মাথায় আর বেদনা নেই।' টান দিয়ে খুলে ফেলল গামছা। 'সত্যি, আলোর দিকে তাকাতে পারছি। সব দেখতে পারছি সহজে। এতটুকু কষ্ট নেই। ভার নেই। হালকা হয়ে গেলাম মুহূর্তে।'

ঠাকুর হাসতে লাগলেন।

তবে আর কি। এবার আমার তানপুরোটা নিয়ে এস। মুক্তকণ্ঠ বিহঙ্গের মত আমি গান গাই। ভূভারহরণ আমার সর্বক্লেশ বিমোচন করেছেন। আর্তনাদকে রূপান্তরিত করেছেন সঙ্গীতে।

তিন-তিনঘণ্টা পুরো গান গাইল নরেন।

চুম্বকই শুধু লোহাকে টানে না, লোহাও চুম্বককে টানে। চুম্বক কি করবে যদি লোহাকে না পায়! গুরু কি করবে যদি তার শিষ্য না জোটে। যদি রসিক পাঠক না থাকে তবে কবির দাম কি। ভগবানও ব্যর্থ যদি তাঁর ভক্ত না মেলে! কৃপা যিনি ঢালবেন তিনি কী করবেন তাঁর অকৃপণ ভাণ্ডার নিয়ে যদি তাঁর না জোটে কৃপাপাত্র।

আমি-তুমি ছাড়া আর সেই কৃপাপাত্র কোথায়! দিতে কৃপা নিতে প্রসাদ!

'নরেন আমার খানদানী চাষা। বারো বছর অনাবৃষ্টি হলেও চাষ ছাড়ে না।' বারে বারে বলেন ঠাকুর : 'কত ভক্ত কত কামনামাখানো জিনিস নিয়ে আসে আমার জন্যে। খেতে পারি না। আর কাউকেও দিই না, পাছে কামনার ছোঁয়ায় ভক্তির উচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু নরেনকে দিই। নরেনের ঘর আলাদা থাক আলাদা। ও হচ্ছে জ্বলন্ত দাবানল। জ্ঞানের দাবানল। কামনা-টামনা সব পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে যায়। দেখছিস না ধ্যানের আবেশে চোখের মণি উপর দিকে উঠেই আছে। ঘুমোলেও দেখেছি একেবারে বোজে না। ওর লক্ষণ সব মহাযোগীর মত। আহা, তাইতেই তো এত আদর করি।'

পুজোর চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান বড়। আর ধ্যানসিদ্ধ নরেন্দ্রনাথ। ধ্যান নয় যেন আগুনের শিখা। কোথাও হাওয়ার রেখা পর্যন্ত নেই, একেবারে অচঞ্চল। গায়ের উপর দিয়ে সাপ চলে যায় জানতেও পারেনা। মাথায় পাখি এসে বসে খেয়াল নেই। ব্যাধ পাখি মারবার জন্যে তাক করছে, লক্ষ্যও নেই কাছ দিয়ে রোশনাই-বাজনা গাড়ি-ঘোড়া নিয়ে বরের শোভাযাত্রা চলে গেল। বর দেখলে? কোথায় বর? আমি শুধু আমার বরেণ্যকে দেখছি। আমার ঈপ্সিতকে। আমার লক্ষ্যস্থলকে।

চক্র আবর্তিত হচ্ছে একটি ধ্রুব বিন্দুকে আশ্রয় করে। স্থির বিন্দু, কিন্তু নির্লক্ষ্য। সেই স্থির বিন্দুর নামই ঈশ্বর। সহজে চোখে পড়ে না, কিন্তু তাকেই আঁকড়ে ধরে ঘুরছে এই বিশ্বচক্র। ঠাকুর বললেন, যদি এমনি ঘোরো হাত ছেড়ে দিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে, কিন্তু একটা খুঁটি ধরে ঘোরো, পড়বেনা। বিশ্ব-সংসারও এই খুঁটি ধরে ঘুরছে। খুঁটি ধরে ঘুরছে বলেই পড়ছে না ছত্রখান হয়ে। এই খুঁটিই ভগবান।

কী দেখছ? দ্রোণাচার্য জিগগেস করলেন অর্জুনকে। চারদিকে এই যে

বন-বনানী প্রান্তর-কান্তর, তা দেখছ। অর্জুন বললে, না। রাজা-রাজড়ারা এসেছেন, তাঁদের দেখছ? উত্তর হল, না। চক্র দেখছ? না। পাখি দেখছ? না। তবে কী দেখছ? পাখির চক্ষু দেখছি।

যেই পাখির চক্ষু দেখল অমনি লক্ষ্যভেদ করল অর্জুন।

তেমনি যদি জীবনের লক্ষ্যভেদ করতে চাও তো ঈশ্বরকে ডাক করো।

কী জীবনের উদ্দেশ্য? জিগগেস করলেন ঠাকুর।

হেসে-খেলে বয়ে যাওয়া? তার মানে যে কটা দিন বেঁচে আছি স্ফূর্তি করে যাওয়া? বেশ, মেনে নিলুম, আনন্দই জীবনের উদ্দেশ্য। আনন্দই যখন জীবনের উদ্দেশ্য তখন প্রতি মুহূর্তে অধিকতর আনন্দই জীবনের নিশানা। এক শৃঙ্গ থেকে আরেক তুঙ্গতর শৃঙ্গ। কোথাও থামা নেই, আর নয় আর নেই বলে বসে পড়া নেই। মাত্রাহীন যাত্রা। আরো চাই আরো চাই। আরো আলো আরো সুখ। অধিকতরোর সন্ধানে বেরিয়ে প্রতি মুহূর্তে কোথাও না কোথাও এক অধিকতম এক পরমতমকে সঙ্কেত করছি। অধিকতম সুখ, পরমতম শান্তি। তার নাম দিবিনে একটা? সেই অধিকতম সুখ সেই পরমতম শান্তির নামই ঈশ্বর।

তবে জীবনের উদ্দেশ্য, এক কথায়, ঈশ্বরলাভ।

ঈশ্বর কি বাইরের জিনিস যে তাকে পাব? ঈশ্বর ভিতরের জিনিস, তাকে উদ্ধার করব, উদ্ঘাটিত করব। ঈশ্বর পাব না, ঈশ্বর হব। হওয়াই পাওয়া।

একটুখানি হওয়া মানে আরো একটুখানি পাওয়া। আরো একটুখানি হওয়া মানে আরো একটুখানি পাওয়া। বড় হওয়া ভালো হওয়া। বৃহৎ হওয়া মহৎ হওয়া। বৃহতের ও মহতের শেষ সীমাই ঈশ্বর।

'অন্যেরা ডোবা পুষ্করিণী, নরেন বড় দীঘি, যেন হালদার পুকুর।' বললেন ঠাকুর, 'অন্যেরা কলসী ঘটি, নরেন জালা।'

কেউ কলায়ের ডালের পোর, কেউ নারকোলের পোর, কেউ বা ক্ষীরের পোর। নরেন আমার ক্ষীরমোহন।

'নরেন্দ্র সভায় থাকলে আমার বল।'

সন্ধ্যের পর সেদিন ঠাকুরের কলকাতা যাবার কথা। কিন্তু গাড়ি যোগাড় হচ্ছে না।

'তাই তো কার গাড়িতে যাই!' মাস্টারমশাইকে জিগগেস করছেন ঠাকুর।

সে একটা ব্যবস্থা হবেই। ঠাকুর যদি মনস্থ করে থাকেন কলকাতায় যাবেন তা কখনো অপূরণ থাকবেনা।

প্রদীপ জ্বালা হল ঠাকুরের ঘরে। মন্দিরে শুরু হয়েছে আরতি। রশুনচৌকি বাজছে। এসেছে শ্যামসুন্দর সন্ধ্যা। নামকীর্তন করছেন ঠাকুর। ছোটখাটটিতে বসে মায়ের ধ্যান করছেন।

আরতির ঘণ্টা থেমে গেল। ঠাকুর উঠে পাইচারি সুরু করলেন। অনেক ভক্ত এসেছে, মাঝে-মাঝে তাদের সঙ্গে কথা বলছেন দু-একটা। আর থেকে-থেকে মাস্টারকে বলছেন, কই, গাড়ি কই?

গাড়ির জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন, না, আর কিছুর জন্যে?

এমন সময়—মহাযান—স্বয়ং নরেন এসে উপস্থিত।

'এসেছিস, তুই এসেছিস?' ঠাকুর ছুটে এসে ধরলেন নরেনকে। যেমন কচি ছেলেকে আদর করে তেমনি ধারা তার মুখে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন। স্নেহভরা বিহ্বল কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'এসেছ, তুমি এসেছ!'

নরেন এসেছে, আর কি কলকাতায় যাওয়া যায়! মাস্টারের দিকে তাকালেন ঠাকুর : কি বলো! আর কি কলকাতায় যাওয়ার কোনো মানে হয়?

গাড়ি আমাকে কলকাতায় নিয়ে যেত, আর এ বৃহৎযান নরেন, এ আমাকে নিয়ে যাবে পৃথিবী ছাড়িয়ে, আকাশের ওপারে, সপ্তর্ষিমণ্ডলের দেশে, কে জানে কোন নিষেধহীন নিমেষহীন স্তব্ধতায়!

•

১৪

রাম দত্তের বাড়ির চাকর লাটু—দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের সেবায় লেগেছে। ঠাকুর তাকে ডাকেন লেটো। আর নরেন ডাকে, প্লেটো।

'ওরে প্লেটো, এক কলকে তামাক ভালো করে সেজে খাওয়া না।' হুকুম করে নরেন।

তখুনি তামিল করে লাটু। যে যা বলে তাই সে করে দেয়। লোকসেবাই তার ঈশ্বর-আরাধনা।

প্রথম যখন যোগীন এল ঠাকুরের কাছে, বললে, আমি থাকব আপনার এখানে। ঠাকুর জিগগেস করলেন, রাতে কি খাস?

'আধসের আটার রুটি আর এক পোয়া আলুর চচ্চড়ি।' যোগীন বললে।

'তোকে আমার সেবা করতে হবেনা। রোজ আধসের ময়দা, অত বাপু যোগাতে পারবনা। তার চেয়ে বরং তুই বাড়ি থেকে খেয়ে-দেয়ে এখানে আসিস।'

লাটুও খুব খেতে পারে। একসের দু-সের আটা একেকবেলা উড়িয়ে দেয়। 'খাওয়া কমা, খাওয়া না কমালে ধ্যানধারণায় মন বসবেনা।' এমন খাওয়া কমিয়ে দিল লাটু, খিদের চোটে পেটে ব্যথা হবার যোগাড়। তখন আবার তিরস্কার। 'ওরে, অতটা ভালো নয়। শরীর রাখবার জন্যে যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু খাবি। দিনে বারুদঠাসা করে খেতে পারিস, কিন্তু খবরদার, রাতে একেবারে হালকা।'

শরীর তো বীণা। তাকে যদি না বেঁধে নিস জোর করে, ঈশ্বরসুরলহরী ফুটবে কি করে?

কিন্তু নরেন? নরেনের কথা আলাদা, থাক আলাদা। সে তো রোগী নয় যে তার পথ্য বরাদ্দ হবে। সে স্বয়ং জ্বলন্ত অগ্নি। সব পরিপাক করে নেবে, আত্মসাৎ করে নেবে।

'ওগো নরেন আজ এখানে খাবে।' নহবৎখানায় শ্রীমাকে উদ্দেশ করে বলছেন

ঠাকুর, 'মোটা-মোটা আটার রুটি করো আর ছোলার ডাল। রুগীর পথ্যি হয় না যেন।'

দক্ষিণেশ্বরে মাংস রান্না হচ্ছে সেদিন। সেদিকে বেড়াতে গিয়ে ঠাকুর দেখে ফেলেছেন।

'কি হচ্ছে রে?'

'মাংস রান্না হচ্ছে।'

'মাংস?'

'হ্যাঁ, নরেন খাবে।'

আর কথা নেই। যখন নরেন খাবে তখন আর কথা কি। আর সব কলসী ঘটি, নরেন জালা। অন্য পদ্ম কারু দশদল কারু ষোড়শদল কারু বা শতদল। কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন সহস্রদল।

'ওকে অনেক কাজ করতে হবে।' 'আপন মনেই যেন বলছেন ঠাকুর, 'একটু খাওয়া-দাওয়া না করলে পারবে কেন? ওর মধ্যে জ্ঞান-অগ্নি জ্বলছে, ও যা খাবে সব হজম হয়ে যাবে, ওর কিছুই করতে পারবে না।'

কত ভক্ত কত কিছু কামনা করে ভোগ দেয় ঠাকুরকে। সে সব অশুদ্ধ ভোগ। সে সব ফেলে দেওয়া উচিত আগুনে। কিন্তু এত ভালো-ভালো খাবার নষ্ট করে দেওয়া হবে? কেন, নরেনকে খেতে দাও, নরেন খাবে। বললেন ঠাকুর। নরেন্দ্র পবিত্র পাবক। সর্বসহ, সর্বদহ বিশুদ্ধাত্মা।

থিয়েটার দেখতে গিয়েছেন সেখানেও ঠাকুরের প্রথম জিজ্ঞাসা : 'ওহে নরেন্দ্র এসেছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, এসেছে। বসেছে ঐ দিকে।'

ঠাকুর হাসলেন, সুস্থ হলেন। ওরে ও আমার বল, ও আমার আশ্রয়-আশ্বাস।

অভিনয়ের শেষে গিরিশ 'ঘোষকে জিগগেস করলেন ঠাকুর, 'এ কি তোমার থিয়েটার, না, তোমাদের?'

'আজ্ঞে, আমাদের।'

'হ্যাঁ, আমাদের কথাটিই ভালো।' বললেন ঠাকুর, 'আমার বলা ভালো নয়। কেউ কেউ বলে আমি নিজেই এসেছি। এ সব হীনবুদ্ধি অহঙ্কেরে লোকে বলে।'

আমি নিজেই এসেছি! কি আশ্চর্য, তুমি নিজের ইচ্ছেতেই এসেছ পৃথিবীতে? নির্বাচন করে নিয়েছ তোমার বাড়ি-ঘর, তোমার জাতি-কুল, তোমার বাপ-মা, তোমার পরিধি-প্রতিবেশ! কোথা থেকে তোমার আরম্ভ, এবং কবে থেকে? তোমার ইচ্ছেতেই তোমার মৃত্যু? আর, ঠিক তোমার মনোনীত সময়ে? যখন প্রথমে ও শেষে কোথাও আমি বলে কিছু নেই, শুধু মাঝখানের এই সেতুপথটিতেই অহংকর্তৃত্ব? কি সাধ্য তুমি এক পা ফেল তোমার নিজের ইচ্ছেয়? তুমি নিজেই এসেছ? পথে ঠিক ঠিক গাড়ি-ঘোড়া চলেছিল, পথ পিছল ছিলনা, তুমি আছাড় পড়নি, ঘটেনি কোনো দুর্ঘটনা—তবেই না তোমার আসা! তাই তোমার ইচ্ছে নয়,

তাঁর ইচ্ছে, তাঁর কৃপা।

বাড়ি থেকে বেরুবার সময় দুর্গা-দুর্গা বলি, কিন্তু সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরে এসে আর বলিনা দুর্গা-দুর্গা। আমরা এমন অকৃতজ্ঞ।

সব যদি তাঁরই কৃপা, তবে সে কৃপা আকর্ষণ করব কি করে?

কর্ম করে। কৃ—কর; পা, পাবি। চুপ করে বসে থাকলে হবে না। তুই যদি বসে থাকিস ভগবানও বসে থাকবেন।

কৃপা যে নিবি, পাত্র চাই। শূন্য পরিচ্ছন্ন পাত্র চাই। পাত্র যদি বাসনায় পূর্ণ হয়ে থাকে তাতে সুধাসার নিবি কি করে? পাত্র শূন্য কর্। অনেক ক্লেদ অনেক গাদ জমে আছে, তাকে মার্জন কর্। বাসন মাজবার জন্যে শক্ত একটা ঝামা চাই। কর্মই তোর সেই ঝামা। কর্ম করে-করে শূন্য কর্ শুদ্ধ কর্ নিজেকে, দেহ-মনকে প্রসাদধারণের পবিত্র পাত্র করে তোল্।

নরেন বললে, 'সবই থিয়েটার।'

'হ্যাঁ, তাই।' সায় দিলেন ঠাকুর। 'তবে কোথাও বিদ্যার খেলা কোথাও অবিদ্যার।'

'সবই বিদ্যার।' নরেন জোর গলায় বললে।

'হ্যাঁ, ওটি চরম জ্ঞানের অবস্থা—' সায় দিলেন ঠাকুর।

নরেন সেই প্রজ্বলন্ত জ্ঞান।

থিয়েটারের বসবার ঘরে কথা হচ্ছে। ঠাকুর বললেন, 'একটু গান গা!'

নরেন গান ধরল : 'চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দ লহরী।' গানের এক জায়গায় আছে, 'মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল—দেশকাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল—' তখন ঠাকুর বলে উঠলেন, 'এইটিই জ্ঞানের অবস্থা। তখন সবই বিদ্যা, সবই ঈশ্বরময়—'

ঠাকুরকে খেতে দিয়েছে। তখুনি নরেনের খোঁজ। 'নরেন খা, নরেন খা।'

'শুধু নরেন খা।' শোভাবাজারের রাজাদের বাড়ির ছেলে যতীন দেব ছিল সে-আড্ডায়, সে বলে উঠল : 'আর আমরা শালারা ভেসে এসেছি।'

ঠাকুর হাসতে লাগলেন। বললেন, 'দক্ষিণেশ্বরে যাস, সেখানে দেবখন খেতে।'

'সে জন্যেই তো দেবেন মজুমদারের অভিমান।' গিরিশ বললে, 'বলে, আমাদের ভিতর তো ক্ষীরের পোর নেই, কলায়ের পোর। তা আমরা গিয়ে কি করব!'

নরেনকে বেশি ভালোবাসি। কি করব, ভালোবাসি। ভালোবাসি—এর উপরে কি আর কোনো কথা আছে। কেশব সেনকেও ভালোবাসি। হাজরা বলে, কেশব সেন রজোগুণী লোক, টাকা-কড়ি মানসম্ভ্রম আছে, তাই তাকে ভালোবাস। ঠাকুর বললেন, 'তা নয় বুঝলুম কিন্তু হরীশ, নোটো ওদের ভালোবাসি কেন? আর নরেন, নরেনকে কেন ভালোবাসি! তার তো কলাপোড়া খাবারও নুন নেই।'

সেই নরেনই একদিন ঠাকুরকে চেপে ধরল : 'কে বলে তোমার ঈশ্বর দয়াময়? সে যদি দয়াময়ই হবে তবে পৃথিবীতে এত দুঃখদারিদ্র্য কেন, কেন এত অসামঞ্জস্য,

কেন এত নিষ্ঠুরতা?'

এক মুহূর্ত তার চোখের দিকে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'কথা কোসনে। স্তব্ধ হ। আকাশের দিকে তাকা।'

আকাশের দিকে তাকালে কি দেখব? দেখব অনন্ত তাকিয়ে আছে আমার দিকে। অজ্ঞেয় অপরিমেয় মৌন সম্ভাষণ করছে আমাকে। দেখব নক্ষত্রকণিকার মণিকা জ্বলছে অগণন। একটা-দুটো, বিশ-পঁচিশ, শ-দুশো নয়—লাখ-লাখ কোটি-কোটি। একটা সূর্য, একটা চন্দ্র, একটা ধ্রুবতারা বুঝি, তাদের দিয়ে না-হয় কিছু-না-কিছু কাজ হয় সংসারের,—কিন্তু এতগুলি তারা দিয়ে আমাদের কি প্রয়োজন? কয়েক ঝাঁক কম হলেই বা ক্ষতি কি ছিল! কেন অসংখ্য হল? অসংখ্য কি অনিয়মের ফল, না, নীতির ও শৃঙ্খলার? এখন এই অন্তহীনকে ক্ষান্তিহীনকে দেখ, আর, ভাবো এই অনন্তের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবী কতটুকু। এক দানা সর্ষে, এক কণা ধূলি। তার মধ্যে তুই। তোর মস্তিষ্ক, তোর হৃৎস্পন্দন, তোর প্রশ্ন, তোর অভিযোগ! কথা কোসনে।

কর্ম কর্, কর্ম করে আকর্ষণ কর্ কৃপা।

জীবনের পরম স্তব্ধতায় সেই মহামৌনের উত্তর দে। তিনি সম্বোধন তুই প্রতিধ্বনি।

সেই ঠাকুরকে কে-একজন সেদিন খুব নিন্দা করল নরেনের সামনে। গেঁয়ো মুখখু বামুন, তার আবার জ্ঞানগম্যি কি। তার আবার কথার মূল্য!

প্রথমটা নরেন খানিক তর্ক করলে। কিন্তু লোকটি উকিল, তর্কে পরাস্ত হবার পাত্র নয়। শেষে ছেড়ে দিল নরেন, এমন ভাব করল যেন সে মেনে নিয়েছে উকিলকে। উকিল হাসতে-হাসতে চলে গেল।

চলে যেতেই তেড়ে এল লাটু। বললে, 'আপনি ঠাকুরের নিন্দে মেনে নিলেন?'

'ওরে ধোঁয়া কি আকাশকে ময়লা করতে পারে?' নরেন বললে, 'ওর সঙ্গে বৃথা তর্ক করতে গেলে আমার কত সময় নষ্ট হয়ে যেত বল দেখি। একটু মেনে নিলুম লোকটা খুশি হয়ে চলে গেল। অল্পে একটা লোককে খুশি করতে পারলে মন্দ কি।'

'হায়রে অল্প বিশ্বাস!' ব্রহ্মানন্দকে চিঠি লিখছেন বিবেকানন্দ : 'তাঁর কৃপায় ব্রহ্মাণ্ডম্ গোষ্পদায়তে। আমাদের আর কি চাই! তিনি শরণ দিয়েছেন, আর চাই কি! ভক্তি নিজেই যে ফলস্বরূপা। যিনি খাইয়ে-পরিয়ে বুদ্ধিবিদ্যে দিয়ে মানুষ করলেন, যিনি আত্মার চক্ষু খুলে দিলেন, যাঁকে দিন-রাত দেখলে জীবন্ত ঈশ্বর, যাঁর পবিত্রতা আর প্রেম আর ঐশ্বর্য রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য প্রভৃতিকে এক কণা মাত্র প্রকাশ, তাঁর কাছে নিমকহারামি! অমন ঠাকুরের দয়া ভোলো! দেশে-বিদেশে নাস্তিক-পাষণ্ডে তাঁর ছবি পূজা করছে—আর তোদের মতিভ্রম হয় সময়ে সময়ে! তোদের জন্ম ধন্য, কুল ধন্য, দেশ ধন্য যে তাঁর পায়ের ধুলো পেয়েছিস।'

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে, আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরে বাঁধা সবার কাছে।

ঠাকুর বললেন, আমি মুক্তি চাইনা, ভক্তি চাই। আমি চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে ভালোবাসি।

স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, 'আমি বৃষ্টিবিন্দু হতে চাই। বৃষ্টিবিন্দু হয়ে সমুদ্রে ঝরে পড়ব না। ঝরে পড়ব মাটিতে। ঝরে পড়ে ধুয়ে দিয়ে যাব এক কণা ধূলি। মুছে দিয়ে যাব এক কণা পিপাসা।'

'আমি মুক্তি দিতে কাতর নইরে শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই।' ঠাকুর গান ধরলেন : 'ভক্তি যেবা পায় সে যে সেবা পায়, তারে কে বা পায়, সে যে ত্রিলোক-জয়ী।'

মুক্তি দিলেই তো নিশ্চিন্ত, কোনো ঝঞ্ঝাট নেই ঝামেলা নেই। কিন্তু ভক্তি দিলে মুস্কিল, ভগবানের সর্বদা থাকতে হয় ভক্তের সঙ্গে। উঠতে-বসতে। পদে-পদে। সম্পদে-বিপদে।

ভক্তি ভগবানের ঐশ্বর্য-মহিমা বোঝে না, জানতেও চায় না। সে শুধু মাধুর্যের কারবারী, তার তৃপ্তি শুধু উপভোগে, আস্বাদনে। সে এ হিসেব করে না তার মা কত রূপসী না বিদুষী, তার কাছে মা মা, সব হিসেবের পার, সব সময়েই মিষ্টি। মায়ের ধন-রত্নের দিকে সে তাকায় না, সে তাকিয়ে থাকে মায়ের হাসিটির দিকে।

আর কর্ম? কর্ম হচ্ছে পূজা। ভগবানের প্রীতির জন্যে যে কর্ম সে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পূজা।

'আরেক কথা বুঝেছি যে, পরোপকারই ধর্ম।' বললেন বিবেকানন্দ : 'বাকি যাগযজ্ঞ সব পাগলামো। নিজের মুক্তি-ইচ্ছাও অন্যায়। যে পরের জন্যে সব দিয়েছে, সেই মুক্ত। আর যারা, আমার মুক্তি, আমার মুক্তি করে দিনরাত মাথা ভাবায় তারা ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ হয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

আবার ডাক দিলেন : 'গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা, লোকহিত জগতের কল্যাণ কর—নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি হোক—আমার মুক্তির বাবা নির্বংশ। নিজের ভাবনা যখনি ভাববে তখনি মনে অশান্তি। তোমার শান্তির দরকার কি বাবাজী? সব ত্যাগ করেছ এখন শান্তির ইচ্ছা, মুক্তির ইচ্ছাটাকেও ত্যাগ করে দাও তো বাবা। কোনো চিন্তা রেখ না। নরক-স্বর্গ ভক্তি বা মুক্তি সব ডোণ্ট কেয়ার। আর ঘরে ঘরে নাম বিলোও দেখি বাবাজী। আপনার ভালো কেবল পরের ভালোয় হয়, আপনার মুক্তি ও ভক্তিও পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়। তাইতে লেগে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও।'

বীরভক্ত কে? মাথায় বোঝা নিয়েও যে ভগবানের স্মরণ-মনন করে। সংসারে থেকে ভগবানের আরাধনা, সে শবসাধনার মত। শবের উপরে বসে সাধন করবার সময় শবের মুখে মাঝে-মাঝে জল-ছোলা দিতে হয় নইলে সাধকের ঘাড় মটকে

দেবে। তাই পরিবার-পরিজনের খাবার যোগাড় করো তারপর বোসো তোমার সাধনায়। ঘরে চাল নেই, উপাসনা অসম্ভব। পেটে ভাত নেই, কিসের ভক্তি? তবে ঘরে চাল আর পেটে ভাত হলেই সমস্ত হল না—চাই ভালোবাসা, সমস্ত ব্যঞ্জনের যা নুন, সমস্ত মাল্যের যা গ্রন্থি।

আর সন্ন্যাস? বেপরোয়া হয়ে উঁচু তালগাছ হতে ঝাঁপ দেবার নাম সন্ন্যাস।

'গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্যের নিশান—কায়মনোবাক্যে 'জগদ্ধিতায়' দিতে হইবে। পড়েছ মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব—আমি বলি দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব—দরিদ্র মূর্খ অজ্ঞানী ও কাতর ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।'

'নরেনের খুব উঁচু ঘর।' বললেন ঠাকুর, 'ওর ঘর বলে দিলে ও দেহ রাখবে না। আমি ওকে ভুলিয়ে রেখেছি। ওর চাবি আমার হাতে।'

একদিন বললেন, 'তুই যদি চাস কৃষ্ণকে দেখতে পারিস।'

এক কথায় উড়িয়ে দিল নরেন। বললে, 'আমি কিষ্ট-ফিষ্ট মানিনা।'

আর একদিন বললেন ঠাকুর, 'আমার তো সিদ্ধাই করবার জো নেই। তোর ভেতর দিয়ে করব, কি বলিস?'

আবার উড়িয়ে দিল এক কথায়। নরেন ঝঙ্কার দিয়ে বললে, 'না ওসব চলবে না।'

'কাউকে কেয়ার করে না।' বলছেন ঠাকুর, 'কাপ্তেনের গাড়িতে যাচ্ছিল, কাপ্তেন ভালো জায়গায় বসতে বললে, তা চেয়েও দেখল না। আমারই অপেক্ষা রাখে না, অন্যলোকে কা কথা! আবার যা জানে তাও বলে না। পাছে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াই নরেন এত বিদ্বান। মায়া নেই মোহ নেই বাধা নেই বন্ধন নেই। তারপরে কত গুণ। যেমনি গাইতে-বাজাতে তেমনি লেখাপড়ায়। তা আমার কাছে বেশি আসে না। তা ভালো। বেশি এলে আমি বিহ্বল হই।'

সেদিন বলছেন, 'মনে চারটি সাধ উঠেছে। বেগুন দিয়ে মাছের ঝোল খাব। শিবনাথের সঙ্গে দেখা করব। হরিনামের মালা এনে ভক্তেরা জপবে দেখব। অষ্টমির দিন তন্ত্রের সাধকেরা কারণ পান করবে তাদের প্রণাম করব।'

নরেন কাছে বসে। হঠাৎ তার দিকে দৃষ্টি পড়ল। ঠাকুর উঠে দাঁড়ালেন, নরেনের হাঁটুতে পা রেখে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

আর সেদিন বসলেন নরেনের পিঠের উপর।

ভবনাথের সঙ্গে গল্প করছে নরেন। ঘরের মেঝেয় মাদুর পাতা। তাতে শুয়ে-শুয়ে গল্প করছে দু'জন। গল্প করতে-করতে কখন উপুড় হয়েছে নরেন, হঠাৎ ঠাকুর তার পিঠের উপর এসে বসলেন। আর বসেই সমাধিস্থ।

সেদিন একেবারে ঘাড়ের উপর।

ঠাকুরের জন্মোৎসব হচ্ছে। আনন্দের হাটবাজার বসে গিয়েছে। নরোত্তম কীর্তন গাইছে, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠমিলন পালা। কিন্তু সবই আলুনি, নরেন এখনো আসেনি। 'কই নরেন এল না?' বারে-বারে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন ঠাকুর।

আবার বলছেন, 'ওরে তোরা আর কিছু নিস বা না নিস কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর

এই টানটুকু নে।'

সেই একাগ্র তন্ময়তা! পরমবিরাম সমুদ্রের জন্যে যেমন নির্ঝরধারার ব্যাকুলতা। নরেন এসেছে, নরেন এসেছে। তপ্তধূলি রুক্ষ ডাঙায় নেমেছে স্নেহবৃষ্টি। যেই প্রণাম করতে নিচু হয়েছে নরেন, ঠাকুর তার কাঁধের উপর চড়ে বসলেন।

'তুই গিরিশ ঘোষের ওখানে যাস?' জিগগেস করলেন একদিন।

'তা যাই মাঝে মাঝে।' বললে নরেন।

'কিন্তু ওর থাক আলাদা। ওর হচ্ছে রাবণের ভাব। ভোগও করবে আবার রামকেও লাভ করবে।'

'আগেকার সঙ্গ ছেড়েছে গিরিশ।'

'তা রশুনের বাটি যতই ধোওনা কেন গন্ধ একটু থাকবেই।'

'কিন্তু আজকাল আপনার চিন্তাতেই মশগুল।'

'ও যা আজকাল বলে তার সঙ্গে কি তোর মিল হয়?' ঠাকুর তাকালেন কৌতূহলী হয়ে।

'আপনাকে ওর অবতার বলে বিশ্বাস।' নরেন বললে, 'কিন্তু আমি কিছু বলিনি।'

'কিন্তু ওর খুব বিশ্বাস!'

দীপ আর শিখা। বিশ্বাস আর ব্যাকুলতা। হাল আর পাল। চাকা আর তার মধ্যবিন্দু।

অজ্ঞাতসমুদ্রে নিশ্চয়ই কোথাও কূল আছে এই আমার মহৎ সম্বল। এই আশ্চর্য পৃথিবীতে আমার অস্তিত্বও একটা আশ্চর্য ব্যাপার। সমস্ত জীবন দিয়ে ঘোষণা করতে হবে সেই আশ্চর্যকে এই আমার প্রথম প্রতিজ্ঞা।

মনে সঙ্কল্প করবে বাক্যে উচ্চারণ করবে আর কর্মে তা সুসিদ্ধ করবে।

সেবার বলরাম বোসের বাড়ি খেতে বসেছেন ঠাকুর, খেতে-খেতে নরেন-নরেন বলে কাতরতা। ওরে, নরেন কোথায় বসেছে? ঐ যে, প্রথম সারে। ঠাকুর একবার তাকে দেখেন আবার খান; হঠাৎ পাত থেকে দই আর তরমুজের পানা নিয়ে নরেনের কাছে উপস্থিত। বললেন, 'নরেন তুই একটু খা।'

মুখ ফিরিয়ে নিতে পারল না নরেন। হাতে করে বয়ে নিয়ে এসেছেন মুখের সামনে, সানন্দে তা গ্রহণ করল। আর ঠাকুর আবার তাঁর নিজের আসনে গিয়ে বসলেন।

হীরানন্দ এসেছে ঠাকুরকে দেখতে, তাঁর অসুখ শুনে। কলকাতার কলেজে লেখাপড়া শিখে হীরানন্দ দেশে গিয়েছিল, এবার আবার ফিরেছে কলকাতা। সিন্ধুদেশের ছেলে, কোথায় কলকাতা, কোথায় সিন্ধু। ঠাকুরের টানে দুস্তর ব্যবধান সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ঠাকুরের বড় সাধ, নরেনের সঙ্গে হীরানন্দের একটু কথা হয়। একটু বা তর্ক হয়। বেশ লাগবে ওদের কথা শুনতে।

তোমরা দু'জনে একটু কথা কও। নরেন আর হীরানন্দকে বসালেন তাঁর

পাশটিতে।

হীরানন্দ নরেনকে প্রশ্ন করল : 'আচ্ছা, ভক্তের এত দুঃখ কেন?'

কি মধুময় কণ্ঠস্বর! শুধু একটা প্রশ্নের জন্যে প্রশ্ন নয়। অন্তরে বহুসঞ্চিত ভালোবাসা থাকলেই বুঝি কণ্ঠস্বর এমন গাঢ় হয়। শুধু সামান্য একটু উচ্চারণেই উপলব্ধির পরিচয়।

নরেন খেপে উঠল। বললে, 'আমার তো মনে হয় এ জগৎ এক শয়তানে তৈরি করেছে—'

শান্তমুখে হাসল হীরানন্দ।

'আমি যদি হতাম আমি এর চেয়ে ঢের ভালো সৃষ্টি করতে পারতাম—'

'কিন্তু দুঃখ না থাকলে কি সুখবোধ হবে? মন্দ না থাকলে ভালোর দাম কি?'

'কি উপাদানে সৃষ্টি করতে হবে তা আমি বলছি না।' নরেন বললে, 'তবে যা দেখতে পারছি ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত মোটেই ভালো নয়। তবে এক কথা।' তাকাল ঠাকুরের দিকে : 'তবে যদি সবই ঈশ্বর এ বিশ্বাস করা যায়, পাপ-পুণ্য শুচি-অশুচি জ্ঞান-অজ্ঞান দ্বেষ-প্রেম তবেই সব হ্যাঙগাম চুকে যায়। আমি এখন তাই করছি।'

'ও কথা বলা সোজা, আয়ত্ত করা কঠিন।'

নরেন নির্বাণষটক স্তোত্র আবৃত্তি করলে :

আমি মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত কিছুই নই, আমি কর্ণে-রসনায় ঘ্রাণে-নয়নে কোথাও নেই। আমি না আকাশ না মাটি না বায়ু না অগ্নি—আমি চিদানন্দময় শিব। আমাতে না আছে দ্বেষ বা অনুরাগ, লোভ বা মোহ, মদ বা মাৎসর্য; ধর্মও বুঝি না অর্থও বুঝি না, কামও জানি না মোহও জানি না—আমি চিদানন্দময় শিব। না পুণ্য না পাপ না সুখ না দুঃখ—মন্ত্রও নেই তীর্থও নেই বেদও নেই যজ্ঞও নেই। আমি ভোজ্যও নই ভোক্তাও নই—আমি ভোক্তাভোজ্যবিরহিত অনন্ত ভোজন, অনন্ত আস্বাদ—আমি চিদানন্দময় শিব। আমি অমৃত্যু আমি অশঙ্ক, আমার পিতা নেই মাতা নেই জাতি নেই বন্ধু নেই আত্মীয় নেই, আমি গুরুও নই শিষ্যও নই—আমি চিদানন্দময় শিব। আমি নির্বিকল্প, নিরাকার, সমস্তই আমার ইন্দ্রিয়ের বিভূতি। আমি মুক্তও নই পরিমিতও নই, অংশও নই সম্পূর্ণও নই—আমি শিব চিদানন্দময়।

উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন ঠাকুর। হীরানন্দকে বললেন, 'এর এখন জবাব দাও।'

হীরানন্দ বললে, 'ও একই কথা। এক কোণ থেকে ঘর দেখাও যা, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘর দেখাও তাই। আমি তোমার দাস এতেও ঈশ্বরানুভব আর আমিই সেই ঈশ্বর এতেও ঈশ্বরানুভব। ঘরে ঢোকবার অনেক দরজা। একটি দ্বার দিয়েও ঘরে ঢোকা যায় আবার নানা দ্বার দিয়েও।'

ঠাকুর খুশি হলেন উত্তর শুনে। নরেনকে বললেন, 'এবার সেই গানটা গা তো। যো কুছ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়।'

এতক্ষণ আমি-আমি শুনলাম এবার একটু তুমি-তুমি শুনি।

নরেন গান ধরল : 'তুমসে হামনে দিলকো লাগায়া, যোকুছ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়।

যাহা মাই দেখা তুঁহি নজরমে আয়া, যোকুছ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়।'

যা কিছু দেখেছি সব তোমাকেই দেখেছি। সর্বত্রই তোমার আসন, তোমার আনন।

হীরানন্দ বললে, 'এখন আর হাম হাম নয় তুঁহু-তুঁহু।'

নরেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'আমাকে এক দাও, আমি তোমাকে কোটি-নিযুত দেব। একের পরে শূন্য বসিয়েই কোটি-নিযুত। আসল হচ্ছে সেই এক। আমি এক, তুমি সেই একের পিঠে শূন্য। তুমি আর আমি, আমি আর তুমি। আমি বই আর কিছু নেই।'

'নরেন যেন হাতে খাপখোলা তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্ছে।' বললেন ঠাকুর। 'আর হীরানন্দ? কি শান্ত, কি স্থির! যেন রোজার সামনে জাতসাপ ফণা ধরে চুপ করে আছে।'

•

১৬

'নিজেরা শ্রদ্ধাবান হয়ে দেশে শ্রদ্ধা আন্।' বললেন বিবেকানন্দ : 'হৃদয়ে শ্রদ্ধা আন নচিকেতার মত। নচিকেতার মত যমলোকে চলে যা, আত্মতত্ত্ব জানবার জন্যে, আত্মাকে উদ্ধারের জন্যে, জন্ম-মৃত্যু-প্রহেলিকার মীমাংসার জন্যে। যমের মুখে গেলে যদি সত্য লাভ হয়, তাহলে নির্ভীক হৃদয়ে যমের মুখে যেতে হবে। ভয়ই তো মৃত্যু। ভয়ের পরপারে চলে যা।'

উদ্দালকের ছেলে এই নচিকেতা। স্বর্গকামনায় বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করছেন, সেই যজ্ঞে সর্বস্ব দান করলেন ব্রাহ্মণদের। ছোট ছেলে নচিকেতা এসে জিগগেস করলে, বাবা, আমাকে কাকে দান করবেন? কথাটা কানে তুললেন না উদ্দালক। ছেলে আরেকবার জিগগেস করল। আরো একবার। তখন উদ্দালক রুষ্ট হয়ে বললেন, যমকে দান করব।

খুশি হল নচিকেতা। আমি তো অধম-অক্ষম নই, বরং শ্রদ্ধায় সদাচারে আমি অনেকের অগ্রণী। তাই বাবা যখন আমাকে যমের বাড়ি পাঠাচ্ছেন তখন নিশ্চয়ই কোনো মহৎ প্রয়োজন সাধন হবে। তথাস্তু। এবার তবে সত্যপালন করুন। পাঠিয়ে দিন যমগৃহে।

যেন অপ্রস্তুত হলেন উদ্দালক।

শস্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন। বললে নচিকেতা। একবার জীর্ণ হয়ে মরে আবার সজীব কান্তি নিয়ে জন্মায়। সুতরাং অনিত্য সংসারে মিথ্যাচরণ বৃথা।

উদ্দালক তখন নিরুপায় হয়ে নচিকেতাকে পাঠিয়ে দিল যমলোকে।

যমালয়ে এসে নচিকেতা দেখলে যম বাড়ি নেই। প্রত্যাবর্তনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। তিন দিন পরে ফিরল বৈবস্বত। অভুক্ত অতিথি দেখে অপ্রতিভ হল যম। বললে, তুমি আমার ঘরে তিন রাত্রি অনাহারে বাস করেছ, আমার মঙ্গল

হোক। হে ব্রাহ্মণ তোমাকে নমস্কার, তুমি অনাহারযাপিত প্রতিরাত্রির জন্যে একটি করে বর চাও।

নচিকেতা বললে, তিনটি বরের মধ্যে প্রথম বর এই দাও আমার বাবা যেন আমার প্রতি প্রসন্ন ও বীতক্রোধ হন। আর যখন যমপুরী থেকে ফিরে যাব যেন আমাকে আগের মত চিনতে পেরে সাদরসম্ভাষ করেন।

মৃত্যুমুখ থেকে প্রমুক্ত হয়ে তুমি যখন ফিরে যাবে দেখবে তোমার বাবা আগের মতই তোমার প্রতি স্নেহশীল আছেন। প্রথম বর পূর্ণ করল যম। দ্বিতীয়?

ক্ষুধাতৃষ্ণাভয়দুঃখাতীত হয়ে স্বর্গে যারা বাস করছে কি উপায়ে তারা লাভ করল অমরত্ব? আমি শ্রদ্ধাযুক্ত। আমাকে বলুন সে কৌশলকথা।

স্বর্গসাধন কর্মকাণ্ডের কথা বললে এবার যম। এখন তৃতীয় বর প্রার্থনা করো।

মরলে পর মানুষ কোথায় যায় এই প্রশ্নের উত্তরই আমার তৃতীয় বর। কেউ বলে সে তখনো বেঁচে থাকে, কেউ বলে নয়, এই তত্ত্বের নির্ণয় চাই।

যম বললে, আর কোনো বর চাও। এই আত্মতত্ত্ব দুর্বিজ্ঞেয়। দেবতারাও বুঝে উঠতে পারেনি সহসা। সুতরাং এ উপরোধ ত্যাগ করো।

আপনার মত কে আছে আর আত্মতত্ত্বের বক্তা? আর আত্মতত্ত্বের মত বিষয়ই বা কি আছে? উপরোধ ত্যাগ করতে অনুরোধ করবেন না। দৃঢ় হল নচিকেতা। আমার তৃতীয় বর পূর্ণ করুন।

যম লোভজাল বিস্তার করল। দীর্ঘ জীবন কামনা করো, যত দিন বাঁচতে চাও ততদিনের আয়ুষ্কাল। অফুরন্ত স্বর্ণরত্ন নাও, নাও পুত্রপৌত্র, হস্তী-অশ্ব, নাও মহদায়তন বিশাল ভূমি। মর্তলোকে যে সব কাম্যবস্তু দুর্লভ নাও সে সব দিব্য-ভোগের অধিকার। আর সব প্রশ্ন করো কিন্তু আমাকে মৃত্যু বিষয়ে কিছু প্রশ্ন কোরো না।

ন বিত্তেন তর্পণীয় মনুষ্যঃ। বিত্তে মানুষের তৃপ্তি নেই। তার সন্তোষ আত্মবোধে। আমাকে লুব্ধ করবেন না। সমস্ত লোভবস্তু স্বল্পজীবী। সেই স্বল্পসুখভোগী দীর্ঘ জীবন নিয়ে আমি কি করব? যা জানবার জন্যে আমি পিপাসিত হয়েছি তাই জানিয়ে আমার তৃষ্ণা দূর করুন। বালক নচিকেতা নির্বিচল রইল সঙ্কল্পে।

হে মহৎজিজ্ঞাসু, তুমি তাঁকেই জানতে চেয়েছ যিনি এই অনর্থবহুল মানুষের শরীরের মধ্যেই বাস করছেন, যিনি হৃদয়গুহায় প্রতিষ্ঠিত, যিনি গূঢ়, দুর্জ্ঞেয় অথচ যিনি স্বপ্রকাশ। কঠোর দুঃখসাধন করা ছাড়া যাঁকে দেখা যায় না, যিনি সর্ব আনন্দের আকর, সর্ব জগতের ধ্রুবপদ। যিনি অণু হতে অনীয়ান মহৎ হতে মহীয়ান, যিনি শরীরের মধ্যে অশরীরী, অনিত্যের মধ্যে সনাতন। কে লাভ করতে পারে আত্মা? যে দুশ্চরিত থেকে নিবৃত্ত, যে শান্তমানস, যে সমাহিত সেই প্রজ্ঞানযোগে আত্মাকে লাভ করতে পারে। তুমিই সেই প্রজ্ঞানী, তুমিই সেই বিবেকবুদ্ধিমান।

'বল অস্তি অস্তি—' বললেন বিবেকানন্দ : 'নাস্তি নাস্তি করে দেশটা গেল।

সোঽহং, সোঽহং, শিবোঽহং। প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি। ওরে নেই নেই বলে কি কুকুর বেরাল হয়ে যাবি নাকি? কিসের নেই? কার নেই? শিবোঽহং, শিবোঽহং। নেই নেই শুনলে আমার মাথায় যেন বজ্র মারে। ঐ যে দীনহীন ভাব, ও হল ব্যারাম—ও কি দীনতা? ও গুপ্ত অহঙ্কার। যে যা বলে বলুক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও। দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে, কোনো ভাবনা নেই। বল আমি সব করতে পারি। নেই নেই বললে সাপের বিষ নেই হয়ে যায়। নো নেই-নেই, বল হাঁ হাঁ, সোঽহং, সোঽহং। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। পর্বতগাত্রস্খলিত বিপুল তুষারস্তূপের মত পড় গিয়ে দুনিয়ার উপর। নিজেকে শ্রদ্ধা কর নিজেকে বিশ্বাস কর—হর হর মহাদেব।'

'প্রমাণ না হলে কেমন করে বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন।' নরেন বললে জোর দিয়ে।

বলরাম বোসের বাড়িতে দোতলার উপরে বসে কথা হচ্ছে। ঠাকুর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছেন, তাঁকে ঘিরে ভক্তদলের সমাবেশ। বলরাম বাড়ি নেই, হাওয়া বদলাতে মুঙ্গেরে গেছে। কিন্তু ঠাকুর ও তাঁর ভক্তদের জন্যে তার ঘর মুক্তদ্বার।

গিরিশ ঘোষ বললে, 'বিশ্বাসই যথেষ্ট প্রমাণ। এই জিনিসটা যে এখানে আছে তার প্রমাণ কি? যে মুহূর্তে বিশ্বাস করব যে আছে সেই মুহূর্তেই তা প্রমাণিত।'

নরেনের বিচার, গিরিশের বিশ্বাস।

পল্টুও তর্কে যোগ দিলে। সেও বিশ্বাসের দিকে। বিচার যদি চার হাত যায় বিশ্বাস যাবে আদিগন্ত।

ঠাকুর হেসে বললেন, 'নরেন হচ্ছে উকিলের ছেলে আর পল্টু ডেপুটির।'

উকিল সওয়াল করে, রায় দেয় ডেপুটি। রায়ই বহাল থাকে। বহু তর্কবিচারের পর অচলপ্রতিষ্ঠ হয় বিশ্বাস। বিশ্বাসের চেয়ে বড় আর কিছু নেই।

'সরল বিশ্বাস বালকের মত বিশ্বাস না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।' বললেন আবার ঠাকুর। 'মা বলেছেন, ও তোর দাদা, বালকের তখনি বিশ্বাস, ও আমার ষোল আনা দাদা। সে হয়তো বামুনের ছেলে আর দাদা হয়তো ছুতোর কি কামার। মা বলেছেন, ও ঘরে জুজু আছে, যোলো আনা বিশ্বাস জুজু আছে ওঘরে। সংসারবুদ্ধি, সেয়ানাবুদ্ধি, পাটোয়ারিবুদ্ধি, বিচারবুদ্ধি করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।'

'আমি তো ঈশ্বরে অবিশ্বাস করছি না।' বললে নরেন, 'কিন্তু তিনি অবতার হয়ে কোথাও ঝুলছেন তা মানতে আমি প্রস্তুত নই।'

'নরেনের কথা আর আমি লই না।' ঠাকুর বললেন স্নেহকরুণ হাসি ঢেলে : 'ও সেদিন চামচিকেকে চাতক বলেছিল। যদু মল্লিকের বাগানে সেদিন আমাকে বললে তুমি ঈশ্বরের রূপ-টুপ যা দেখ সব মনের ধোঁকা। আমি বললাম সে কি, কথা কয় যে রে! নরেন তবু উড়িয়ে দেয়, বলে, ও অমন হয়।'

'আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মানি।' গর্জে উঠল নরেন : 'আর মানি অনন্ত অবতার।'

'আহা!' ঠাকুর অমনি ভাবাবিষ্ট হলেন, দু'হাত জোড় করে কপালে এনে

ঠেকালেন। বললেন, 'অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত অবতার।'

সকলেই সেই তেজোময় অমৃতপুরুষ—আত্মার প্রকাশে স্পষ্ট করো সেই স্বর্ণস্বাক্ষর। মানুষের মধ্যে তো শুধু বাঁচবার প্রাণ নেই, আছে বড় হবার মহিমা। মানুষের ঋদ্ধি বৃদ্ধি সিদ্ধি সব সেই বড় হবার মহত্ত্বের মধ্যে। সেইখানেই তার ঈশ্বরত্ব। সব তার নিজের মধ্যে সঞ্চিত ও সংহত হয়ে আছে, তার অতিরিক্ত কিছু নেই। সেই প্রচ্ছন্নকে প্রস্ফুট করো। জড়ের মধ্যে আনো প্রাণস্পন্দনব্যঞ্জনা। যা মূক তাকে শুধু মুখর করা নয়, সেই মুখরতাকে মহান্ অর্থে আরূঢ় করা। সোঽহং বলা তো নিজের কাজ সেরে সরে পড়া নয়, সমস্ত মানুষকে সেই সত্তার পৌঁছে দেবার সাধন করা। তাই সোঽহং মানে একলা আমি নই সোঽহং মানে সকলে। আমি ছাড়া সকল নেই সকল ছাড়া আমি নেই। তাই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত অবতার। আমি তুমি সকলেই সেই ঈশ্বরের প্রতিভাস ঈশ্বরের প্রতিকায়।

একটা হিন্দুস্থানী ভিক্ষুক গান গাইতে এসেছে। দু-একটি করে পয়সা দিচ্ছে ভক্তরা। বেশ গায় কিন্তু ভিখিরী—নরেনের ভালো লেগে গিয়েছে। সে বলে উঠল, 'আবার গাও।'

'কিন্তু অত পয়সা কোথায়?' ঠাকুর আপত্তি করলেন: 'বললেই তো আর হল না।'

'আপনাকে আমীর ঠাওরেছে।' বললে একজন ভক্ত। 'আপনি তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছেন।'

ঠাকুর হেসে বললেন, 'অসুখ হয়েছেও ভাবতে পারে।'

সত্যি-সত্যি ঠাকুরের অসুখ করে গেল। কিছুই খেতে পারেন না। গলায় ঘা। তবু তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে ছাড়ে না নরেন। বলে, 'যেমন গাছ দেখছি তেমনি করে কেউ ভগবানকে দেখেছে?'

তুমি চোখ চেয়ে দেখ না ভাস্বর দিব্যাম্বর কে তোমার চোখের সামনে বসে। সর্ববরদ কাঞ্চনবৃক্ষ।

'কেউ-কেউ ঈশ্বর বলে আমাকে।' স্নেহান্বিত কণ্ঠে বললেন ঠাকুর।

'হাজার লোকে বলুক, বয়ে গেল।' বললে নরেন্দ্রনাথ। 'আমার যতক্ষণ সত্য বলে না বোধ হয় ততক্ষণ বলবনা।'

'অনেকে যা বলবে তাই তো সত্য, তাই তো ধর্ম।'

'আমি তা মানিনা। নিজে ঠিক না বুঝলে মানিনা অন্যের কথা।' নরেন আবার হুঙ্কার দিল: 'পরের মুখের ঝাল খেতে আমি প্রস্তুত নই।'

কিন্তু যাই তিনি হোন, কিছু খেতে পাচ্ছেননা, গলা দিয়ে নামছেনা কিছু এই দুঃখের দৃশ্য তো দেখতে পাচ্ছিনা। তোমার কালী তবে কি করতে আছে? তিনি তো বলো পুত্তলিকা নন। তিনিই তো সব কর্ত্রী-কারয়িত্রী, তবে তোমার এই ব্যাধি কেন সারিয়ে দেন না? অন্তত সাধারণ রুগীর মত খেতে পারো গিলতে পারো তার ব্যবস্থা করে দিন। কী তবে এতদিন তার ভজনা করলে? তার সঙ্গে এত চলা-ফেরা করলে এত কথা-বার্তা কইলে, তোমার খবর জানতে তার তো আর কিছু

বাকি নেই। তবে করুননা কিছু সুরাহা। অন্তত কিছু খেতে পারো। তোমার অসুখের কষ্টের চেয়ে তুমি যে খেতে পাচ্ছনা এই কষ্টই বেশি।

যাও তোমার ভবতারিণীর মন্দিরে। ছাড়বনা কিছুতেই, পাঠাবই পাঠাব। যেমন আমাকে একদিন পাঠিয়েছিলে। যাও আহার্য আর আরোগ্য চেয়ে নিয়ে এস।

নরেন কোমর বাঁধল। যেতেই হবে। খেতেই হবে।

১৭

'যে মন মাকে সমর্পণ করেছি তা আবার নিজের দেহের উপর এনে বসাতে পারি না।' ঠাকুর বাধা দিতে চাইলেন নরেনকে। 'সামান্য শরীরের কথা মাকে কি করে বলব?'

এ একটা কথা হল? যেখানে একটা মুখের কথা বললে শরীরের এই দারুণ-দহন দুঃখ দূর হয়ে যায় সেখানে আবার কিসের আপত্তি? মেঘ চাইতেই যেখানে জল মেলে সেখানে শুকনো মাঠ নিয়ে কে বসে থাকে?

'দুঃখ জানে শরীর জানে মন তুমি আনন্দে থাকো।' ছন্দোময় আনন্দমন্ত্র উচ্চারণ করলেন ঠাকুর।

এই যে আমার রোগজ্বালা এ দুঃখ আর শরীরের মধ্যে একটা নিষ্করুণ সংগ্রাম। একজনের হাতে প্রহার আরেকজনের হাতে প্রত্যাহার, ঢালে-তরোয়ালে যুদ্ধ করছে দুই শত্রু। দেখাচ্ছে তাদের রণনৈপুণ্য। তাতে, হে মন, তোমার কি মাথাব্যথা! তোমাকে কে ছোঁয়, তোমাকে কে ম্লান করে? তুমি স্বাধীন তুমি স্বতন্ত্র তুমি সংশ্লেষলেশশূন্য। তুমি নীলনির্মল নিঃসঙ্গানন্দ আকাশ। তোমার কে নাগাল পায়! ধোঁয়া ঘর-দেয়ালই মলিন করে কিন্তু আকাশের কাছে ঘেঁষতে পারে না। তেমনি, হে মন, দুঃখে তোমার কি করবে? কুসুমে কণ্টক থাকতে পারে, কলানাথে কলঙ্ক, কিন্তু মন, তোমাতে গ্লানি নেই মালিন্য নেই দুঃখের বাষ্পমাত্র নেই।

'কিন্তু আমাদের দুঃখটা দেখুন। আপনি যে কিছু খেতে পাচ্ছেন না এই দুঃখে আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে। সেই দুঃখের বিহিত করুন।'

ঠেলেঠুলে ঠাকুরকে নরেন পাঠিয়ে দিল মন্দিরে। পাঠিয়ে দিয়ে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল।

সেই এক দিন আর এই এক দিন।

কতক্ষণ পরে বেরিয়ে এলেন ঠাকুর।

উচ্ছলিত হয়ে নরেন ছুটে গেল তাঁর কাছে। বললে, 'কি, বলেছিলে?'

'বলেছিলুম।'

'কী বলেছিলে?'

'বলেছিলুম, মা, কিছু খেতে পাচ্ছি না, গলা দিয়ে নামছেনা কিছু। যদি বুঝিস, এমন একটা ব্যবস্থা করে দে, যাতে চারটি খেতে পারি।'

৫

'তারপর—তারপর মা কী বললেন?'

প্রতিপদের চন্দ্রের মত হাসলেন ঠাকুর। 'বললেন, তোর এক মুখ বন্ধ হয়েছে তো কি হয়েছে! তুই তো শতমুখে খাচ্ছিস। তোর নরেন খাচ্ছে বাবুরাম খাচ্ছে রাখাল খাচ্ছে এ কি তোরই খাওয়া নয়?'

বিস্ময়বিগাঢ় চোখে ঠাকুরের দিকে তাকাল একবার নরেন। মাথা আনত করলে। তুইও যা আমিও তাই। সমস্ত বিশ্বসত্তা আমাতেই প্রাণায়িত। সর্বভূতে আমারই জীবনস্পন্দ। দুই বলে কিছু নেই, সবই সেই এক, সেই একের বিচিত্র প্রতিচ্ছায়া। রৌদ্রে যে দেহের ছায়া পড়ে, জলে শরীরের যে প্রতিবিম্ব কিংবা স্বপ্নে যে দেহ চলাফেরা করে এই সব বিভিন্ন দেহকে কি তুমি সত্যি বলে মনে করো? না। এই সব কায়া ছায়ামাত্র।

তেমনি সমস্ত কিছু সেই একের প্রতিবিম্ব। স্থলে জলে সূক্ষ্মে স্থূলে স্বপ্নে বাস্তবে।

একটা ছোট ছেলে ফড়িঙের ল্যাজে একটা কাঠি গুঁজে দিয়ে খেলা করছে। ফড়িঙের সেই ব্যথা নিজের মধ্যে অনুভব করলেন। পর মুহূর্তে আবার সেই বালকের আনন্দ। ফড়িংও রাম তার ব্যথাদাতা বালকও রাম। হেসে উঠলেন ঠাকুর: 'হে রাম, নিজেই নিজের দুর্দশা ঘটিয়েছ, নিজেই নিজের দুর্দশা মোচন কর।'

গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে গঙ্গা দেখছেন ঠাকুর। ঘাটের দুটো মাঝি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। হঠাৎ এক মাঝি আরেক মাঝির পিঠে প্রচণ্ড এক চড় মেরে বসল। ঠাকুর কাতরস্বরে আর্তনাদ করে উঠলেন। কালীমন্দিরে কি কাজ করছিল হৃদয়, তার কানে গেল সেই আর্তনাদ। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল সে গঙ্গার ঘাটে। ঠাকুরের কী বিপদ হল না জানি! কী না জানি আঘাত পেলেন অকস্মাৎ!

'কী হয়েছে?'

ঠাকুর তাঁর পিঠের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

হৃদয় দেখল ঠাকুরের সমস্ত পিঠ ফুলে লাল হয়ে রয়েছে। 'এ কি, কে তোমাকে মারল?' রাগে উত্তেজিত হয়ে জিগগেস করল হৃদয়।

ঠাকুরের মুখে কথা নেই। সমস্ত মুখে যন্ত্রণার বিবর্ণতা।

'বলো না, কে মারল তোমাকে। আমাকে দেখিয়ে দাও কোন জন। তারপর আমি একবার দেখে নি।'

'আমাকে আবার কে মারবে!' মাঝিদের দেখিয়ে বললেন, 'এ ওকে মারল আর তারই ছাপ পড়ল আমার পিঠে।'

হৃদয় তো স্তম্ভিত।

নতুন বর্ষায় মাঠের ঘাস নিবিড় সবুজে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিভোর হয়ে তাই দেখছেন ঠাকুর। মনে হচ্ছে ঐ তৃণাঞ্চিত শ্যামলশোভন মাঠটুকু যেন তাঁরই অঙ্গ। কে একজন ঐ মাঠের উপর দিয়ে অতর্কিতে হেঁটে যাচ্ছে আর অমনি ঠাকুর ব্যথায় কেঁদে উঠলেন, যেন কে তাঁর বুকের উপর দিয়ে চলে গেল।

মাটির সঙ্গে কীটপতঙ্গের সঙ্গে জনসাধারণের সঙ্গে অনুভব করলেন

একাত্মতা। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—বেদান্তের এই বাণীর প্রজ্বলন্ত বিগ্রহ হয়ে উঠলেন। তাই তোর যে খাওয়া তাই আমারও খাওয়া। তোর যে তৃপ্তি তা আমারও তৃপ্তি। তোর যে শ্রী তা আমারও শ্রী। তাই পরশ্রীতে আমি কাতর নই, পরশ্রীতে আমি আনন্দিত। পরশ্রী মানেই তো পরমের শ্রী।

সুখে-দুঃখে আঘাতে-আরামে জয়ে-পরাজয়ে মিত্রতায়-শত্রুতায় বীর হও, অকুতোভয় হও। আর এই বীরত্ব ও ভয়শূন্যতার উৎসই হচ্ছে ঈশ্বরবিশ্বাস। কে সেই ঈশ্বর? আমিই সেই ঈশ্বর। কোঽহং? সোঽহং। অতএব আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হও।

বৃত্রাসুর স্বর্গ আক্রমণ করল। দেবতারা যে দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করে তাই বৃত্র গ্রাস করে ফেলে। তখন ভয় পেয়ে দেবতারা বিষ্ণুর স্তব সুরু করল। বিষ্ণু ইন্দ্রকে বললেন দধীচির কাছে যাও, তার বিদ্যাব্রততপঃসার গাত্রাস্থি চেয়ে নাও। সেই অস্থি দিয়ে অস্ত্র তৈরি করতে বলো বিশ্বকর্মাকে। সেই অস্ত্রেই বৃত্রের শিরশ্ছেদ হবে।

মহর্ষি দধীচির কাছে দেবতারা তাদের প্রার্থনা জানাল।

দধীচি বললে, 'মৃত্যুর যাতনা দুঃসহ, দেহও দেহীর সবচেয়ে প্রিয়বস্তু, আমি কেন তা তোমাদের দান করব?'

দেবতারা ঘাবড়ে গেল। মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, 'আপনার মত দয়ালু মহাপুরুষের পরহিতের জন্যে অদেয় কি আছে?'

'ঠিক বলেছ। তোমাদের কাছ থেকে এই ধর্মকথাটুকু শোনবার জন্যেই ঐ কথা বলেছিলাম।' বললে দধীচি, 'দেহ যতই প্রিয় হোক একদিন তা ত্যাগ করতেই হবে। কি দৈন্যের কথা, কি কষ্টের কথা, যদি এই ক্ষণভঙ্গুর পদার্থ দিয়ে কারু না কিছু উপকার হয়।'

আত্মাকে পরব্রহ্মে স্থাপন করে দধীচি দেহত্যাগ করল। সেই দেহের অস্থি দিয়ে তৈরি হল বজ্র। সুরু হল দেবাসুরের সংগ্রাম।

অসুরদের পালাতে দেখে বৃত্র বললে, 'মৃত্যু অলঙ্ঘনীয়, তাতে কাতর হবার কি আছে? দুরকম মৃত্যু দুষ্প্রাপ্য অথচ বাঞ্ছনীয়। এক হচ্ছে যোগরত হয়ে আরেক হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনানীদের অগ্রণী হয়ে। সেই সম্ভাবনা তোমাদের সামনে। এমন মৃত্যু কে ছাড়ে?'

ইন্দ্র আর বৃত্র পরস্পর সম্মুখীন হল। বৃত্র বললে, 'তুমি আমার ভাই বিশ্বরূপকে হত্যা করেছ, এই শূলে তোমার হৃদয় ছিন্ন করে আমি আজ অঋণী হব। আর যদি তুমি দধীচির অস্থিনির্মিত কুলিশ দিয়ে আমার মস্তক ছিন্ন করো তবে এই দেহ পঞ্চভূতে উপহার দিয়ে মনস্বীদের পদধূলি হয়ে যাবো। তোমার ভাবনা কি, তুমি তো বিষ্ণুদ্বারা নিয়োজিত। আমারও ভয় কি। তোমার বজ্রবলে আমার বিষয়পাশ ছিন্ন হয়ে যাবে। নাও, হানো তোমার বজ্র, যে বজ্রে শ্রীহরির তেজ আর যা দধীচির তপস্যা দ্বারা তেজস্বান। আর যেখানেই হরি সেখানেই বিজয়শ্রী। এস, আপন শত্রুকে নিধন করো।'

তুমুল যুদ্ধ সুরু হল। বৃত্রের শূলের আঘাতে ইন্দ্রের হাত থেকে খসে পড়ল বজ্র।

স্খলিত বজ্র মাটি থেকে তুলে নেবে কিনা অপ্রতিভ হয়ে ইন্দ্র ইতস্ততঃ করতে লাগল। লজ্জিতমুখে তাকিয়ে রইল বজ্রের দিকে।

নিরস্ত হল বৃত্র। বললে, 'তুলে নাও বজ্র, দধীচির মান রাখো, শ্রীহরির ইচ্ছা পূর্ণ হতে দাও, শত্রুকে বধ করো আহবে। এখন লজ্জা বা বিষাদের সময় নয়।'

বজ্র তুলে নিল ইন্দ্র। বললে, 'হে বীর, তুমি সিদ্ধ। সর্বাত্মা ও সর্বসুহৃদ ঈশ্বরে তুমি অনুরক্ত। শ্রীহরিতে যার ভক্তি সে অমৃতসমুদ্রে বিহার করে, স্বর্গসুখ-ভোগের ক্ষুদ্র গর্তের সে মণ্ডুক নয়।'

বজ্রপ্রহারে এবার নির্বিচল প্রসন্নতায় মৃত্যুবরণ করল বৃত্রাসুর।

'বিচার আর কি করব!' বললেন ঠাকুর, 'দেখছি তিনিই সব। এই দেখনা, নরেনকে দেখে আমার মন অখণ্ডে লীন হয়।' তাকালেন গিরিশের দিকে : 'এর তুমি কি করলে বল দেখি!'

গিরিশ হেসে বললে, 'এর আমি কি করব!'

এ কথা বলার মানে আছে। গিরিশের এত বিশ্বাস আর নরেনের এত অস্বীকৃতি! দেখ তার একটা বিহিত করতে পারো কিনা, পারো কিনা তোমার দলে টানতে। কিন্তু মানুক আর না মানুক কি এসে যায়! ঠাকুরের ভালোবাসা যেন আরো বেশি উথলে পড়েছে। নরেনের গায়ে হাত রেখে বললেন, 'মান করলি তো করলি, আমরাও তোর মানে আছি রাই।' শুধু তাই নয়, মুখে হাত বুলিয়ে আদর করলেন আর বলতে লাগলেন, 'হরি ওঁ, হরি ওঁ।'

তুই আমার মধ্যে কিছু দেখিস আর না দেখিস আমি তোর মধ্যে দেখছি নারায়ণকে। সেই পীতবাস জনার্দনকে। যিনি কর্তা, বিবিধরূপের বিধাতা, সেই অব্যয় অক্ষয় অনাদিনিধনকে। বেদের অবিদিত সেই পরমপুরুষকে।

অর্ধবাহ্যদশা ঠাকুরের। কখনো নরেনের পায়ের উপর হাত রাখছেন যেন ছল করে পা টিপে দিচ্ছেন নারায়ণের। আবার কখনো হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন সারা গায়ে। এ কি নারায়ণের সেবা হচ্ছে, না শক্তিসঞ্চার করছেন নরেনের মধ্যে?

আরেকদিন ভাবাবেশে উন্মত্তপ্রায় হয়ে জানু দিয়ে নরেনের জানু চেপে বসলেন। নিজের হাতে তামাক খেয়ে সেই হাতে জোর করে তামাক খাওয়ালেন নরেনকে।

'কি করেন, কি করেন,—' বাধা দিতে গেল নরেন।

ঠাকুর ধমক দিয়ে উঠলেন : 'তুই আর আমি কি আলাদা? তোর শরীর আর আমার শরীর কি অভিন্ন? দুইই আমার শরীর।'

সেই যে প্রথম যেদিন দেখেছিলেন নরেনকে, চিনে নিয়েছেন সেই স্বপ্নে দেখা ঋষি, আর সেই ঋষির জ্যোতিপুঞ্জ থেকে তৈরি হল একটি শিশু, ঠাকুর নিজে। তার আগে কত তিনি ডাক ছেড়ে কেঁদেছেন আরতির ঘণ্টা বাজলে, কুঠিঘরের ছাদে উঠে, ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়—তোদের না দেখে আর থাকতে পারছিনে। বিষয়কথা বলে-বলে জিভ পুড়ে গেল। তারপর এসেছে সব একে-একে। এবং

কে-কে আপনার লোক ঠিক চিনে নিয়েছেন এক নিমেষে।

'দ্যাখ', আর সবাইকে বলছেন ঠাকুর, 'চারটে দর্শনের পণ্ডিত, পাঁচটা দর্শনের পণ্ডিত, সব দু'চার কথায় চুপ। কিন্তু এই নরেন ছোঁড়াটা আজ দু'বছর ধরে আমার সঙ্গে খটাখটি করছে। কেন জানিস? এখানকার কাজ করবে বলেই চলছে তার এই গড়া-পেটা। যদি দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় একটা নতুন মত চালিয়ে যাবে। কেবল এখানকার জন্যেই মহামায়া ওকে দাবিয়ে রেখেছেন।'

ও-ও যা আমিও তাই।

অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যেথা খুশি সেথা যা, যা ইচ্ছে তাই কর। এক ছানা-চিনির ঠাশা থেকেই নানারকম সন্দেশ। এক পলতার কলের জলই কারু বাড়িতে সিংহের মুখ দিয়ে কারু বাড়িতে মানুষের মুখ দিয়ে পড়ছে। তেমনি একই বিভু নানারূপে বিভাত হচ্ছেন। একই কবি নানা ছন্দে নানা শ্লোকে প্রকাশ করছেন নিজেকে।

বিবেকানন্দ অক্সফোর্ড থেকে ফিরে যাচ্ছে লণ্ডন। অক্সফোর্ডে গিয়েছিল ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু স্টেশনে এসে দেখে, তাকে বিদায় দিতে স্বয়ং ম্যাক্সমুলারই উপস্থিত।

'এ কি, আপনি এত কষ্ট করে এই দুর্যোগের রাতে এসেছেন কেন?'

'রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভক্তকে আর একবার দেখতে।' ম্যাক্সমুলার বিবেকানন্দের হাত ধরলেন : 'রামকৃষ্ণকে তো দেখিনি তাঁর ভক্তকে দেখি।'

১৮

ঠাকুরের অসুখ কমতির দিকে যাচ্ছেনা কিছুতেই। কি হবে? কোথা থেকে কুড়িয়ে আনব উপশম? কুড়িয়ে না পাই ছিনিয়ে আনব। শুধু একবার স্থান বলে দাও। কোথায় সেই গন্ধমাদন?

নরেন পাগলের মত হয়ে গেল। চলে যাবেন ঠাকুর? তাঁকে রাখা যাবে না?

কিন্তু উপায় কি। এ ও সে ডাক্তার, আর কজন শিষ্যসেবক। শিষ্যসেবকদের আবার ঘর-বাড়ি আছে। পালা করে চালাচ্ছে সেবাশুশ্রূষা। নরেনের আছে আবার আইনপরীক্ষা। সংসারের ঝামেলা। কি করি? কোথায় মাথা ঠুকি?

কজন গুরুভাইকে নির্জনে ডেকে নিল নরেন। বললে, 'মনে হচ্ছে ঠাকুর আর থাকবেন না দেহে। তিনি থাকতে-থাকতেই ঘটাতে হবে চরম আত্মোন্নতি। দিনের আলোটুকু থাকতে-থাকতেই পেরোতে হবে পথ। সময় বয়ে যাচ্ছে, শেষে অনুতাপের অবধি থাকবেনা।'

বন্ধুরা তাকাল নরেনের দিকে।

'ভাবছি হাতের এটা-ওটা কাজ সেরে নিয়ে বেশি করে লাগব ঈশ্বরের কাজে, ঈশ্বরের সাধনে-সন্ধানে। এ আর কিছুই নয় বাসনার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ছি

আষ্টেপৃষ্ঠে। বাসনাই মৃত্যু। বাসনাকে উচ্ছেদ করতে হবে। উত্তীর্ণ হতে হবে মৃত্যুকে। এখুনি, এই মুহূর্তে। সময়কে পালিয়ে যেতে দেবনা, তার ঝুঁটি চেপে ধরব।'

কি করতে হবে বলো।

আয় ধুনি জ্বালাই। ভস্ম মেখে সন্ন্যাসী সাজি। অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ করি বাসনাজাল।

ধুনির কাঠ কোথায়? শুকনো খড়কুটো যোগাড় করো। ভস্ম কোথায়? তামাক-পোড়া টিকের ছাই আছে, তাই নিয়ে এস মুঠোমুঠো।

পৌষমাস, প্রচণ্ড শীত। তারই মধ্যে মুক্ত আকাশের নিচে নগ্নপ্রায় দেহে বসল নরেন আর তার বন্ধুরা। সামনে জ্বলতে লাগল হোমাগ্নি।

রোজ ঘরের মধ্যে ধ্যান করি। আজ অচঞ্চল আকাশের নিচে, সত্য সরল আগুনকে সাক্ষী করে।

সবাই ধ্যাননিবিষ্ট হল।

এসব কি পুড়ছে? শুষ্ক তৃণপত্র?

না, আমাদের সংস্কারজাত বাসনা দগ্ধ করছি।

কিন্তু হায়, উকিল হবার বাসনা বুঝি তবু যায়না। কি করে যাবে? মা-ভায়েদের পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা না করতে পারলেই বা ছুটি মেলে কি করে?

ঠাকুরই তো বলেছিলেন একদিন দক্ষিণেশ্বরে, 'আগে তোর মা-ভায়েদের একমুঠো অন্নের যোগাড় করে আয়, তোকে পরমহংস করে দেব।'

'শুনেছেন? নরেন নাকি ওকালতি পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছে।' গিরিশ ঘোষের ভাই অতুল একদিন ঠাকুরের কাছে এসে নালিশ করল : 'এত করে শেষ পর্যন্ত সেই আইনব্যবসা!'

মৃদুমধুর হাসলেন ঠাকুর। কথা কইলেন না।

এর কদিন পরেই গিরিশের বাড়িতে নরেন এসে হাজির। খালি পা, খালি গা। কি ব্যাপার? গিরিশ চমকে উঠল।

'অশৌচ হয়েছে।' বললে নরেন।

আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল গিরিশ। প্রশ্ন কণ্ঠের কাছে এসে আটকে রইল।

'মৃত্যু-অশৌচ ও জন্ম-অশৌচ, দুই অশৌচ হয়েছে।'

গিরিশ তো বিমূঢ়।

'অবিদ্যা-মায়ের মৃত্যু আর 'বিবেক-পুত্রের জন্ম। আর ফিরছিনা সংসারে।' বলতে লাগল নরেন : 'কাশীপুর থেকে আজ সকালে সবে বাড়ি ফিরেছি। পড়ায় মন নেই, কি করে তবে পাশ করব বাড়ির সবাই তিরস্কার করতে লাগল। বই নিয়ে চলে গেলাম দিদিমার বাড়ি। কিন্তু পড়ব কি, বই খুলে বসতেই প্রচণ্ড এক ভয় আমাকে পেয়ে বসল। মনে হল পড়ার মত আতঙ্ককর বুঝি কিছু নেই। শুরু হল ঘোরতর দ্বন্দ্ব। কাঁদতে লাগলাম। এমন কান্না জীবনে আর কখনো কাঁদিনি। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম বইখাতা। ছুটতে-ছুটতে আসছি তোমার এখানে। আবার ছুটতে-

ছুটতে চলে যাব—'

'কোথায় যাবে?'

'কাশীপুর। ঠাকুরের পাদপদ্মে শরণ নেব। আর ফিরব না।'

বলেই দৃকপাত না করে ছুটল কাশীপুরের দিকে।

অতুল তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল। দেখল যিনি ডাঙায় নৌকা চালান তাঁর খেলা বোঝা ভার।

'আহা দেখ এখন একবার আমার নরেনের দিকে।' কথা কইতে কষ্ট তবু বলছেন ঠাকুর : 'কি উচ্চাবস্থায় এসে পৌঁচেছে। আগে ভগবানে বিশ্বাস করত না, এখন ভগবানকে পাবার জন্যে পাগল।'

এই না হলে হয়! চাই সর্বসংশয়চ্ছেদী ব্যাকুলতা।

গভীর রাতে ঠাকুর নরেনকে ডেকে নিলেন কাছে। বললেন, 'তোকে মন্ত্র দেব।'

মর্মমূল পর্যন্ত উৎকর্ণ হয়ে রইল নরেন। দাবদগ্ধ ধরিত্রীর প্রতিটি ধূলিকণার মত নরেনের সমস্ত রোমকূপ সেই অমিয়সিঞ্চনের আশায় কাঁপতে লাগল।

'ছোট্ট একটি শব্দ। আমার গুরুর কাছ থেকে পাওয়া। সেইটি তোর কানে দিয়ে দিচ্ছি।'

ঠাকুরের মুখের কাছে নুয়ে পড়ল নরেন। অস্ফুট গদগদকণ্ঠে ঠাকুর উচ্চারণ করলেন, 'রাম।'

সেই অনন্তগুণগম্ভীর ধীরোদাত্তগুণোত্তর রাম। শ্যামাঙ্গসুন্দর ভানুকোটি-প্রতীকাশ। মন্ত্রস্পর্শে ফণায়িত হয়ে উঠল নরেন।

আর চাই কি। পরদিন উচ্চকণ্ঠে রামনাম করতে-করতে কাশীপুরের বাগানবাড়ি পরিক্রমণ করতে লাগল। একবার নয় দুবার নয় বারংবার। যেন শরীরী মানুষ নয় একটা জ্বলন্ত বহ্নিশিখা। যেন বাহ্যিক কোনো চেতনা নেই, যেন একটা ধ্বনির ঝড় বয়ে চলেছে। ধ্বনি আর শিখা, শিখা আর ধ্বনি। যেন বজ্রবিদ্যুৎবাহিনী ঝঞ্ঝা।

ঠাকুরের কানে উঠল। নরেনকে ঠেকান। সে পাগল হয়ে গিয়েছে।

'নিজে নিজেই শান্ত হবে।'

নিজে নিজেই শান্ত হল নরেন।

কিন্তু আমি এই ফেনমত্ততা চাইনা, আমি চাই নির্বিকল্প সমাধি। প্রজ্বলন নয়, আমি চাই নিমজ্জন।

'সব হবে। সমাধি তো তুচ্ছ। তার চেয়েও বড় জিনিস তোকে দেব।'

উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে রইল নরেন।

'একজন সিদ্ধপুরুষ বা পরমহংস হবি তাতেই তোর কাজ ফুরিয়ে গেল? নিজে মায়ার সমুদ্র পেরোবি আর সকলকে পার করে দিবিনে? নিজে আত্মোদ্ধার করবি আর সকলে বয়ে যাবে? তাদের আত্মার উদ্ধার ঘটাবিনে? নিজে ভগবানকে পাবি আর সকলকে দিবিনে সেই সুধাস্বাদ?'

ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি। তিনি ভাবাতীত গুণাতীত হয়েও আবার ভাবময় গুণময়-রূপে প্রকাশিত হন। শুধু অনুভবানন্দস্বরূপ হয়েও আবার শরীর ধারণ করেন।

নামে ও রূপে অভিব্যক্ত হন। তুই যখন জীবকে সেবা করবি তখন তাকে শিব ভেবেই সেবা করবি। কিন্তু যে সেবা নিচ্ছে সেও যে শিব এও তো তাকে ভাবাতে হবে। এ ভাবনা তার মধ্যে না ঢোকালে সেও বা অন্যকে শিবজ্ঞানে সেবা করবে কেন?

তুই হবি নতুন সাম্যের উদ্গাতা। জীবসাম্য নয় শিবসাম্য। জীবনের মান নামিয়ে এনে সমতা নয়, জীবনের মান উন্নত করে সমতা।

এবার তবে ভিক্ষায় বেরো। গৃহস্থের দ্বারে-দ্বারে গিয়ে ভিক্ষে কর। যদি অহঙ্কারের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে ধূলায় বিসর্জন দে।

মুখে রাম নাম, কৃষ্ণ নাম, রামকৃষ্ণ নাম—ভিক্ষায় বেরুল ছেলেরা। নরেন ও তার সহচরের দল। তৃণের চেয়েও তুচ্ছ তৃণের চেয়েও অমানী এই দৈন্যকে দেহের ভূষণ করলে। ভিখিরির আবার মর্যাদা কি! যদি দাও একমুঠো চাল নেব হাত পেতে। যদি ফিরিয়ে দাও ফিরে যাব হাসিমুখে। যদি কঠিন কথা বলো এতটুকু বিঁধবে না। যদি অপমানও করো হারাবনা প্রসন্নতা। তোমার শতসহস্র তিরস্কারের পরেও বলব, বন্ধু, আমার প্রিয়সম্ভাষণ গ্রহণ করো।

'গুণ্ডার মত তো চেহারা, খেটে খেতে পারোনা? লজ্জা করে না ভিক্ষা করতে?' বলে কেউ রূঢ়কণ্ঠে।

'ট্রাম কণ্ডাকটারিও জোটেনি বুঝি!' আরেক দ্বার টিপ্পনি কাটে।

'ওরে গেট বন্ধ করে দে।' আরেক দরজা গর্জন করে। 'চুরি করবার অছিলায় ভিক্ষুক সেজে এসেছে।'

এরই মধ্যে দু'চার জন গৃহস্থ দেয় কিছু চাল-ডাল। দু-একটা পয়সা বা কেউ-কেউ। যা দেবে তাই ঈশ্বরের অহেতুক কৃপা ভেবে মাথায় ধরব।

ভিক্ষায় পাওয়া চাল দিয়ে ভাত রান্না হল। থালায় করে সে ভাত নিবেদন করল ঠাকুরকে। ঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না। বললেন, বড় পবিত্র এ অন্ন। বলে অগ্রভাগ গ্রহণ করলেন।

নরেনকে আরেক দিন ডেকে নিলেন কাছে। বললেন, তোর হাতে যুবকভক্তদের দিয়ে যাব। আমি যখন থাকব না তখন তুই ওদের দেখবি।

তুমি থাকবেনা কি! তুমি সকল জগতের চক্ষু, সকল দেহীর আত্মা, তুমি সকল জীবের জনক। তুমি বিভাবসু সূর্য, সকল জ্যোতির অধীশ্বর। তুমিই ধারণ করছ, প্রকাশ করছ, পবিত্র করছ, প্রতিপালন করছ। তুমিই ভুবনত্রয়ের একমাত্র শুভদাতা।

শিবরাত্রি উপলক্ষে সমস্ত দিন উপোস করেছে নরেন। নরেন একা নয়, তার সহগামী বন্ধুরাও।

সমস্ত রাত ধ্যানে আর প্রার্থনায় অতিবাহিত করবে বলে সংকল্প করেছে। বসেছে বন্ধ ঘরে। রাত্রির প্রথম যাম কেটে গেল। কেন কে জানে একে-একে সবাই চলে গেল ঘর ছেড়ে—বাকি রইল শুধু নরেন আর কালীপ্রসাদ।

চারদিক নিস্তব্ধ। খানিক আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়ে কেমন এক শীতল শান্তি নেমেছে অন্ধকারে।

কালীকে নরেন বললে চুপিচুপি, 'শোন, খানিক পরে আমাকে একবার তুই স্পর্শ

করবি।'

'কতক্ষণ পর?'

'কথা কোসনে। যখন তোর খুশি।' বলে ধ্যানস্থ হল নরেন।

এই সময় কে আরেকজন ভক্ত ঢুকল দরজা ঠেলে। আর তখুনি কালী স্পর্শ করল নরেনকে।

স্পর্শ করা মাত্র এ কী হয়ে গেল কালীর হাত! বেঁকে গেল। কাঁপতে লাগল। কতক্ষণ লাগল হাতটাকে চেষ্টা করে সোজা করতে।

খানিক পর নরেন জিগগেস করল কালীকে, 'কেমন মনে হল বল দিকি?'

'যেন প্রচণ্ড একটা ইলেকট্রিক শক পেলাম।' কালী অভিভূতের মতন বললে।

মধ্যরাত্রের পুজার পর আবার বসল সকলে ধ্যানে। এবারে কালীর ধ্যান সব চেয়ে গাঢ় হল। সবাই বললে, নরেনের স্পর্শের ফল।

পুজার শেষে নরেন গেল ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। ঠাকুর অসন্তুষ্টের মত বললেন, 'এ সব তুই কী করছিস? শক্তি সঞ্চয় করবার আগেই বিলিয়ে দিচ্ছিস সবাইকে?'

'তুমি কি করে জানলে?'

'আমি সব জানি। তুই কি ঐটুকু? শুধু সিদ্ধাই দেখাবার জন্যে তুই আসর জমাবি? তোর কত বড় কাজ। শুধু একজনকে কি, গোটা পৃথিবীর মানুষকে তুই শক্তিমান করবি। তুই তো শুধু জ্ঞানী হবি না তুই ভক্ত হবি। তুই শুধু নিজে ব্রহ্ম হবি না, সকলকে নিয়ে যাবি সেই ব্রহ্মভূমিতে।'

১৯

'বৈরাগ্য কি!' ঈশ্বরকে তীব্র ভালোবাসার নামই বৈরাগ্য। আর কিছুতে ভালো না লেগে শুধু ঈশ্বরকে ভালোলাগার নামই বৈরাগ্য। বৈরাগ্য হচ্ছে ঈশ্বরের জন্যে সর্বস্বত্যাগ।

বুদ্ধদেবের বৈরাগ্য প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে নরেনকে। কি নিবে গেলে সকল জ্বালা নিবে যায়? ভোগ্যবস্তু দিয়ে কি ভোগস্পৃহার নির্বাণ হয়? না। একমাত্র নির্বাণ তৃষ্ণার উৎখাতে। তৃষ্ণাকে তাই উচ্ছিন্ন করো।

নবীন বয়স, সুন্দরী স্ত্রী, সদ্যোজাত পুত্র, সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য, বিপুল বৈভব সমস্ত ত্যাগ করে চলে গেল সিদ্ধার্থ। চলে গেল প্রব্রজ্যার পথে, ধ্যান-সমাধির পথে। একটি মাত্র উত্তর খুঁজতে। কি নিবে গেলে হৃদয়ের সকল জ্বালা নিবে যায়?

সেই সমাধানসন্ধানে নরেনও বেরিয়ে পড়ল। তারক আর কালীপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে। চলে এল বুদ্ধ-গয়ায়।

এইখানেই বোধি লাভ করেছিলেন বুদ্ধদেব।

নিজেই নিজের আশ্রয়। নিজেই নিজের উপায়। নিজের হাতেই নিজের মুক্তির

চাবিকাঠি।

মুক্তি কি? মুক্তি হচ্ছে নিজের উচ্চারণ নিজের উন্মোচন। নিজের অন্তর্নিহিত সম্পদকে উদ্ঘাটন করে দেখানো। আমি নিজে যখন প্রকাশিত তখনই আমি প্রমাণিত। মানুষের মুক্তি এই প্রমাণে এই প্রকাশে। মুক্তোর মুক্তি শুক্তির বিদারণে।

একটি মাত্র জীবন, তাই পরিপূর্ণ করে উৎসর্গ করো। সেই উৎসর্গেই লাভ করো নবজীবন।

যেমন অঙ্গুলিমাল করেছিল। তার কাহিনী ভাবতে বসল নরেন।

দৈবজ্ঞরা গণনা করে বললে এ শিশু যৌবনে দস্যু হবে। সুতরাং একে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি। একে হত্যা করো। বললেন স্বয়ং শিশুর পিতা, ভার্গব, কোশলরাজ প্রসেনজিতের পুরোহিত। এ কি অসম্ভব সংকল্প। স্বয়ং প্রসেনজিত বাধা দিলেন। বললেন, দৈবজ্ঞদের জ্ঞান কতটুকু।

ভার্গবের ছেলের নাম রাখলেন অহিংসক। তক্ষশীলায় ভর্তি করে দিলেন। যেমন বুদ্ধি তেমনি মেধা। দেখতে দেখতে সকল ছাত্রের অগ্রগণ্য হয়ে উঠল। এবং সেই কারণে হল সে সকল ছাত্রের চক্ষুশূল। ছাত্ররা ষড়যন্ত্র করল। ষড়যন্ত্র করে অহিংসকের নামে রটনা করল কলঙ্ক। অধ্যাপকের কানে তুলল। অধ্যাপক ঠিক করলেন দূর করে দিতে হবে অহিংসককে। বিদ্যাপীঠে আর তার স্থান হবেনা।

অহিংসককে ডেকে পাঠালেন অধ্যাপক। বললেন, 'নবীন বয়সেই তুমি সমস্ত বিদ্যা অধিগত করেছ, শুধু এক বিদ্যা তোমার বাকি।'

'বলুন তা কি। যে মূল্যেই হোক, আমি শিখব সেই শেষ বিদ্যা।' বিদ্যার ব্যাকুলতায় দীপ্তচক্ষু অহিংসক তাকিয়ে রইল অনিমেষ।

'কিন্তু সে বিদ্যার অধিকারী হতে হলে তোমাকে হাজার লোক খুন করতে হবে একে-একে। হাজার পূর্ণ হলেই আমার কাছে আসবে। আমি তোমাকে সেই সর্ব-শেষ সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা উপহার দেব।'

'হাজার লোক?'

'হ্যাঁ, যাদের তুমি মারবে প্রমাণস্বরূপ প্রত্যেকের কড়ে আঙুলটি সংগ্রহ করবে। আমাকে এনে দেখাবে সেই অঙ্গুলিমালা। আমি গুণে দেখব হাজার পুরল কিনা। যাও।' অধ্যাপক তাড়া দিলেন, 'সর্বশেষ বিদ্যায় পারঙ্গম হও।'

বিদ্যাকে অসমাপ্ত রেখে যাবনা। আর গুরুবাক্য অভ্রান্ত ও অবিচল বলে বিশ্বাস করব।

নরহত্যায় লেগে গেল অহিংসক। এক-এক করে হাজার পূরণ করব তবে আমার ছুটি। দেখি মৃত্যুর উপঢৌকনে পাই কিনা অমৃতের সঞ্জীবনী।

চারদিক থেকে আটটি পথ এসে মিলেছে এক অরণ্যে। সেই অরণ্যেই বসবাস করে অহিংসক। যে কেউই আসবে এ পথের পথিক হয়ে তাকে অক্লেশে প্রাণ হারাতে হবে। ডান হাতের কড়ে আঙুলটি কেটে নেবে তারপর। গলায় মালা করে পরবে। আর বারে-বারে আঙুল গুনে-গুনে নিজের মনে জিগগেস করবে, হাজার পুরতে আর বাকি কত?

আঙুলের মালা গলায় পরেছে বলেই তার নাম অঙ্গুলিমাল।

অঙ্গুলিমালের অত্যাচারের কথা রাজার কানে উঠল। কোথায় সেই অরণ্য! অরাতিপাতন সৈন্য নিয়ে সে বন ঘেরাও করো। একটা সামান্য দস্যুকে দমন করতে পারবনা?

এ দস্যু কে, ভার্গবের তা বুঝতে বাকি নেই। নিশ্চিন্ত হলেন রাজা তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন শুনে। শুধু গোপনে স্ত্রীকে বললেন কথাটা। বললেন, 'এই কুলকলঙ্ক পুত্রের মৃত্যুই সমীচীন।' কিন্তু মা তা মানবে কেন? মা ছুটলেন অরণ্যের দিকে, ছেলের সন্ধানে। রাজা সৈন্যসামন্ত নিয়ে আক্রমণ করতে আসছেন, তুই একা কি করে পারবি তার সঙ্গে? তুই পালা। সে সংবাদটুকু দিতে ছুটে এসেছি আমি। আমি তোর চিরদুঃখিনী মা, আমার কথা শোন, রাজার সৈন্য যেন তোকে খুঁজে না পায়!

'তুমি যেওনা! ও মা-বাপ কিছুই মানেনা। উলটে তোমাকেই কোপ মেরে বসবে।'

'বসুক। কিন্তু বলো ওর বিপদের মুহূর্তে চুপ করে থাকি কি করে? আমাকে ওর অরণ্যবসতির পথ বলে দাও। আমাকে ও মারুক তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু ও বাঁচুক।'

এ কি, মাতৃহত্যার পাপেও কলঙ্কিত হবে নাকি? শ্রাবস্তীর কাছে জেতবনে বিহার করছেন তখন বুদ্ধদেব, তাঁর কানে সমস্ত কাহিনী উপনীত হল। দুর্দান্ত দুর্জন, একে বশীভূত না করতে পারলে শান্তি নেই। কিন্তু তাই বলে মাতৃহত্যার পাতকে সে পঙ্কিল হবে?

নৃশংস দস্যুর জন্য করুণাময়ের প্রাণ কেঁদে উঠল। সামান্য এক ভিক্ষুর বেশে একা-একা তিনি চললেন সেই অরণ্যপথে।

'যাবেন না, ও পথে যাবেন না।' গ্রামের রাখাল ছেলেরা মিনতি করে উঠল।

প্রশান্তমুখে বুদ্ধদেব জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

'কিছু আগেই জঙ্গলের মধ্যে অঙ্গুলিমালের বাসা। তার কথা শোনেননি বুঝি? সে যাকে সামনে পায় তাকেই কেটে ফেলে। চল্লিশ পঞ্চাশ জন যাত্রী একত্র দল বেঁধে না গেলে তার হাতে আর নিস্তার নেই। আপনি একা, আপনি নিরস্ত্র—'

অভয়সুন্দর চোখে তাকিয়ে রইলেন বুদ্ধদেব। কোনো নিষেধ কানে না তুলে চললেন এগিয়ে।

অঙ্গুলিমাল বড় অস্থির হয়ে দিন কাটাচ্ছে। বহুদিন কোনো লোকের সে দেখা পাচ্ছেনা। তার ভয়ে পথঘাট সব নির্জন হয়ে গেছে, কেউ আর আসছেনা অরণ্যের ত্রিসীমায়। কি হবে! নশো নিরানব্বুইটি আঙুল সে সংগ্রহ করেছে, আরেকটি আঙুল এখনো বাকি। হাজার না পুরলে যে তার ব্রতোদযাপন হবেনা। আয়ত্ত হবেনা সে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, পরা বিদ্যা।

যে করে হোক শেষ আঙুল, সহস্রতম আঙুলটি আজ চয়ন করতেই হবে। সম্পূর্ণ করতে হবে প্রমাণমাল্য। চুপ করে প্রতীক্ষা করে থাকলে মিলবেনা সেই

শেষ বলি। নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তৎপর হয়ে খুঁজতে হবে এদিক-ওদিক।

অরণ্যগহন থেকে বেরিয়ে এল অঙ্গুলিমাল। যতদূর চোখ যায়, জনমানবহীন। অরণ্যসঙ্গমের আট-আটটি পথই খাঁ-খাঁ করছে। একটা ধূলিকণা পর্যন্ত উড়ছে না।

কি হবে? প্রতিজ্ঞাপূরণ হবেনা তা হলে? পূর্ণ হবেনা গুরুপূজার উপাচার?

ক্ষুধার্ত বাঘের মত অঙ্গুলিমাল তাকিয়ে রইল লোলুপ চোখে। ও কে! ও কে আসছে? ভগবান তা হলে মুখ তুলে চেয়েছেন?

সামান্য একজন ভিক্ষু। উদাসমনে চলেছেন অন্যমনে। অন্যমনে চলেছেন বলেই বুঝি এসে পড়েছেন বনপথে। এখানেই যে তাঁর প্রাণশেষ তা, হায়, তাঁর জানা নেই।

আনন্দে অধীর হয়ে অঙ্গুলিমাল তাঁর দিকে ধাবমান হল।

কিন্তু এ কি, কিছুতেই যে পৌঁছুতে পারছেনা ভিক্ষুর কাছে। ছুটছে, ছুটছে, আবার তাকিয়ে দেখছে, যেমন ব্যবধান তেমনি ব্যবধান। ভিক্ষু তো কই পালাচ্ছেনা প্রাণভয়ে, ধীর পায়ে হাঁটছে, তবু এত তীব্রবেগে ছুটেও কেন সে তাঁর নাগাল পাচ্ছে না? এত দিন অরণ্যে বাস করে কত হরিণকে সে হারিয়ে দিয়েছে গতিতে, আজ এক মন্থরপদচারী ভিক্ষুর সঙ্গে সে পেরে উঠছে না? তীরের মত উল্কার মত ছুটল আবার অঙ্গুলিমাল, কিন্তু আশ্চর্য, যেই দূরত্ব সেই দূরত্ব।

তখন আর্তনাদ করে উঠল দস্যু, 'একটু দাঁড়াও। আমি বড় বিপন্ন। আমাকে তোমার কাছে যেতে দাও।'

সর্বাবস্থায়ই মানুষের এই বিপন্নবুদ্ধি। আমি অশরণ, আমি অসহায়, আমি গৃহহারা। অরণ্যে বাস করছি আমি, সার বিদ্যা আহরণের পুণ্যব্রত এখনো সম্পন্ন করতে পারলুমনা। আমি নিঃসঙ্গ, সর্বপরিত্যক্ত। আমার কেউ নেই। তুমি একটু দাঁড়াও। তুমিও আমাকে ত্যাগ করে যেওনা। কলঙ্ককর্দমে আমার দুই হাত লিপ্ত হয়ে আছে, কিন্তু জানি, এ দুই হাতে আর কিছু ধরা না যাক, যা ধরা যায় তা তোমারই পদকুসুম। দয়া করো, একটু দাঁড়াও। আমাকে তোমার কাছে যেতে দাও। আমার ব্রতপূর্তির সহায় হও।

তথাগত দাঁড়ালেন।

'আহা, বড় ক্লান্ত হয়েছ তুমি ছুটে-ছুটে।' করুণার্দ্র স্বরে বললেন বুদ্ধদেব, 'যেখানে আছ সেখানেই থাকো। আমিই যাচ্ছি তোমার কাছে।'

মন্ত্রস্তব্ধের মত দাঁড়িয়ে রইল অঙ্গুলিমাল।

ধীর পায়ে প্রভু তার কাছে এগিয়ে এলেন। শান্তোদাত্ত কণ্ঠে শোনাতে লাগলেন অভয়ের কথা, অশোকের কথা। বললেন, 'নশো নিরানব্বুই জন লোককে তুমি হত্যা করেছ। তাদের মৃত্যুকালীন মুখগুলো মনে করো।'

বিভীষিকা দেখতে লাগল অঙ্গুলিমাল। শুনতে লাগল তাদের মর্মচ্ছেদী আর্তনাদ।

'আমাকে ক্ষমা করুন।' অঙ্গুলিমাল যেন কেমনতর হয়ে গেল, লুটিয়ে পড়ল প্রভুর পাদপদ্মে।

'তোমাকে রক্ষা করতেই তো এসেছি।'

'আমারও বাঁচবার উপায় আছে?' কাঁদতে লাগল অঙ্গুলিমাল।

'আছে।' বললেন করুণাময়। 'রক্তনদী ধুয়ে দেবার জন্যে আছে শ্বেতনদী, অশ্রুনদী। তোমাকে আমি প্রব্রজ্যা দিচ্ছি, আমার সঙ্গে চলো জেতবনে।'

অঙ্গুলিমালের মা ফিরছে উন্মাদিনী হয়ে। কোথায় তার ছেলে? কই সেই অরণ্যে তো সে নেই। তন্নতন্ন করে খুঁজেও তার সন্ধান পেল না। এদিকে রাজার সৈন্য বেরিয়েছে তাকে বিধ্বস্ত করতে। যদি পূর্বমুহূর্তে সতর্ক করে না আসি তবে যে সে বাঁচে না।

কাঁদতে-কাঁদতে ঘরে ফিরে গেল মা। কোথায় আমার অহিংসক? তার বুঝি আর নিস্তার নেই।

কোথাও যাবার আগে কোনো কিছু করবার আগে প্রসেনজিতের একবার আসা চাই গৌতমের কাছে। গৌতমের চরণবন্দনা না করে কোনো কর্মে তার উৎসাহ নেই, উদ্দীপনা নেই।

'ব্যাপার কি?' রাজাকে জিগগেস করলেন বুদ্ধদেব, 'এত সব সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কোথায় চলেছেন? কোন শত্রুজয়ে?'

'অঙ্গুলিমালকে দমন করতে। জানেন সেই নরঘাতকের কাহিনী?'

'জানি। নশো নিরানব্বুই জনকে হত্যা করে সে একজনের জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। আপনাকে পেলে তার হাজার সংখ্যা পূর্ণ হত।' প্রশান্ত উদার মুখে হাসলেন গৌতম : 'তবু আপনি রাজার কর্তব্যপালনে চলেছেন, কি করে আপনাকে বাধা দিই? কিন্তু যদি ধরুন সে এখানে আপনার কাছে এসে হাজির হয়?'

'এখানে?' এই জেতবনে? ভিক্ষুসঙ্ঘে?' প্রসেনজিৎ যেন পড়লেন আকাশ থেকে।

'হ্যাঁ, যদি দেখেন সে জীবহিংসা ছেড়ে দিয়ে ভিক্ষু হয়ে গিয়েছে, তা হলে কি করেন? তার নশো নিরানব্বুই হত্যার দণ্ড দেন?'

'সে যদি ভিক্ষু হয়ে যায় তা হলে তো তার সমস্ত অপরাধের মার্জনা হয়ে গেল।'

'তবে এই দেখ অঙ্গুলিমালকে।'

অঙ্গুলিমাল রাজার সামনে দাঁড়াল অভিবাদন করে। সৌম্য শান্ত ভিক্ষুর বেশে। মেঘমালিন্যমুক্ত সূর্যের দীপ্তিতে।

বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল প্রসেনজিৎ। এও সম্ভব! এত বড় পাষণ্ডকে প্রভু ক্ষমা করেছেন। আর সেই স্পর্শমণির ছোঁয়ায় এই ক্লিন্নমলিন লোহাও সোনা হয়!

আনন্দের উপহারস্বরূপ মণিময় কটিবন্ধ অঙ্গুলিমালকে দিতে গেল রাজা। অঙ্গুলিমাল বললে, 'আমার আভরণ দিয়ে কি হবে? অহিংসাই আমার আভরণ।'

ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ভিক্ষু অঙ্গুলিমাল বেরুল রাজপথে। কিন্তু তাকে যে দেখে সেই পালায়। ওরে ঐ অঙ্গুলিমাল আসছে। পালা। আর কিছুতেই না পেরে শেষে ছদ্মবেশ ধরেছে। তার হাজার সংখ্যার একজন এখনো বাকি। সরে পড়্। বাড়ি গিয়ে ঘরে কপাট দে।

পথঘাট জনশূন্য হয়ে গেল। এক মুষ্টিও ভিক্ষা মিলল না অঙ্গুলিমালের। সকাল থেকে দুপুর, দুপুরও এখন বিকেলের দিকে হেলেছে, তবু খাদ্য নেই পানীয় নেই আশ্বাস নেই আশ্রয় নেই। সমস্ত গৃহদ্বার রুদ্ধ, পথচারী যদি কেউ পড়ে দৃষ্টিপথে, পালিয়ে যায় পাশ কাটিয়ে।

অভুক্ত অপীত অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে বিহারের দিকে। দেখল পথিপার্শ্বে একটি নিরাশ্রয় নারী মৃত্যুযন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে।

আশ্চর্য, সেই শুধু অঙ্গুলিমালকে দেখে পালালনা। কি করে পালাবে? স্বয়ং মৃত্যু তার শিয়রে দাঁড়িয়ে। যে মরছে তার আবার মরতে কি ভয়?

কিন্তু আর্তনাদ শুনে দ্রবীভূত হ'ল অঙ্গুলিমাল। কি করে এই পথশায়িনী দুঃখিনীর যন্ত্রণার উপশম করবে? ব্যাকুল হয়ে তার উপায় খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথায় উপায়? সোজা ছুটে এল প্রভুর কাছে। প্রভু, আর্তকে ত্রাণ করুন। লাঘব করুন তার ক্লেশভার।

মুগ্ধ বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন বুদ্ধদেব। মৃত্যুকালে নশো নিরানব্বুয়ের কত করুণ আর্তনাদ শুনেছে অঙ্গুলিমাল, এক তন্তু বিচলিত হয়নি। আজ কোথাকার কে এক নামগোত্রহীনা পথের মেয়ের জন্যে তার এই ব্যাকুলতা। শুধু বিচলিত নয় বিগলিত!

প্রভু বললেন, 'তুমি ফিরে যাও সেই নারীর কাছে। তাকে বলো, আমি আজন্ম স্বেচ্ছায় কোনো প্রাণিহিংসা করিনি। আমার সেই পুণ্যের বিনিময়ে তোমার যন্ত্রণার উপশম হোক।'

'আমি প্রাণিহিংসা করিনি? সে কি কথা?' অঙ্গুলিমাল স্তম্ভিত হয়ে রইল।

'না করোনি। কোথায় করলে?'

'সে কি? একটি দুটি নয়, নশো নিরানব্বুই জন নিরীহের প্রাণ নিয়েছি।'

'সে তুমি কোথায়? সে আরেক লোক। তার নাম ছিল অঙ্গুলিমাল। এখন তোমার সেই অহিংসক নাম ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে নতুন গৌরবে। তুমি ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশ করেছ। তোমার নবজন্ম হয়েছে। বলো এই নবজন্মে স্বেচ্ছায় হিংসা করেছ তুমি?'

করুণাঘন অমৃতবাণীতে স্নিগ্ধ হল দেহমন।

'পূর্বজন্ম ও পূর্বজীবনের কথা ভুলে যাও।' আবার বললেন বুদ্ধদেব। 'মৃত্যুর তোরণ পেরিয়ে চলে এস নবজীবনের মহাদেশে।'

'কিন্তু প্রভু, এক অতৃপ্তি রয়ে গেল।'

'কি?'

'আমার গুরুদক্ষিণা দেওয়া হলনা।'

'কে বললে?'

'নরহত্যায় এক সংখ্যা কম পড়ল। হাজার পুরলনা।'

সিদ্ধার্থ হাসলেন। বললেন, 'না, পুরেছে হাজার। নশো নিরানব্বুই বধের পর একটা জীবন বাকি ছিল। সে তুমি তোমার নিজের জীবন দিয়ে পূরণ করেছ। সেই

তোমার গতজীবন, দস্যুজীবন। সেই জীবন বলি দিয়েই সহস্র সম্পূর্ণ হয়েছে তোমার। গুরুদক্ষিণার শোধ হয়েছে। এবং সেই শোধের পর তোমার যে শেষবিদ্যা শ্রেষ্ঠবিদ্যা অর্জন করবার কথা ছিল তাই এবার এসেছে তোমার করতলে। অহিংসাই সারবিদ্যা।'

দুই চোখ উদ্দীপ্ত হল অহিংসকের।

'যাও', প্রভু আবার বললেন, 'সেই মুমূর্ষু নারীর যন্ত্রণা শান্ত করে এস।'

ত্বরিত পায়ে সেই নারীর ধূলিশয্যার পাশে এসে দাঁড়াল অহিংসক। দৃঢ় ও গাঢ় স্বরে বললে, 'আমি জন্মাবধি স্বেচ্ছায় কোনো প্রাণিহিংসা করিনি। আমার সেই পুণ্যের বিনিময়ে তোমার যন্ত্রণার উপশম হোক।'

নারীর যন্ত্রণার উপশম হয়ে গেল। পরম তৃপ্তিতে তাকাল সে অহিংসকের দিকে।

মোট কথা হচ্ছে কি? নিজের জীবন উৎসর্গ করো। নিজের জীবন উৎসর্গ করে ব্রতপূর্তি করো। অর্জন করো সারবিদ্যা। নিখিলমৈত্রী। নিজের জীবন উৎসর্গ না করলে হবেনা নবজন্ম। আর নবজন্ম না হলে জন্মগ্রহণ করে সুখ কি!

উৎসর্গ করবে কোথায়?

উৎসর্গ করবে প্রভুর পাদপদ্মে।

দু'চার দিন পরেই গয়া থেকে ফিরে এল নরেন।

ঠাকুর বললেন, 'কোথায় আর যাবে। মাস্তুলছাড়া পাখির কি আর গতি অছে? মাস্তুলে এসে বসেছিল এক পাখি। জাহাজ যখন ছাড়ল তখন পাখি ভাবলে, দেখি, ডাঙায় ফিরে যাই। বহুক্ষণ এদিক ওদিক উড়ে যখন কূল পেলনা, তখন আর কি করবে, ফের সেই মাস্তুলে এসে বসল।'

নরেন ফিরে এলে ঠাকুর গঙ্গাধরকে বললেন, 'যা কলকাতা থেকে শঙ্খকুণ্ডল কিনে নিয়ে আয়। তা দিয়ে সাজিয়ে দেব নরেনকে। জানিস কুণ্ডলধারণে ধ্যাননিরত বুদ্ধদেব সিদ্ধ হন। নরেনও তেমনি সিদ্ধ হবে।'

শঙ্খকুণ্ডল এলনা ঠিক সময়ে। ঠাকুর তখন নিজহাতে মৃৎকুণ্ডল তৈরি করলেন। নিজ হাতে পরিয়ে দিলেন নরেনকে। ঠাকুরের নিজের হাতে গড়া কুণ্ডল, সে আরো শক্তিশালী।

নরেনকে আশীর্বাদ করলেন, 'মহানিশায় যাও দক্ষিণেশ্বরে। ধ্যানযোগে সিদ্ধ হও।'

২০

ঠাকুরের কেন এত যন্ত্রণা? তিনি কি ইচ্ছা করলে ত্রাণ পেতে পারেন না এই ক্লেশ থেকে?

সেবার পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে ফেলেছিলেন, বৃন্দাবন থেকে তারক এসে বললে,

আপনার হাতে এ কী হয়েছে?

বাড়-বাঁধা হাতের দিকে চেয়ে ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'পায়ে তার বেধে পড়ে গিয়েছি।'

'হাড় সরে গিয়েছে না ভেঙে গিয়েছে?'

'কে জানে বাপু, কি হয়েছে। ওরা তো বেঁধে দিয়েছে আষ্টে-পৃষ্টে। একটু আরাম করে যে মাকে ডাকব তার জো নেই।'

ঠাকুরের স্বর আর্তিতে আর্দ্র হয়ে উঠল। তারক অসহায়ের মত তাকাতে লাগল চারদিকে।

'এক-এক সময় ইচ্ছে হয়, দুত্তোর বাঁধাবাঁধি, সব কেটে বেরিয়ে যাই। দু'হাত তুলে নাচি হরিবোল বলে।' পরের মুহূর্তেই ঠাকুরের স্বর আবার আচ্ছন্ন হয়ে এল : 'না, এও একরকম বেশ খেলা চলছে। এ খেলায়ও আছে বেশ রস-কস।'

'কী দরকার এই কষ্টের খেলা খেলে?' তারক স্পষ্টকণ্ঠে বললে, 'এতে যে আমাদেরও কষ্ট। আপনি তো ইচ্ছে করলেই ভালো হয়ে যেতে পারেন—'

'ভালো হয়ে যেতে পারি? ইচ্ছে করলেই ভালো হয়ে যেতে পারি?' কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন ঠাকুর। পরে বললেন, 'না, রোগের ভোগই ভালো। যারা নানা কামনা নিয়ে আসে আমার কাছে, তারা আমাকে ভুগতে দেখে ভেগে যাবে। ভাববে, এও আমাদের মতই ভোগে, এ আর আমাদের প্রার্থনা মেটাবে কি! চল অন্য সাধুর খোঁজ নিই।' ঠাকুর হাসলেন। 'ওসব বাজে লোকের ভিড় কমে গেলে আমি বরং হালকা হব।' পরে মহামায়ার উদ্দেশে বলে উঠলেন : 'কী কৌশলই করেছিস মা!'

নরেন বললে, 'এ কৌশল ভেঙে দিতে হবে।'

'বলিস কি রে?' ঠাকুর তার দিকে তাকালেন স্নেহচক্ষে। বললেন, 'বুড়ি যে খেলতে ভালোবাসে।'

'খেলতে ভালোবাসে তাতে আমার কি? আমি কেন খেলি?'

'সে কি রে, কি বলছিস তুই? খেলেই তো সুখ। নানারকম খেলা। কভু হার কভু জিত। কভু হাসি কভু কান্না। যে কেবল বুড়ির কাছে ঘোরে তাকে বুড়ি ভালোবাসে না। যে অনেক দান খেলে বুড়িকে ছুঁতে আসে তার জন্যই বুড়ি হাত বাড়িয়ে দেয়। সেই তো পাকা খেলোয়াড়। ক্লান্ত হয়ে কৃপা কুড়িয়ে নেয়। পাশা খেলায় দেখিস নি, পাকা খেলোয়াড় পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে খায়, আবার যেমনি চায় অমনি দান ফেলে, কচে বারো—আবার উঠে যায় এক লাফে।'

খেলা, খেলা, শেষকালে খেলভাঙার খেলা।

নরেন চুপ করে রইল।

তখন না হয় সামান্য হাত ভেঙেছিল, কিন্তু এখন এ কি মর্মচ্ছেদী যন্ত্রণা! যদি সাধ্য হয় কার না ইচ্ছে হবে এই বিষদগ্ধ দারুণ ব্যাধি ঝেড়ে ফেলে গা থেকে। আর সংসারে যদি কারু সেই শক্তি থাকে তবে তা স্বয়ং সাধকচক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণেরই আছে।

কিন্তু এখনো তাঁর সেই এক কথা : 'এই ব্যারাম হয়েছে কেন? যাদের সকাম

ভক্তি তারা ব্যারাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে।'

'আর আমরা?' কে'দে উঠল ভক্তের দল।

'তোরা, যারা শুদ্ধ ভক্ত, তোরাই থাকবি। তোদের সাধ্য কি আমায় ফেলে পালিয়ে যাস। তোদেরকে মিলিয়ে দেওয়াও আরেকটা উদ্দেশ্য এই অসুখের।'

নিজেকে দেখিয়ে ঠাকুর আবার বলতে লাগলেন : 'এর ভিতর মা স্বয়ং লীলা করছেন। প্রথম অবস্থায় জ্যোতিতে দেহ জ্বলজ্বল করত। লোক তাকিয়ে থাকত হাঁ করে। তাই মাকে বললুম, মা, বাইরে প্রকাশ পেয়ো না, ঢুকে যাও, লুকিয়ে পড়ো। মা শুনলেন। তাই এখন এই হীন দেহ।' একটু স্তব্ধ হলেন ঠাকুর, বললেন, 'ভালোই হয়েছে। নইলে সেই জ্যোতির্ময় দেহ থাকলে লোকের ভিড় লেগে যেত। এক দণ্ড তিষ্ঠোতে দিত না আমাকে। এই ভালো হয়েছে।'

'ভালো হয়েছে?'

'হ্যাঁ, আগাছার দল পালিয়ে গেছে। যাক, যেতে দে। তোরা অক্ষয়করণ বট, তোরা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকবি।'

নরেন তারক রাখাল বাবুরাম—সকলের চোখ জলে ভরে উঠল।

'আর, নরেন? তুই তো আমার সেই হোমাপাখি।'

হোমাপাখি খুব সুদূর আকাশে বাস করে, শূন্যেই ডিম পাড়ে। ডিমটা মাটিতে পড়ে যাবার কথা, কিন্তু পড়বার আগেই ফুটে ছানা বেরোয়। ছানা নামতে থাকে মাটির টানে কিন্তু মাটি স্পর্শ করবার আগেই ওর চোখ ফোটে, ডানা গজায়। বুঝতে পারে পৃথিবীর খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। বুঝতে পারে মাটি ছুঁলেই মৃত্যু। তখন হঠাৎ আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠে উপরের দিকে উড়ে চলে। উড়ে চলে তার মার কাছে, সেই আকাশ-আবাসে। ঈশ্বরনিকেতনে।

হোমাপাখি নিত্যসিদ্ধের প্রতীক। কে নিত্যসিদ্ধ? জন্ম থেকেই যে ঈশ্বরকে চায়, সংসারের কোনো ভোগে যার বিন্দুমাত্র লোভ নেই।

শুধু নিত্যসিদ্ধ? আরো কত-কি বিশেষণের মাল্যদাম গলায় পরিয়ে দিয়েছেন নরেনের।

এত ভক্ত আসছে, ওর মত একটিও নাই। অন্যেরা কলসী-ঘটি, নরেন জালা। অন্যেরা ডোবা-পুকুর, নরেন বড় দীঘি। অন্যেরা কাঠি-বাটা, নরেন রাঙাচক্ষু লাল রুই। বাঁশের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফুটোওলা বাঁশ, অনেক জিনিস ধরে। নরেন সভায় থাকলে আমার বল, সঙ্গে থাকলে সাহস। যেন খাপখোলা তরোয়াল।

রাম দত্ত বললে, 'এমন অসুখ না হলে ঠাকুরকে চিনত কে? সুস্থ শরীরে সবাই-ই তো ভগবানে মন রাখতে পারে। কষ্টের কণ্টকশয়নে শুয়েও যিনি অনুক্ষণ নির্বিকল্পে থাকতে পারেন তিনিই অবতার।'

'তাছাড়া আবার কি।' বললে বলরাম, 'ঠাকুরের অসুখ করেছে, ঠাকুরের অসুখ করেছে, শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। ঠাকুরের কখনো অসুখ করতে পারে? এ আমাদের অসুখ, এ আমাদের পাপ।'

'প্রভু, আর কত ছলনা করবেন?' হাতজোড় করে বলছে কেদার চাটুজ্জে।

৬

ছলনা?

'তাছাড়া আবার কি।' বলেছে গিরিশ ঘোষ। 'এ তাঁর লীলা, মানুষের দুঃখ হরণ করবার ছল। সর্বজীবের পাপাপরাধ টেনে নিয়েছেন নিজের মধ্যে। আর সেই দুর্ভার গ্লানি মুছে দিচ্ছেন নিজের ক্লেশ দিয়ে।'

গিরিশের পাপ নিয়েই ঠাকুরের ব্যাধি।

শুধু গিরিশের পাপ? আমার-তোমার সকলের পাপ। সকলের দুষ্কৃতি, সকলের ঋণবন্ধন। চেয়ে দেখ ঠাকুরই সেই নির্জিতদুঃখ বিপাপ অগ্নি।

'জগতের দুঃখ দেখে যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন, ঠাকুরও জীবের দুঃখে রোগ ভোগ করছেন।' বললে শশী।

'অত কথায় কাজ কি। শুধু সেবা, সেবা লাগিয়ে দে।' নরেন বলে উঠল, 'দেখছিস না, আমাদের সেবা নেবেন তাই তাঁর এই অসুখ। সেবাই যে পূজা, সেবাই যে শিব তাই শেখাবার জন্যেই এই আয়োজন। তাই ভাবছিস কেন? তাঁর এই অসুখ না হলে কি আমাদের হ'ত এই মন্ত্রদীক্ষা, এই চক্ষুরুন্মেষ? তাই ছাড়িসনে এ সুযোগ, কায়েমনে সেবা লাগিয়ে দে। এমন সেবা লাগিয়ে দে যাতে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে না পারেন।'

কে একজন এসে নালিশ করলে লাটুকে, 'সারাদিন কেবল রুগীর সেবাই করেন, উপাসনা-আরাধনা করেন না?'

লাটু একবার তাকাল নরেনের দিকে। বললে, 'সেবাই তো আমাদের একমাত্র উপাসনা, একমাত্র আরতি। আমাদের আর কোনো পূজা-চর্যা আছে নাকি? যাকে শুশ্রূষা করছি, নাওয়াচ্ছি-খাওয়াচ্ছি, যার পা টিপে দিচ্ছি, মলমূত্র পরিষ্কার করছি, সেই আমাদের ইষ্ট, আমাদের সর্বশিরোমণি ভগবান।'

আর্তকে পেয়েছি তার মানেই শিবসন্ধান হয়েছে। এবার তার হিতচিকীর্ষায় দৃঢ়ব্রত হও। সেই হিতচিকীর্ষাই তোমার পূজোপাসনা। কল্যাণকর্মের সুযোগ না পাও অন্তত সর্বভূতে শুভাভিলাষী হও। সেই শুভাভিলাষও ঈশ্বরের আরতি।

এত কষ্ট তবু ঠাকুর কি করে আছেন এত আনন্দময়!

রহস্যটুকু শিখে নে আমার থেকে। যে রয় সেই সয়, আর যে সয় সেই মহাশয়।

'কত তোকে সইতে হবে, বইতে হবে একা-একা।' নরেনের দিকে তাকিয়ে বললেন ঠাকুর : 'জীবনে আর তপস্যা কি? সহ্য করাই তপস্যা। যত দুঃখকষ্ট বৈফল্যনৈরাশ্য আসবে সব শরীরের, সংসারের, কিন্তু তোর মন থাকবে পুণ্যপ্রতিজ্ঞায় ভরপুর। সেই পুণ্যপ্রতিজ্ঞাই ঈশ্বরানন্দ।' বলেই তাঁর দীপ্ত মন্ত্র, দিব্য সূক্ত উচ্চারণ করলেন : 'দুঃখ জানে শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাকো।'

ধূমপঙ্কের ঊর্ধ্বে তুই বিশুদ্ধ নীলিমা। সর্বভাসক উপস্থিতি।

কীর্তন লাগিয়েছে ভক্তদল। নরেন রাখাল লাটু বাবুরাম।

ঠাকুর ডেকে পাঠালেন কীর্তুনেদের। বললেন, 'তোরা তো বেশ রে! কেউ মরে আর কেউ হরি হরি বোল বলে!'

সবাই অপ্রস্তুত।

হেসে উঠলেন ঠাকুর। তাঁর সর্বাঙ্গে পুলককদম্ব। বললেন, 'গান গাইছিস তো সুর ভুল করছিস কেন? তাছাড়া এক কলি ছেড়ে দিয়েছিস।' বলে ঠাকুর সুর করে গেয়ে দিলেন কলিটা। কোন জায়গায় সেটা বসাতে হবে তাও দেখিয়ে দিলেন। বললেন, 'হরিনাম গান করছিস সুরে-তালে নিটুট থাকবি। এতটুকু আখর পর্যন্ত ফেলে যাবিনে। যা, লাগা কীর্তন।'

ভক্তবৃন্দ উদ্দাম আনন্দে কীর্তন সুরু করল।

'দুঃখ জানে শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাকো।'

২১

ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার চিকিৎসা করছে ঠাকুরের। সে ঈশ্বর পর্যন্ত না হয় মানল। কিন্তু ঈশ্বর মানুষের চেহারা ধরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এ মানতে সে রাজি নয়।

কি করে হবে? যিনি অবতার তিনি ধরা দিয়ে বুঝিয়ে দিন না। তাহলেই তো মিটে যায় গোলমাল।

নরেনের সঙ্গে বেশ খানিকটা মিল। নরেনও প্রথমটা মানতে চায়নি। তুমি যদি অবতার তাহলে আমিও অবতার। বটেই তো, তুইও ঈশ্বরের প্রতিনিধি। একই জল গোষ্পদেও আছে সমুদ্রেও আছে। যতটুকু জল ততটুকুতেই আকাশের প্রতিবিম্ব। যতটুকু গুণ ততটুকুতেই ঈশ্বর আভাসিত। তাই গুণদর্শনই ব্রহ্মদর্শন।

'দেখুন না রামকে অবতার কি করে বলি? বালি-বধ, শম্বুক-বধ,—এ কি মশাই ঈশ্বরের কাজ? এ কাজ নিতান্ত মানুষের।'

গিরিশ ঘোষ কাছে ছিল, হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'এমন কাজ যদি কেউ করতে পারে সে কেবল ঈশ্বরই পারে।'

'তারপর সীতাবর্জনটা দেখুন।'

'এও মশাই ঈশ্বরের কাজ। মানুষের সাধ্য নেই জেনেশুনে নিষ্কলঙ্কা স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে।'

ডাক্তার সরকার মৃদুরেখায় হাসল। এও একটা কথা?

ঈশ্বর যদি নিরাকার হন কেন তিনি সাকার হতে পারবেন না? এত সব করতে পারেন তিনি, আর একটু আকার ধরতে পারবেন না? মন সৃষ্টি করে তিনি নিরাকার, দেহ সৃষ্টি করে তিনি সাকার। যিনি আদ্যন্তহীন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক তিনি খেলাচ্ছলে ধরতে পারেন না একটি মানুষের ছদ্মবেশ? রাজা কি কখনো-কখনো ছদ্মবেশ ধরে দেখতে আসেনা তার নিজের রাজ্য?

ঠাকুর বললেন, 'আরে, ওরা যে বিজ্ঞানের আজ্ঞাধীন। ঈশ্বর যে অবতার হতে পারেন এ কথা ওদের সায়ান্সে লেখা নেই। তাই কি করে বিশ্বাস হবে শুনি?' বলে ঠাকুর হাসতে হাসতে এক গল্প ফাঁদলেন : 'তবে এক গল্প শোনো। একজন এসে

বললে, ও পাড়ায় দেখে এলুম অমুকের বাড়ি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। যাকে বললে সে একজন লেখাপড়াওয়ালা লোক। সে বললে, দাঁড়াও খবরের কাগজখানা একবার দেখি। খবরের কাগজ নিয়ে এপৃষ্ঠা ওপৃষ্ঠা অনেক ওলটাল-পালটাল কিন্তু অমুকের বাড়িভাঙার কথার উল্লেখ নেই। তখন সে বলল, কই খবরের কাগজে তো লেখেনি। তাই তোমার কথায় বিশ্বাস করিনা। সে কি, নিজের চোখে দেখে এলুম যে। বিশ্বাস করিনা, ও সব মিছে কথা, নইলে খবরের কাগজে থাকত।'

সবাই হেসে উঠল।

যেহেতু বইয়ে নেই সেহেতু অনুভবেও নেই। পায়ের নিচে মাটির পৃথিবীটাই সত্য, আর মাথার উপরে আকাশটাকে দেখেও দেখবনা।

খবরের কাগজে লিখেছে আণবিক বোমায় পৃথিবী একটি ধূলিকণায় পর্যবসিত হবে। যদিও তা চোখে দেখিনি, দেখবও না, তবু তা বিশ্বাস করে বসে আছি। কোন যুক্তিতে এ বিশ্বাসের সমর্থন আছে? এর জন্যেই আছে যে একজন এক্সপার্ট, পারঙ্গম বৈজ্ঞানিক, তাঁর নিভৃত লেবোরেটরির নীরব সাধনায় তা আবিষ্কার করেছেন। যেহেতু সেই বৈজ্ঞানিক আমাদের বিশ্বাসভাজন, সেই হেতু তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যে আমরা বিশ্বাসবান।

তেমনি দেখ আধ্যাত্মিক লেবোরেটরির ক্ষেত্রে কোনো এক্সপার্ট, পারঙ্গম বৈজ্ঞানিক আছেন কিনা। তিনি তোমার বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারেন কিনা। তিনি যদি তেমন জাতের লোক হন, যদি তোমার বিশ্বাসের পাত্র হন, তবে তাঁকেই বা তুমি মানবেনা কেন, কেনই বা নেবেনা তাঁর আবিষ্কার?

পৃথিবী যদি ধূলিকণায় পরিণত হয় তবে আজকের সব ধূলিকণাও পৃথিবীতে পরিণত হবে। পৃথিবী যদি একটি ধূলিকণা, কোটি-কোটি ধূলিকণাও কোটি-কোটি পৃথিবী। বিশ্বাস করতে পারো? কি করে পারবে? খবরের কাগজে এখনো তা লেখেনি যে।

'সরল না হলে ঈশ্বরে চট করে বিশ্বাস হয়না। বিষয়বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূরে, অনেক—অনেক দূরে।' বললেন ঠাকুর : 'বিষয়বুদ্ধি থাকলেই সংশয়। বিষয়-বুদ্ধি থাকলেই অহঙ্কার। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, সব-জেনে-ফেলেছির অহঙ্কার। ধনের অহঙ্কার, সব-করতে-পারির অহঙ্কার। সেই অহঙ্কারই দেয়না বিশ্বাস করতে।'

তাহলে বলতে চাও, জ্ঞান, জ্ঞান চাইনা?

কিন্তু আমরা কি জ্ঞান চাই? আমরা চাই বিদ্যা। শুধু বিদ্যার বোঝা বাড়িয়ে চলেছি। শুধু পাণ্ডিত্যের পিণ্ড। যদি জ্ঞান চাই নম্র একটি বালকের মত নীরবে এসে বসতে হবে গুরুর পায়ের কাছে। আত্মা, অন্তর্যামীই সেই পরমগুরু। গুরু আমার থেকে বেশি জানেন বেশি বোঝেন এ বিশ্বাসটি না থাকলে জ্ঞানার্জন হবে কি করে? গুরু ছাড়া বিদ্যার্জন হতে পারে শুধু শুকনো পুঁথি পড়ে। কিন্তু জ্ঞান পেতে হলে বিশ্বাস চাই নম্রতা চাই সারল্য চাই।

ঠাকুর বললেন, 'বিশ্বাস যত বাড়বে জ্ঞানও তত বাড়বে।'

বেশ তো, নিজের চোখেই তবে দেখনা।

ডাক্তার সরকার আরেক ডাক্তার নিয়ে এসেছে সেদিন। সহসা ঠাকুরের ভাবাবেশ উপস্থিত হল। দেখতে-দেখতে লোপ পেল ঠাকুরের বাহ্যচেতনা। নীরন্ধ্র নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন।

সমাধিভাবটা একবার বৈজ্ঞানিক মতে পরীক্ষা করে দেখিনা। ডাক্তার সরকার ঠাকুরের বুকে স্টেথিসকোপ লাগালেন। হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন মুহূর্তে। হৃৎ-স্পন্দন নেই, না, একবিন্দু না। এ কি, নিশ্বাসও পড়ছে না, হাতের নাড়ি কোথায় উঠে গেছে কে বলবে। অথচ ঢলে পড়ে যাচ্ছেনা মাটিতে। অচল অটল সুমেরুবৎ বসে আছে। শুধু তাই নয়, দুই চোখ উন্মীলিত, পলকবিহীন।

আঙুলের খোঁচা মারলে নিশ্চয়ই চোখ সঙ্কুচিত হবে। সেই পরীক্ষা করবার জন্যে ডাক্তার সরকারের সহাগত ডাক্তার ঠাকুরের চোখে আঙুলের খোঁচা মারল। এতটুকুও কোঁচকালনা চোখ, পলক নড়লনা।

ডাক্তারের নিজের চোখে দেখা। বাইরে থেকে দেখতে মৃত, অথচ আসলে বসে আছেন স্থির হয়ে।

কি আর বলবেন ডাক্তার! মাথা হেঁট করলেন। স্টেথিসকোপ খসে পড়ল হাত থেকে।

তারপর সেদিন আরেক কাণ্ড।

রাত তিনটে থেকে জেগে বসে আছে সরকার। চোখে ঘুম নেই। কেবল রামকৃষ্ণ-চিন্তা। আর কিছু নয়, আহা, ঠাণ্ডা লাগল নাকি নতুন করে। গলা আবার টাটাল নাকি! বাড়ল নাকি কাশি!

শুধু তাই? নিজের মনকে কত চোখ ঠারবে? মন বলছে, আরো একটু ভাবো। আরো একটু গভীরে যাও।

ঈশান মুখুজ্জেকে সেদিন যেমন বলেছিলেন ঠাকুর, 'বামুন, ডুবে যাও, তলিয়ে যাও—'

না তলালে অতলকে ছোঁবে কি করে?

রোজ-রোজ কত টাকা যে লোকসান হচ্ছে বলবার নয়। ঠাকুরের কাছে এসে আর উঠতে সাধ হয়না। পায়ে শিকড় গজায়। সকাল আটটা বেজে গেল তবু বেরুবার নাম নেই। তখনো পরমহংসের চিন্তা। মাস্টারমশাই এসে জিগগেস করলেন, 'কি হচ্ছে?'

'আর কি হবে! পরমহংস হচ্ছে।'

সেদিন বিকেল তিনটের সময় এসে হাজির। ইচ্ছে ঠাকুরকে তাড়াতাড়ি দেখে নিয়ে অন্য রুগীর বাড়ি যাবে।

অনেক ভক্ত সমাগম হয়েছে সেদিন। এবং সকলের অগ্রনায়ক নরেন্দ্রনাথ। নরেনকে দেখে খুশি হল সরকার। বললে, 'আজ গান হবেনা?'

ঠাকুর বললেন, 'একটু গান কর।'

তানপুরা টেনে নিয়ে নরেন গান ধরল। 'সুন্দর তোমার নাম দীন-শরণ হে।'

তারপর আবার আরেকখানা, ঠিক সরকারের মুখের উপর জবাব। 'আমায় দে মা পাগল করে, আমার কাজ নেই জ্ঞানবিচারে।'

মুহূর্তে কি হয়ে গেল কে বলবে। সকলেই একসুরে বলছে সেই কথা। শুধু বলছেনা, সবাই উঠে পড়েছে, নাচতে সুরু করেছে। সবার আগে বিজয়কৃষ্ণ। দেখা-দেখি আর সকলে। ঠাকুর স্বয়ং। কে বলবে তাঁর ঐ ভয়ঙ্কর ব্যাধির যন্ত্রণা। দেহবোধের লেশমাত্র নেই, রোগ কোথায় দেহছাড়া হয়ে গেছে। এ কি সম্ভব! এমন রুগী নাচবে দু'হাত তুলে। নৃত্যের পরেই সমাধিস্থ হয়ে যাবে! নিবাত-নিষ্কম্প শিখার মত ঋজু হয়ে থাকবে। সেদিন দেখছিল বসে, আজ দাঁড়িয়ে। দিব্যভাস্বর কলেবরে এ কি জ্যোতির্ময় আবির্ভাব! যেমন রুগীর হুঁশ নেই সঙ্গে-সঙ্গে তার ডাক্তারও বুঝি বেহুঁশ হতে চলল। যেমন রুগী তেমন ডাক্তার!

না, না, আমি বেহুঁশ হব কেন? আমি যে সায়ান্স পড়েছি। আমি যে বুদ্ধি-বিচারের ক্রীতদাস।

কিন্তু ঐ দেখ ছোট নরেনকে, লাটুকে। তারা একেবারে স্তব্ধীভূত পাষাণ।

ভাবের উপশমে কেউ হাসছে কেউ কাঁদছে—কেউ গড়াগড়ি খাচ্ছে। এ যে দেখছি কতগুলো মাতালের খেলা! এ কি মদ-মাতাল না মন-মাতাল?

'তোমার সায়ান্স কি বলে?' ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'এই যে এ মুহূর্তে কান্ডটা ঘটে গেল এটা একটা শুধু ঢং?'

'তা আর কি করে বলি?' ডাক্তার মাথা চুলকোলো : 'এত লোকের যখন একসঙ্গে হচ্ছে তখন তো সেটাকে আর ঢং বলতে পারি না?' নরেনের দিকে তাকাল ডাক্তার : 'তুমি যখন জ্ঞানবিচার ফেলে পাগল হবার গানটা গাইছিলে তখন নাচের টানে আমার পা-ও টলে উঠেছিল। কিন্তু অনেক কষ্টে ভাব চাপলুম। ভাবলুম বাইরে লোক দেখিয়ে লাভ কি! আমার অন্তরের যে বাউলবৈরাগী সে নাচুক।'

ঠাকুর উৎফুল্ল হলেন। বললেন, 'তোমাকে চিনিনা? তুমি হচ্ছ গম্ভীরাত্মা। হাতি যদি ডোবাতে নামে তাহলে তোলপাড় হয়, কিন্তু যদি সায়রদীঘিতে নামে তাহলে তোলপাড় হয়না। তুমি হচ্ছ সেই সায়রদীঘির হাতি।'

'কই অন্য রুগী দেখতে উঠবেননা?' কে একজন মনে করিয়ে দিল।

'আর রুগী! যে পরমহংস হয়েছে আমার সব গেল।'

ঠাকুরকে বলে দিয়েছে কথা না কইতে অথচ কথা শোনবার লোভে নিজেই বসে আছে তীর্থকাকের মত! এ কি শুধু কথা না অমৃতস্নান?

'কি করি বলো তো?' বলছে ডাক্তার সরকার, 'তোমার কাছে এলেই সমস্ত কর্ম পণ্ড হয়ে যায়। পেটের ধান্দা উনুনে গিয়ে ঢোকে। কতক্ষণ তোমাকে বকালাম আজ। কিন্তু দেখো আর কারু সঙ্গে যেন কথা কোয়োনা। আমি এলে আমার সঙ্গে শুধু কইবে।'

ঠাকুরের রোগ তো বাড়ছেই, সন্দেহ হচ্ছে তাঁর সেবকদের মধ্যে না এ কালব্যাধি সংক্রামিত হয়!

সুজির পায়েস খেতে পারেননি ঠাকুর। সব বমি করে ফেলেছেন। পুঁজরক্ত

সব পড়েছে বাটিতে।

অবতার তো বলো? এই বাটিতে দাও দেখি চুমুক।

তথাস্তু। নরেন ঠাকুরের সেই উচ্ছিষ্ট পায়েস খেয়ে ফেলল এক চুমুকে।

২২

আমি নীলকণ্ঠ শিব। আমি সোমসূর্যাগ্নিচক্ষু। স্ফুট-স্ফটিক-সপ্রভ বিশ্ব-বিকাশ শ্বেতশিখা। আমি সর্বপাশমোচন পশুপতি। বীরভদ্র বীরেশ্বর। আমিই ভূত, ভবন এবং ভব্য, আমিই অনেকাত্মা সহস্রাংশু। মৃত্যুমৃত্যু শাশ্বতপুরুষ।

সমস্ত বিষ আমি ধারণ করতে পারি। নিঃশেষে করতে পারি পরিপাক। আমি সমস্ত সন্দেহনাশন বিদ্যুদবিম্বান দুর্ধর্ষ।

ধ্যানে বসেছে নরেন। চারদিক নিঃসাড়, বায়ুও বুঝি নিশ্বাস ফেলছেনা। ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে আর সকলেই ঠাকুরের সেবায় ব্যাপৃত, শুধু বুড়ো গোপাল নরেনের পাশে বসে। সেও স্তব্ধ-মগ্ন।

হঠাৎ নরেনের মুখ থেকে একটা কাতর আর্তনাদ ছুটে এল : 'গোপালদা, আমি কোথায়? আমার শরীর কোথায় গেল?'

ত্রস্ত হয়ে নরেনের গায়ে হাত রাখল গোপাল। নাড়া দিয়ে বললে, 'এই যে, এই যে।'

কোথায় এই যে! সারা গা মৃত্যুর মত হিম। চেতনার তাপচিহ্ন নেই কোথাও।

মরীয়ার মত ছুট দিল গোপাল। একেবারে দোতলায়, ঠাকুরের কাছে। রুদ্ধ নিশ্বাসে বললে, 'সর্বনাশ হয়েছে।'

'কি হয়েছে?' এতটুকু চমকালেন না ঠাকুর।

'নরেন নেই। মরে গেছে।'

ছোট্ট একটি ভ্রূভঙ্গি করলেন ঠাকুর। বললেন, 'বেশ হয়েছে।'

বেশ হয়েছে? এ কি অসম্ভব কথা।

'হ্যাঁ, বেশ হয়েছে। থাক খানিকক্ষণ ওরকম হয়ে। সমাধি-সমাধি করে আমাকে ভীষণ জ্বালাতন করে তুলছিল। বুঝুক একটু সমাধির স্বাদ।'

রাতের প্রায় একপ্রহর কেটে যাবার পর নরেন ফিরে পেল দেহজ্ঞান। আর ফিরে পেয়েই চলল ঠাকুরের কাছে। পা চলছে কি চলছে না বুঝতে পারছেনা। সিঁড়ি যেন টলমল করছে।

তাকে দেখতে পেয়েই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'কিরে সব দেখতে পেলি তো? মা-ই আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস।'

চোখ তুলে তাকাল নরেন।

'তোর সেই বন্ধ ঘরের চাবি কিন্তু আমার কাছে থাকবে।' বললেন ঠাকুর, 'এখন তোকে অনেক কাজ করতে হবে, আমার কাজ। আর যখন সেই কাজ শেষ হবে তখন

আবার চাবি ঘুরিয়ে ঘর খুলে দেব।'

'কি কাজ?'

ঠাকুর এক টুকরো কাগজ আর পেন্সিল তুলে নিলেন। যেন কি গোপন কথা, গোপনে লিখলেন সেই কাগজে। যেন কি অগ্নি-অক্ষর বীজমন্ত্র, নরেন ছাড়া আর কারু দেখবার নয়। লেখা কাগজ তুলে দিলেন নরেনের হাতে।

নরেন দেখল কাগজে লেখা একটি মাত্র শব্দ। বজ্রগর্ভ মহাকাব্য। কথাটি আর কিছুই নয়, 'লোকশিক্ষা।'

ঝঙ্কার দিয়ে উঠল নরেন, 'পারব না।'

'পারবিনে কিরে? তোর ঘাড় পারবে।' ঠাকুর তাকালেন প্রফুল্ল চোখে, বললেন, 'তুই আমার হাতের অস্ত্র, আমার হাতের লেখনী।'

অতল-অতুল আনন্দে দেহ-মন ভরে গেল নরেনের।

'আমি রামকৃষ্ণের গোলাম—তাঁহাকে 'দেই তুলসি তিল দেহ সমর্পিলু' করিয়াছি। মানুষের সহায়তাকে আমি পদদলিত করি। যিনি গিরিগুহায়, দুর্গম বনে ও মরুভূমিতে আমার সঙ্গে-সঙ্গে ছিলেন, আমার বিশ্বাস তিনি আমার সঙ্গেই থাকিবেন। জানিনা, আমি কবে ভারতে যাইব। সমুদয় ভার তাঁহার উপর ফেলিয়া দেওয়া ভাল, তিনি আমার পশ্চাতে থাকিয়া আমাকে চালাইতেছেন। যে কেহ রামকৃষ্ণের দোহাই দেয় সেই তোমার গুরু জানিবে। কর্তাত্ব সকলেই পারে—দাস হওয়াই বড় শক্ত। আমার উপর তাঁহার নির্দেশ এই যে তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগীমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে, এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক, লইতে রাজি আছি।'

গঙ্গাসাগরে যাবার জন্যে বহু সাধুর ভিড় হয়েছে কলকাতায়। বুড়ো গোপালের ইচ্ছে হল বেছে-বেছে কয়েকজন সাধুকে গেরুয়া কাপড় ও রুদ্রাক্ষের মালা দেয়। অকপটে অভিলাষের কথা বললে ঠাকুরকে।

ঠাকুর শুনে খুব খুশি হলেন। বললেন, 'ভালো কথা। কিন্তু তুই আর সাধু পেলিনে?'

তার মানে? গোপাল অপ্রতিভ হয়ে গেল।

'ওসব জটা-দাড়ি দেখেই বুঝি ভুললি? দূরের মাঠকেই বুঝি সবুজ মনে হয়?'

চুপ করে রইল গোপাল।

'তোর এই নিত্যিকার চোখে দেখা ভক্ত ছোকরাগুলি বুঝি আর নজরে পড়ল না? ওদের ত্যাগ আর ভক্তি সেবা আর নিষ্ঠা কিছুই দেখতে পেলিনে তুই? যা, বারোখানা গেরুয়া কাপড় কিনে নিয়ে আয় আর বারোটা রুদ্রাক্ষের মালা। আমি আমার দ্বাদশ রাজকুমারকে সূর্যের দ্বাদশমূর্তির মত ধর্মরাজ্যে অভিষেক করব।'

গোপাল কিনে নিয়ে এল গেরুয়া আর রুদ্রাক্ষ।

ঠাকুর বিতরণ করতে বসলেন।

কে সেই বারো জন? সূর্য আর বিবস্বান, অর্যমা আর পূষা, ত্বষ্টা আর সবিতা, ধাতা আর বিধাতা, বরুণ আর মিত্র, শক্র আর উরুক্রম।

ডাকো নরেনকে। আর এগারো জন?

রাখাল আর তারক, যোগীন আর শরৎ, বাবুরাম আর নিরঞ্জন, হরি আর কালী, লাটু আর গোপাল।

সব মিলে এগারো জন তো হল। বারো নম্বরের কোন ব্যক্তি? মাথা চুলকোতে লাগল গোপাল। সত্যিই তো, গৃহত্যাগী ভক্ত সেবকদের মধ্যে আর কেউ তো বাকি নেই। তবে ঠাকুর কি সংখ্যা নির্ণয় করতে ভুল করলেন?

'একখানা কাপড় ও একটা মালা যে বাড়তি হল।'

'বাড়তি হল? কেন, ভক্ত ভৈরবকে ডাকো।' ঠাকুর বললেন দৃঢ়স্বরে।

ভক্ত ভৈরব? সে আবার কে?

'তুই তাকে কি করে চিনবি? আমি তাকে দেখেছি ধ্যানে, দক্ষিণেশ্বরে কালী-মন্দিরে। দেখেছি একটি ধুলোমাখা উলঙ্গ ছেলে নাচতে-নাচতে আসছে। মাথায় একগোছা চুল, বাঁ হাতে মদের বোতল, ডান হাতে অমৃতের ভৃঙ্গার। জিগগেস করলাম, তুই কে? বললে, আমি ভৈরব। এখানে এসেছিস কেন? তোমার কাজ করতে এসেছি।'

চিত্রার্পিতের মত তাকিয়ে রইল গোপাল।

'তারপর সেই ভৈরবকে ফের দেখলাম যেদিন গিরিশ প্রথম এসে দাঁড়াল আমার সামনে। এক হাতে মদ আরেক হাতে সুধা। এক হাতে পাপ আরেক হাতে নির্মলতা। অন্তরজোড়া বিশ্বাস আর শরণাগতি।'

সেই গিরিশ ঘোষ দ্বাদশ আদিত্যের একজন? সেও রুদ্রাক্ষ আর গেরুয়ার অধিকারী? যে ঠাকুরকে মদের নেশায় অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিয়েছে, বার করে দিয়েছে থিয়েটার থেকে, সেই গিরিশ ঘোষ? যার পাপ ধারণ করে ঠাকুরের ব্যাধি?

হ্যাঁ, সেই গিরিশ ঘোষ। পঙ্কিলকে যদি না তিনি পবিত্র করবেন, কুটিলকে যদি না করবেন অকপট, তবে তিনি কিসের ঠাকুর? অধোগত বলেই তো তার দরকার উত্তোলনের হাত। যে অভাজন তারই তো দরকার অনুকম্পা। যে শাখা নিষ্পুষ্প ও নিষ্ফল তারই জন্যে তো শ্রাবণের ধারাবর্ষ।

গিরিশ কোথায়? সে এখনো আসেনি। তবে তার জন্যে রেখে দাও বস্ত্র-মাল্য। সে এলে পরে দিও। নয়তো পাঠিয়ে দাও তার বাড়িতে।

গিরিশ আর নরেন বসেছে এক গাছের নিচে। বসেছে ধ্যান করতে।

চোখ বোজো। চিত্ত স্থির করো। একাগ্রভূমিতে চলে যাও। চিত্তবৃত্তির নিরোধই হচ্ছে যোগ। তাই একসঙ্গে একাগ্র ও নিরুদ্ধ হও।

উঃ, কি মশা রে বাবা! সাধ্য কি চোখ বুজে থাকো। কানের কাছে অনবরত পিনপিন করছে। বসছে এসে নাকে মুখে, সূক্ষ্ম সূচীতে হুল ফোটাচ্ছে। বারে বারে চোখ খুলে যাচ্ছে গিরিশের। সাধ্য কি তুমি একাসনে দৃঢ় থাকো, মশার কামড় উপেক্ষা করো। মশা থাকতে দশায় পড়া অসম্ভব—গিরিশ উঠে পড়ল।

কিন্তু এ কি, নরেন যে ঠায় বসে আছে। অটল-নিশ্চল। মন অনন্তভাবে স্থির। অর্পিত ও আবিষ্ট। এতটুকু যেন নিশ্বাসেরও আভাস নেই কোথাও।

ওমা, মোটা একখানা কালো কম্বল গায়ে দিয়ে বসেছে। তাই, তাই স্থির থাকতে পারছে অমনি। তাই মশার কামড় উপেক্ষা করতে পারছে। আমিও তখন বুদ্ধি করে একখানা কম্বল গায়ে দিয়ে বসলে পারতাম!

এ কি, এ কম্বল নয় তো! এ যে মশার ঝাঁক। পুঞ্জ-পুঞ্জ মশা ঘন হয়ে ছেঁকে ধরেছে নরেনকে, শরীরের একতিল স্থান বাকি রাখেনি। তাইতে মনে হচ্ছে পুরু একখানা কালো কম্বলে সর্বাঙ্গ ঢাকা!

এ কি আশ্চর্য! এ কি আত্মস্বরূপে অবস্থিতি! হাজার হাজার মশকদংশন তবু বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নেই। না বাইরে না ভিতরে! পূর্ণের উপলব্ধিতে নিমগ্ন হয়ে রয়েছে। যেন বল্মীকের স্তূপের মধ্যে সাধক রত্নাকর!

ভীষণ এই সর্বাত্মক ঐকান্তিকতা। ভয় পেয়ে গিরিশ বারে-বারে ডাকতে লাগল নরেনকে। সাড়া নেই, স্পন্দন নেই। তখন আরো ভয় পেয়ে গিরিশ তার পা ধরে টানতে লাগল : 'ওটো, ওঠো, চোখ চাও।'

কোথায় চোখ চাইব? সংসারে আর কী রূপ আছে যে চোখকে আকর্ষণ করবে? কী শব্দ আছে যে কানে মধু ঢালবে? যেখানে এসেছি সেখানে দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শন আর কিছু নেই। শুধু আত্মসাক্ষাৎকার।

কিছুতেই বাহ্যজ্ঞান আনা যাচ্ছে না। তখন গিরিশ নরেনের আসন ধরে টানতে লাগল। নরেনের অচেতন দেহ টলে পড়ল মাটিতে।

অনেক চেষ্টা, অনেক হাঁক-ডাক, তবে নরেন ফিরে এল দেহভূমিতে।

'বোস আমার পাশটিতে।' ঠাকুর নরেনকে কাছে ডেকে নিলেন : 'শোন, আর সকলকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বল। দরজা বন্ধ করে দে।'

কি ব্যাপার, কেন দরজা বন্ধ করতে বললেন কে জানে। ভয়ে নরেনের বুক দুরদুর করে উঠল। দরজা বন্ধ করে দিল নরেন। ঘরের মধ্যে শুধু দুজন। নরেন আর ঠাকুর। ঠাকুরের সেই স্বপ্নে দেখা ঋষি আর শিশু।

'আমার পাশ ঘেঁষে চুপটি করে থাক।' বললেন ঠাকুর।

ঘন হয়ে বসল নরেন। ঠাকুর তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। কি করুণাপরিপূর্ণ সুগভীর স্নেহদৃষ্টি! যেন বলছেন, তুই ছাড়া আমার কেউ নেই। তোকে ছাড়া কাকে দিয়ে যাব আমার হাতের বাঁশি।

তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ঠাকুরের সমাধি হয়ে গেল। নরেন অনুভব করল কি-একটা তীব্র আলো ঠাকুরের শরীর থেকে বেরিয়ে তার শরীরের মধ্যে ঢুকছে। যেন একটা বিদ্যুতের ছুরি হয়ে চিরে-চিরে দিচ্ছে। শিহরিত করছে সর্বাঙ্গ। এ কি হল! এ আমি কোথায় এলাম! দেখতে-দেখতে নরেনও ডুবে গেল সমাধিতে।

বাহ্যচেতনা ফিরে পেয়ে নরেন তাকিয়ে দেখল ঠাকুরও জেগেছেন। কিন্তু এ কি, ঠাকুরের চোখে জল! কাঁদছেন ঠাকুর।

'এ কি, আপনার কি কোনো কষ্ট হচ্ছে?' কাতর ঔৎসুক্যে জিগগেস করল নরেন?

'কষ্ট? না, না, আনন্দ। ফকির হবার ফতুর হবার আনন্দ!'

মূহ্যমানের মতো তাকিয়ে রইল নরেন।

'আজ আমার যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে দিলুম।' বললেন ঠাকুর, 'আমার সমস্ত রাজ্য-সম্পদ। দিয়ে একেবারে ফকির হয়ে গেলুম। তুই এখন একাই রাজরাজেশ্বর হয়ে গেলি। সেই রাজশক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি এবার তুই। আমি আর থাকব না।'

নাথহীন শিশুর মত অসহায় কণ্ঠে কেঁদে উঠল নরেন। সে কান্না আর থামে না। তুমি থাকবেনা কি! তুমি না থাকলে এই সূর্যসনাথা পৃথিবীই যে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

'আসলে আমি আর তুই অভেদাত্মা।' বললেন আবার ঠাকুর। 'কিন্তু বাইরের চোখে আমরা আলাদা, গুরু-শিষ্য, পিতা-পুত্র। এবার আমি চলে যাব। তুইই এখন একরথ একচ্ছত্র সম্রাট। তুইই এখন দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ।'

নরেন তবু কাঁদছে নিরর্গল।

'কাঁদিসনি। কাঁদবার সময় কই? শুধু কাজ আর কাজ। আবার তোর যখন কাজ ফুরোবে তুইও ফের ফিরে যাবি স্বধামে।'

২৩

অতিলৌকিককে বিশ্বাস করি না। বিজ্ঞাননির্মল আমার চক্ষু। বিজ্ঞানবলিষ্ঠ আমার ভঙ্গি। সব যাচাই-বাছাই করে নিই। নিই নিকষপাষাণে ঘষে-ঘষে।

কিন্তু আমি কতটুকু জানি, কতটুকু বুঝি, কতটুকু বা আমার স্নায়ুশিরার আয়ত্তে? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত আইনের বই আমার জীবনের লাইব্রেরি ঘরে তো ধরছেনা। কী জানি কোথায় কোন আইনের কী ধারা-উপধারা, করণ-প্রকরণ, বিধি-অনুবিধি! আমার একমুঠো উঠোনে কি করে ধরব এই একআকাশ তারা! পিঁপড়ের গর্তে হাতির পদচারণ!

তাই বলে চুপ করে থাকব? চুপ করে মেনে নেব ঘাড় পেতে? বুদ্ধি-যুক্তি বলে একটা কিছু দিয়েছেন তো ঈশ্বর, সেটাকে ব্যবহার করবনা? ভাবের লোনা হাওয়ায় বুদ্ধির শক্ত লোহাতে মর্চে পড়তে দেব?

কিন্তু বুদ্ধি যেমন ঈশ্বর দিয়েছেন তেমনি অনুভূতিও তো দিয়েছেন। দেখিনা-শুনিনা ধরিনা-ছুঁইনা তবু অনুভব করি। গায়ে আঘাত লাগেনি তবু মনে ব্যথা করে উঠেছে। সেই ব্যথাই কি সেই আঘাতের প্রমাণ নয়? দেখিনা সেই মহাশক্তিকে কিন্তু অন্তরের মধ্যে নির্ভুল জেগে আছে সে বিবেকরূপে। ক্ষণে-ক্ষণে বলছে, বলে উঠছে, এই, কি করছিস, দেখে ফেলেছি!

আমি যদি বারে-বারে নিজের সামনে ধরা পড়ে যাই তা হলে কি এইটেই প্রমাণ হয় না যে আমিই সেই মহাশক্তি!

তা ছাড়া আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনা, ধরতে পারছিনা এইটেই কি প্রমাণ

নয় যে আছে কোথাও এক মহা-অজ্ঞেয় মহা-অনির্ণেয় মহা-অপরিমেয়?

ঠাকুরের লীলা-সংবরণের দিন বুঝি ঘনিয়ে এল। ঠাকুরের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নরেন।

এই কি অবতার? এই কি সেই ছদ্মবেশী রাজা?

কি করে বিশ্বাস করি! রোগে-রোগে শীর্ণ মলিন হয়ে গিয়েছেন, কথা কইবার শক্তি নেই, সাধারণ দেহধারী মানুষের মত অবস্থা, এর মধ্যে কোথায় সেই ঈশ্বরের প্রতিরূপ?

যদি এই সময়, শেষ সময়, মুখ ফুটে বলে যেতে পারেন যে তিনি ভগবান তা হলে বিশ্বাস করতে পারি।

কিন্তু তাঁর কণ্ঠে এখন ভাষা কই, চোখে জ্যোতি কই, লোক চেনবার ক্ষমতাও হয়তো এখন চলে গিয়েছে।

হঠাৎ, বলা-কওয়া নেই, চোখ চাইলেন ঠাকুর। তাকালেন নরেনের দিকে।

কিছু চান? কিছু বলতে চান? ব্যস্ত হয়ে কাছে এগুলো নরেন।

স্পষ্ট স্বচ্ছ কণ্ঠে ঠাকুর বললেন, 'শোন তোকে বলে যাই। যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ। বুঝলি?'

অন্তর্যামী ঠিক মনের কথাটি টের পেয়েছেন। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন। ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিয়েছেন ছদ্মবেশ। অরণিকে আশ্রয় করে জ্বলছিল যে আগুন সে এখন নির্ধূম নিরিন্ধন। সে এখন স্বপ্রকাশ।

দেখতে পাচ্ছি পরমকারণকে। যতক্ষণ পরমকারণকে জানিনি ততক্ষণ কারণানুসন্ধানের শেষ ছিলনা। এখানে-ওখানে ঘুরেছি। দুলেছি সংশয়ের দোলনায়। আর সংশয় নয়, স্বীকৃতি। শুধু স্বীকৃতি নয়, সমর্পণ। শুধু সমর্পণ নয়, প্রত্যুত্তর। ঘোষণার উত্তরে প্রতিধ্বনি। পরমকারণের সন্ধান এখন নিজের জীবনের মধ্যে। শুধু সন্ধান নয়, উদ্ঘাটন। আমিই সেই, সে অপরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির স্থির বিদ্যুৎ!

আমিই সেই রামকৃষ্ণ।

ধীরে ধীরে মহাসমাধিতে লীন হয়ে গেলেন ঠাকুর। শ্রাবণ মাসের গভীর রাত, সেও তখন সমাধিমগ্ন।

অনাথ শিশুর মত কাঁদতে লাগল সকলে। শ্রীশ্রীমা আর্তনাদ করে উঠলেন: 'আমার কালী-মা কোথায় গেলে গো?'

বরানগরের শ্মশানের দিকে চলল সবাই সর্বস্বহারার মত।

ঠাকুরের পূত-ভস্ম নিয়ে গৃহীতে-সন্ন্যাসীতে ঝগড়া বেধে গেল। গৃহীদের দলপতি রাম দত্ত বললে, এ ভস্ম গৃহীদের প্রাপ্য, কেননা ঠাকুর শ্রেষ্ঠ গৃহী। পালটা জবাব এল সন্ন্যাসী শিষ্যদের তরফ থেকে। তারা বললে, এ ভস্মে সন্ন্যাসীদের অধিকার, কেননা ঠাকুর শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী।

'কিন্তু অস্থি-ভস্ম তোমরা রাখবে কোথায়?' বললে রাম দত্ত। 'তোমাদের চাল আছে না চুলো আছে? কাশীপুরের বাড়ির ইজেরা তো আর মোটে সাত দিন। তখন রাখবে কোথায়?'

'রাখব মাথার উপরে।' বললে শশী আর নিরঞ্জন।
ঝগড়া ঘোরতর হয়ে উঠল। এ বলে আমার দাবি ও বলে আমার।
আর দু' ভাইয়ের ঝগড়া দেখে হাসেন বসে ঈশ্বর।
নরেন এল সালিশ করতে। গৃহীদের বললে, 'ভয় নেই, তোমাদেরই পাওনা সেই পূত-ভস্ম, পূত-অস্থি। তোমাদেরই দিয়ে দেব।'
সন্ন্যাসী ভায়েদের কাছে ডেকে আনল। বললে, 'ঠাকুরের দেহাবশেষ অধিকারে থাকলেই কি সর্বসাম্রাজ্যের অধিকার হল? আমরা কি শুধু ভারবাহী হব, সারবাহী হব না? শুধু ভস্ম বয়ে বেড়াব, বহন করব না সেই তেজ, সেই পবিত্রতা? অচল-প্রতিষ্ঠ বারিধির কি আমরা এক-একটা তরঙ্গ হয়ে উঠব না? তিনি কি ভস্ম হয়েছেন যে তার ভাগ নিয়ে ঝগড়া করব? আমাদের মজ্জায় তাঁর মজ্জা, আমাদের অস্থিতে তাঁর অস্থি। আমরা তাঁর কেমনতরো শিষ্য যদি না তাঁর জ্যোতির্ময় বাণীমূর্তি হতে পারি? যদি না হতে পারি তাঁর উপদেশের উদাহরণ?'
কাঁকুড়গাছিতে বাগান করেছে রাম দত্ত। সেখানেই রাখা হবে দেহাবশেষ।
চলো, মাথায় করে দিয়ে আসি। পূতভস্মাস্থির কলসী নরেন নিজে মাথায় করে পৌঁছে দিয়ে এল বাগানে।
কিন্তু তার আগে ভস্মের প্রায় অর্ধেক সন্ন্যাসীরা সরিয়ে ফেলেছে। আরেকটা পাত্রে ভরে রেখে দিয়ে এসেছে বলরাম বোসের বাড়িতে।
আমি যেমন সংসারীর তেমনি আবার সন্ন্যাসীর। আমি সকলের। যেমন সংসারে আমার সন্ন্যাস, অর্থাৎ সম্যক ন্যাস, তেমনি সন্ন্যাসে আমার লোকসেবার সংসার। আমি যেমন গৃহস্থের তেমনি আবার গৃহহীনের। যেমন মঠবাসীর তেমনি মরুচারীর। আমার সন্ন্যাস সংসারের সঙ্কোচন নয় সংসারের সম্প্রসার। আর আমার সংসার ভোগায়তন নয় বিদ্যায়তন।
বিহগপক্ষসুকোমল শুভ্রশয্যায় যে শুয়েছে সে যেমন আমার, তরুকোটরগুহা-গহ্বরকাননে যে বাস করছে সেও আমার।
আমার সর্বসমন্বয়ের ধর্ম। আমার ধর্ম সর্বাঙ্গসুন্দর।
নর্তকীর মতন থাকো। মাথায় উপরে ঘড়া নিয়ে নাচছে নর্তকী, ঘাঘরা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে। নাচছে, কিন্তু মাথার ঘড়া ফেলে দিচ্ছেনা। মাথার ঘড়া ফেলে দিলেই নাচ ব্যর্থ হয়ে যাবে। পড়ে যাবে যবনিকা। দর্শকের দল টিটকিরি দিয়ে উঠবে। তেমনি তোমার জীবননৃত্য যদি সফল করতে চাও তো যে তোমার শিরোধার্য তাকে ফেলে দিও না মাটিতে। যে তোমার অচ্যুত তাকে বিচ্যুত কোরোনা। শুধু যেমন নাচায় তেমনি নেচে যাও।
চেয়ে দেখ পৃথিবীর দিকে। বসুন্ধরা নাচছে দিনে-রাত্রে, ঋতুতে-ঋতুতে ইতি-হাসের অধ্যায়ে-অধ্যায়ে। কিন্তু তার মাথার উপরে ধরা আকাশের কুম্ভটি ফেলে দেয়নি।
'একটা পথ দিয়ে যেতে যেতে যদি ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা আসে তা হলেই হল।' বলেছেন ঠাকুর। তাই পথটা জিজ্ঞাস্য নয়, জিজ্ঞাস্য হচ্ছে ভালোবাসা।

হোক তোমার কণ্টকক্লেশের পথ, নয়তো বা ভোগবিলাসের। যদি একবার ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা আসে, তবে কে বা হিসেব করে কণ্টকপীড়া, কে বা ভোগলালসা! নদী একবার সমুদ্রে এসে মিশলে সে কি আর তাকায় পশ্চাতের মানচিত্রের দিকে, কোন পথ দিয়ে এলাম! সে কি শ্যামশস্যের পথ না কি প্রাণচিহ্নহীন মরুভূমির!

'আমাদের পথ সন্ন্যাসের।' বীরগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করল নরেন। জ্বলন্ত বৈরাগ্যের। জ্বলন্ত বৈরাগ্যের মানে প্রতপ্ত অনুরাগের।

বৈরাগ্যের রঙই হচ্ছে গেরুয়া।

'সন্ন্যাসী জগৎগুরু।' বললেন ঠাকুর। 'সন্ন্যাসীদের ষোল আনা ত্যাগ দেখলেই তো লোকে ত্যাগ করতে শিখবে।'

'সন্ন্যাসীর হচ্ছে নির্জলা একাদশী।' আবার বললেন ঠাকুর, 'আরো দুরকম একাদশী আছে। ফলমূল খেয়ে, আর লুচি-ছক্কা খেয়ে। সংসারীদের হচ্ছে লুচি-ছক্কা খাওয়া একাদশী। তাদের এতে দোষ নেই। তাদের হচ্ছে কেল্লার থেকে যুদ্ধ। আর সন্ন্যাসীর যুদ্ধ হচ্ছে মাঠে দাঁড়িয়ে।'

সংসারীর ত্যাগ হবে মনে। সন্ন্যাসীর ভিতরে ও বাইরে দুয়েতেই। পাঁকের মধ্যে পাঁকাল মাছের মত থাকলেই চলবে সংসারীর। সন্ন্যাসী পাঁকের কাছাকাছিই আসবেনা।

কেন, কেন এত সব কঠিন নিয়ম সন্ন্যাসীর? ঠাকুর বললেন, 'তাকে যে লোক-শিক্ষা দিতে হবে। তাকে দেখে যে লোকের জাগ্রত হবে চৈতন্য।'

যদি কৃশানুই না জ্বলে তবে শীতত্রাণ হবে কি করে?

'বাবুরামকে বললাম তুই লোকশিক্ষার জন্যে পড়।' ঠাকুর বলছেন ভক্তদের, 'সীতার উদ্ধারের পর বিভীষণ রাজত্ব করতে রাজি হলনা। রাম বললেন, মূর্খদের শেখাবার জন্যে রাজা হও। নইলে তারা বলবে, বিভীষণ রামের এত সেবা করল, তার লাভ কী হল! রাজা হয়ে সিংহাসনে বসে তোমাকে রাজত্ব করতে দেখলে তারা খুশি হবে।'

গেরুয়াকে নিশান করো। গেরুয়া ছিল বলেই কামকাঞ্চন ও বিলাসব্যসন পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্যত্ব হরণ করতে পারেনি।

কিন্তু, সাবধান, গেরুয়ার অহমিকা যেন পেয়ে না বসে।

'কি রকম জানো?' বললেন ঠাকুর। 'ঠিক দুপুরবেলা সূর্য মাথার উপর ওঠে। তখন মানুষটা চারদিকে চেয়ে দেখে, আর ছায়া নেই। তাই ঠিক জ্ঞান হলে, সমাধিস্থ হলে, অহংরূপ ছায়া থাকে না।'

গেরুয়া হচ্ছে সেই সমাধি, সেই সম্যক সম্বোধির রঙ। নইলে গেরুয়া পরে ভাবলে একটা কেষ্ট-বিষ্টু হয়েছি, তাকিয়া না পেলে বসবেনা ঠেসান দিয়ে, তাহলেই সর্বনাশ।

কোনো ভয় নেই, অভয়ের মন্ত্র পেয়েছি আমরা। বললেন বিবেকানন্দ। ভোগে রোগভয়, কুলে চ্যুতিভয়, মানে দৈন্যভয়, বিত্তে রাজভয়, বলে শত্রুভয়, রূপে জরাভয়।

শাস্ত্রে তর্কভয়, গুণে নিন্দাভয়, দেহে যমভয়। এ জগতে সর্ববস্তু ভয়ান্বিত। শুধু বৈরাগ্যই অভয়।

কিন্তু কোথায় যাবে? বলছি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। কাশীপুরের বাগানবাড়ি, যেখানে কোনোরকমে আছ সবাই মাথা গুঁজে, তার ইজারার মেয়াদ মোটে আর সাতদিন।

এতগুলি ঘরছাড়া ছেলের জায়গা দেবে কোথায়? মনে থাকে যেন ঠাকুর এদের সকলের ভার তোমার হাতে সঁপে দিয়েছেন।

২৪

কাশীপুরের বাড়ি এবার ছাড়তে হয়। নোটিশ দিয়েছে বাড়িওয়ালা।

এখন যাই কোথায়? কোথায় মিলবে মাথা গোঁজবার ঠাঁই? ডেরা-ডাণ্ডা কে জোটাবে?

ঠাকুর জোটাবেন।

কোথায়! তার তো-কোনো আভাস-উদ্যোগ দেখিনা। ইজারার মেয়াদ ফুরোতে আর দু'দিন! তারপর গাছতলা।

লাটু, তারক আর বুড়ো গোপাল—এরা তিনজন তো বাড়িঘর ছেড়ে কায়েমী বাসিন্দে হয়েছিল কাশীপুরে, তারা কি তবে ফিরে যাবে? আর যে সব সন্ন্যাসী-শিষ্য নিত্য আসা-যাওয়া করছিল তারা আর হবে না এমুখো? সব ভেস্তে যাবে? কেঁচে যাবে?

'তাছাড়া আবার কি।' গৃহী ভক্তরা উপদেশ দিতে এল। 'এ সব কচি কচি ছেলে পথে-পথে ভিক্ষে করে বেড়াবে? নিরাশ্রয়ের মত পড়ে থাকবে ঘাটে-মাঠে? তার চেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। আখের নষ্ট কোরো না।'

ওদের কথা শুনিসনি। বললে নরেন। ঠাকুরের কথা ভাব্। ঠাকুরের কথা বল্।

অভিভাবকরা নাছোড়বান্দা। কেউ বি-এ পড়ার মাঝখানে কলেজ ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে, তাদের টানতে লাগলেন। পড়া সাঙ্গ করে পরীক্ষা দিয়ে তবে চলে আসিস না হয়। সন্ন্যাসী হবি তো বিদ্বান হতে দোষ কি!

কেউ-কেউ গেল বুঝি ফিরে। পাশ করে আসতে। কিন্তু পাশ করা না পাশ পরা!

যে যাবার যাক। আমরা যাচ্ছি না। আয় সবাই বসি গোল হয়ে। ঠাকুরের কথা ভাবি, ঠাকুরের কথা বলি।

আজ ছাদ, কাল না হয় মুক্ত আকাশ। আমাদের আচ্ছাদনও যিনি অনাবরণও তিনি। আমাদের সর্বত্রই রামের অযোধ্যা।

'সেইবার কি একটা মজার কাণ্ড হল শোন!' নরেন পূর্বকথা বলতে লাগল। আমি চুপচাপ বসে খাচ্ছি, হঠাৎ ঘাড়ের উপর চেপে বসলেন। বসেই সমাধিস্থ

হয়ে গেলেন।'

আবার বললে, 'বলতেন আমার যারা আপনার লোক তাদের বকলেও আবার আসবে। জানো তো, আগে কালী মানতুম না, যা ইচ্ছে তাই বলতুম। একদিন চটে উঠে বললেন, শালা, তুই আর এখানে আসিস না। সেকি তিরস্কার, না, ভালোবাসা। আমার এতটুকু রাগ হল না। আমি তামাক সাজতে বসলুম। তাই দেখে ঠাকুরের কি তৃপ্তি! মাস্টারমশাইকে বললেন, নরেন আমার আপনার লোক, তাকে বকলেও তার রাগ নেই।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'যখন আসে তখনই একটা কাণ্ড সঙ্গে আনে।'

শিশুর মতন হাসলেন ঠাকুর। বললেন, 'ও একটা কাণ্ডই বটে। প্রকাণ্ড কাণ্ড।'

একঘর লোক, এক পাশে গিয়ে বসেছি। সবাইকে ফেলে আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন, আমার সঙ্গেই তাঁর যত কথা। আমি বললুম, সে কি, এঁদের সঙ্গে কথা কন! আমার কথা কানেও তুলতেন না। কাছে ডেকে নিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন।

পরিহাস করে বলতেন, দ্যাখ, একটু বেশি-বেশি আসবি। প্রথম আলাপের পর নতুন পতির মতন একটু ঘন ঘন আসতে হয়।

কিন্তু তেমন আর কই যেতুম। বলতেন, নরেন বেশি আসে না। ভালোই করে। বেশি এলে আমি বিহ্বল হই।

যদু মল্লিকের বাগানে বসে কাঁদতেন আমার জন্যে। সবাই বলত, একটা কায়েতের ছেলে, কি বা ছাই পড়াশুনো, এর জন্যে আপনার অধীর হওয়া সাজে না। ওরে কি বলিস, ওর জন্যে যে আমি দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষে পর্যন্ত করতে পারি।

একদিন গিয়েছি, তখন সেই অস্বীকার আর অবিশ্বাসের অধ্যায়, বলছেন বিরক্ত হয়ে, তুই আমাকে নিসনা, মানিস না, তবু আসিস কেন?

সত্যি আসি কেন? কে কোথাকার গেঁয়ো মুখখু বামুন কালী পেয়েছে কি না পেয়েছে তাতে আমার কী মাথাব্যথা! আমি কেন আমার মধ্যরাত্রির সুখশয্যা ফেলে চলে এসেছি দক্ষিণেশ্বরে? আমি বিশ্বনাথ দত্ত এটর্ণির ছেলে, ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিনিধি, মিল-স্পেন্সার পড়া দার্শনিক, কী আমার আসে যায় একটা কালীঘরের পুরোতের মাথা খারাপ হয়েছে কিনা তাই নিয়ে। আমার কেন মাথা খারাপ হয়? আমি কেন আসি?

সেদিন সেই উত্তর আমাকে দিতে হয়েছিল স্পষ্ট করে। অন্তরের অন্ধকার হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজে বের করতে হয়েছিল সে মুক্তামণি।

বললাম, আসি কেন? আসি তোমাকে ভালোবাসি বলে।

অহেতুক ভালোবাসা, অবিমিশ্র ভালোবাসা। নিরর্গল, নিরঙ্কুশ ভালোবাসা। কোথায় যাব সেই ভালোবাসা ফেলে? একটা রূঢ় উদ্ধত প্রস্তরকঙ্করময় পাহাড় ছিলাম, সেই প্রেমস্পর্শে হয়ে গেলাম একতাল নবনী।

'তাঁর ভালোবাসার কথা আর বোলো না।' এবার সুরু করল লাটু: 'একদিন শিবমন্দিরে বসে ধ্যান করছি, ধ্যান জমে গিয়েছে, আশ-পাশের খেয়াল নেই। ধ্যান

ভাঙতে তাকিয়ে দেখি ঠাকুর পাশে বসে হাওয়া করছেন আমাকে। দেখো দিকি কাণ্ড। পাখা কেড়ে নিতে গেলুম, দিলেন না। বললেন, এ কি আমি তোকে হাওয়া করছি? শিবকে হাওয়া করছি।

আমি একটা কোথাকার কে, কোন বাড়ির চাকর, অপদার্থ অনাথ, আমাকে তিনি ভালোবাসা ঢেলে দিলেন। আমাকে কৃপা না করলে আমি নকরি করতে-করতে বকরি বনে যেতাম। আমায় শুধু বলতেন, দ্যাখ, দিল সাফ রাখবি আর গরদা ঢুকতে দিবিনে। নিজের বুকের উপর হাত রাখতেন। এইখানে সাচ্চা থাকবি। কামকামনা যদি বেশি উৎপাত করে ঈশ্বরের নাম নিবি, তাঁকে ডাকবি প্রাণপণে। তিনিই তোকে বাঁচিয়ে দেবেন। যখন তাতেও মন বসাতে পারবিনে, ছুটে আমার কাছে চলে আসবি।

ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে ঠাকুরের মুখ দেখতুম তারপরে অন্য কাজ। সেদিন তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি নেই। চোখে হাত চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, আপনি কোথায়? যাচ্ছিরে যাচ্ছি। কোথায় ছিলেন ছুটে এলেন আমার ডাক শুনে। এমন করুণা, আমার চোখের দৃষ্টিটি বাঁচিয়ে দিলেন। চোখ মেলে দেখলুম সেই নয়নাতীতকে, নয়নোৎসবকে।

আরেকদিনও অমনি উঠেছিলাম চেঁচিয়ে। ঠাকুর প্রতিধ্বনি করলেন, বাইরে আয়।

বাইরে গিয়ে দেখি কি খুঁজছেন বাগানে।

কি খুঁজছেন?

ওরে কাল একজোড়া নতুন চটি জুতো এনেছিলনা, তার একপাটি রয়েছে আরেক পাটি খুঁজে পাচ্ছিনা—

সেকি? আপনি খুঁজছেন কেন? আর, তাছাড়া এখানেই বা আসবে কি করে?

কি করে বলি? হয়তো শেয়ালে টেনে এনেছে।

যেই আনুক, আপনাকে খুঁজতে হবেনা। বলে উঠলাম ধমকের সুরে, আপনি চলে আসুন।

কি যে বলিস তার ঠিক নেই। অমন নতুন জুতো জোড়া তোর ভোগে এল না। কাল সবে এনে দিল আর—মাত্র একবার পায়ে দিয়েছি।

ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে পড়লুম। বললাম, আপনি চলে আসুন। আপনাকে ওসব খুঁজতে নেই। আমার আজকের দিনটা বিলকুল নষ্ট করে দেবেন না।

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, দিন কি ওতে খারাপ যায়রে? যেদিন ভগবানের নাম নেওয়া হয় না সেইদিনই খারাপ যায়।

ঝড়-জল-বিদ্যুতের দিন দুর্যোগ নয়, হরি-হারা দিনই দুর্যোগ।

এবার তারকের পালা। কি করে তার চিবুক ধরে আদর করেছেন, কি ভাবে টেনে নিয়েছেন কোলের মধ্যে। তাঁর জলের গাড়ুটি পর্যন্ত ধরতে দেননি। যেহেতু আমার বাবা তাঁর গাত্রদাহ কমাবার জন্যে তাঁকে ইষ্টকবচ দিয়েছিলেন সেইজন্যে আমাকে সেবা করতে দিতেন না। বলতেন, তোর সেবা কি নিতে পারি? তোর বাবাকে যে আমি শ্রদ্ধা করি গুরুর মত।

৭

সেবার, এখানে, বামুন নেই কদিন থেকে, নিজেরা পালা করে রান্না করছি। কি বা রান্না, ভাত ডাল চচ্চড়ি। সেদিন আমার পালা পড়েছিল, তোদের মনে আছে? চচ্চড়ির ফোড়নের গন্ধ তাঁর নাকে পেঁচেছে। জিগগেস করলেন, কে রাঁধছে রে? তারকনাথ? তবে একটু আমার জন্যে নিয়ে আয়।

এমনিতে দুধ সুজি সেদ্ধ ছাড়া কিছু মুখে তুলতে পারেন না, কি কৃপা, আমার রান্না চচ্চড়ি সেদিন চেয়ে খেলেন।

হ্যাঁ, শুধু তাঁর কথা বলো। আমাদের অন্য কথায় দরকার কি, কি লাভ বৃথা কথায়। যা বলবে, হিত কথা, মিত কথা, ঋত কথা। যদি কথা বলবার লোক না পাও তাঁর সঙ্গে বলো। সবার মধ্যে তাঁকে সাক্ষাৎকার করো। যদি তাই হয় তবে হরি-কথা ছাড়া ভালোবাসার কথা ছাড়া আনন্দের কথা ছাড়া আর কোন কথা কইবে?

'তাঁকে না দেখে কি করে বেঁচে আছি?' নরেন অস্থির হয়ে উঠল। 'হ্যাঁরে লেটো, যাকে দেখতে না পেয়ে চোখে হাত চাপা দিয়ে থাকতিস, এখন চোখ মেলে কি দেখে শান্ত হয়ে আছিস জিগগেস করি?'

রাত বেশি হয়নি, পুকুরধারে নরেন পাইচারি করছে। সঙ্গে ভক্ত-বন্ধু হরি। বাড়ি-ছাড়ার দিন ঘনিয়ে এল। এবার কি করি, কোথায় যাই।

ভয় নেই। তিনি আছেন। আর আছে জ্বলন্ত বিশ্বাস। প্রচণ্ড বৈরাগ্য। আমরণ প্রতিজ্ঞা।

হঠাৎ দূরে একটা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। চমকে উঠল দুজনে। ঝলসে উঠেই মিলিয়ে গেলনা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মানুষের অবয়ব নিলে। মনে হল জ্যোতির বসন-পরা কে একজন মানুষ যেন নেমে এসেছে আকাশ থেকে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে কই? আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসছে। ফটক পেরিয়ে বাড়ির হাতার মধ্যে চলে এসেছে।

এ কে? ঠাকুর?

সর্বাঙ্গে শিউরে উঠল নরেন। বোধহয় মাথার ভুল। চোখ কচলাল বারকতক। বোধহয় রুগ্ন স্বপ্ন! না, আরো এগিয়ে আসছেন। যেখানে জুঁই ফুলের মঞ্চ সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন স্তব্ধ হয়ে!

'একি! এ কে?' হরিও চমকে উঠল। আঁকড়ে ধরল নরেনকে।

সেই অভয়ময় ভুবনমনোহর হাসি। ললাটে সেই তপস্যার প্রদীপ্তি। দুই পদ্মপত্রবিশাল চোখে বিরামবিহীন করুণা।

দেখে যা দেখে যা সকলে। সিন্ধুকে যে বিন্দু করেছে সেই জাদুকরকে দেখে যা। দেখে যা প্রধান পুরুষোত্তমকে। সর্বমন্ত্রপ্রণেতা সর্বসিদ্ধিপ্রদাতাকে।

সবাই ছুটে এল লণ্ঠন নিয়ে। এখানে-ওখানে ঝোপে-ঝাড়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করল। আর কি তাঁর দেখা পাওয়া যায়!

সেই নির্মল জ্ঞানচক্ষু কজনের আছে! দিগদেশে না পাও দেখ তাঁকে হৃদাকাশে। হৃদাকাশে বোধভানু।

সুরেন মিত্তিরকে দেখা দিলেন স্বপ্নে। বললেন, আমার ছেলেদের একটা ব্যবস্থা

করে দ্যাও। তুমি আমার রসদদার, তুমি আমার জন্যে কত করেছ। কাশীপুরের বাড়ির খরচ বাবদ কত দিয়েছ মাস-মাস। তুমি থাকতে আমার ছেলেরা নিরাশ্রয় হয়ে যাবে? ভিক্ষুকের মত ঘুরে বেড়াবে পথে-পথে?'

ঠিক ঠাকুরের মূর্তি। ঠিক তাঁর কণ্ঠস্বর।

ঘুম ভাঙতেই সুরেন মিত্তির ছুটল কাশীপুরে। ঠাকুরের ছেলেরা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। কি ব্যাপার?

ব্যাপার আর কিছুই নয়। এক বাড়ি যায় আরেক বাড়ি যোগাড় করে দেব। আমি তার ভাড়া যোগাব। আমি একা না পারি চাঁদা সংগ্রহ করব গৃহীদের কাছ থেকে। তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। সেই বাড়িতে তোমাদের মঠ হবে।

'শুধু তোমাদেরই আশ্রয় নয়, আমাদের সংসারীদেরও আশ্রয়।' সুরেনের দুই চোখ ছলছল করে উঠল। 'আমরাও জ্বালা জুড়োতে রোগ সারাতে আসব সেই শান্তির নিলয়ে।'

জয় শ্রীরামকৃষ্ণের জয়। ভক্ত সন্ন্যাসীর দল লাফিয়ে উঠল।

যা অসম্ভব ছিল তাই সহজ-সুলভ হয়ে উঠল। লোভনীয়ই জানতুম এখন দেখছি লভনীয়।

বরানগরে প্রায় একটা জঙগলের মধ্যে নড়বড়ে একটা দোতলা ভাঙা বাড়ি পছন্দ করল সবাই। নিচের তলায় সাপখোপেরা থাকবে উপরের তলায় আমরা। পিছনে যে পাঁকের পুকুরটি আছে সেটিও অনবদ্য। মশার পল্টনী কুচকাওয়াজ চলছে দিবা-রাত্র। দেয়ালের ফোকরে হুতুমপেঁচার আস্তানা। সদর দরজা থুবড়ে পড়েছে, সামনের ঝোলা বারান্দাটিও গেল-গেল।

২৫

তবু এই বাড়িই ভালো। কলকাতার কলুষ-কোলাহলের থেকে অনেক দূরে। নির্জনে থাকা যাবে। কেউ নাক ঢোকাতে আসবে না। কেমন আছি কেমন দিন কাটছে তাও আসবেনা জিগগেস করতে।

বলো কি, ঐ বাড়িতে কি করে থাকবে? কে একজন বাধা দিতে এল। ওটা যে ভূতের বাড়ি। ভূতের ভয় না করো মৃত্যুভয় তো আছে। একদিন ছাদ ভেঙে মারা পড়বে সবাই।

নরেন হাসল। বললে, ভূত আমাদের ভাই। মৃত্যু আমাদের মিতা।

এই বাড়িই স্বর্গ। কাছেই গঙ্গা, কাছেই শ্মশান। যে গঙ্গা ঠাকুরের শান্তি আর যে শ্মশান ঠাকুরের শয্যা।

আর, সব চেয়ে বড় কথা, বাড়িটা শস্তা। মোটে দশটাকা ভাড়া।

আমাদের অট্টালিকা কে দেবে?

আমরা শিবের দৈত্য-দানা।

আমাদের দেখে ভূত পালায়। আমাদের কৃচ্ছ্র দেখে কঠোরতা দেখে। ধারে-কাছে ঘেঁষতেও পারে না। দিবা-রাত্রি, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আরাম-নিদ্রা, ঘৃণা-লজ্জা আচার-বিচার—কত রকমের ভূত। সব তফাৎ থাকে। যখন হর-হর ব্যোম-ব্যোম করে উন্মাদ নৃত্য করি ভূতেরই ভয় হয়।

তাই উপরের বড় ঘরটার নাম হয়েছ দানাদের ঘর। আর যে দুখানা ঘর আছে দুপাশে, একখানা ঠাকুরঘর, আরেকখানা নৈবেদ্যঘর।

সেই দানাদের ঘরেই নবীন সন্ন্যাসীদের থাকা-বসা। ওরে, শুবি কোথায়? এই ঘরেই। চট বিছিয়ে চ্যাটাই বিছিয়ে। চট-চ্যাটাই না জোটে শুকনো মেঝের উপর। বালিশ, বালিশ কোথায়? 'এই যে নরম-নরম বালিশ এনেছি তোদের জন্যে। মাথায় দিয়ে শো।'

পর-পর কখানা ইঁট সাজানো। ইষ্টকই ত্যাগতেজস্বী সন্ন্যাসীদের উপাধান।

শুধু শোবার-থাকবার ব্যবস্থা করলেই তো চলবেনা, খেতে হবে তো? দেহটাকে রাখতে হবে তো টিঁকিয়ে।

ভাত জোটে তো নুন জোটেনা। নুন-ভাত জুটলেই রাজভোজ। শুধু নুন-ভাত? একটা কিছু তরকারি জোটে না? তোদের ভাগ্য ভালো, জুটেছে একটা না-চাইতেই। বাড়ির জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে ঐ দ্যাখ্ তেলাকুচো। তার গোটাকতক পাতা ছিঁড়ে এনে সেদ্ধ করে নে। তেলাকুচো পাতা সেদ্ধ আর নুন-ভাত—এ রাজ-ভোজের চেয়েও বেশি, অমৃতভোজ। তাই চালিয়ে যা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

'ওরে আঙুল টাকনা দিয়ে খা।' বললে বিবেকানন্দ।

থাকা-খাওয়া হল—পরা?

একটা করে কৌপীন আর একটু করো গেরুয়ার কানি। উপর গায়ে? মুক্ত হাওয়া। না, একখানা চাদর আছে। প্রত্যেকের একখানা করে নয়, সকলের জন্যে একখানা। দড়ির উপর টাঙানো আছে, যে যখন বাইরে যাচ্ছে টেনে নাও গায়ের উপর।

কষ্ট? কষ্টেরও এখানে আসতে কষ্ট হবে। দুঃখ? দুঃখ দুঃখিত হয়ে চলে গেছে অনেকদিন।

একটা নতুন আনন্দের মধ্যে চলে এসেছে সবাই। জপধ্যানের নামনৃত্যের আনন্দ। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে যাব এই বিস্ময়কর প্রতিজ্ঞার আনন্দ। এমন একটা আনন্দ যে সবাই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। সেই আশ্চর্যময়তার মধ্যে কে তাকায় থাকা-পরার দিকে, কে নেয় ভাত-নুনের হিসেব?

আর আছে একটা তানপুরা।

জাগো জাগো সবে অমৃতের অধিকারী। ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে গান ধরে বিবেকানন্দ। সহপন্থীরাও সুর মেলায়। তারপর সারাদিন নানা কর্মে নানা ধ্যানে সেই সুর, সেই সুখ, সেই দীপনা-প্রাণনা।

চল আঁটপুরে যাই। বাবুরামের মা ডেকেছেন আমাদের।

হরিপাল পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে সেখান থেকে ছ্যাকড়া গাড়ি। পায়ে হেঁটে যেতে হলেও যাব। মা ডেকেছেন। সঙ্গে তানপুরা আছে। গান ধরো সকলে—শিবশঙ্কর ব্যোম ব্যোম।

বাবুরামের মা তো আনন্দে দিশেহারা। ঠাকুরের ছেলেরা এসেছে। অমৃতের সন্তান। ত্যাগযজ্ঞের হোমশিখা।

মা, আমরা দশজন এসেছি। শুধু লাটু আর যোগেন রয়েছে এখনো বৃন্দাবনে। আর রাখাল, কেন কে জানে, ধরতে পারেনি ট্রেন। তোমাকে আগে কিছু খবর দিতে পারিনি। ভরদুপুরে চলে এসেছি আচমকা। হেঁশেল আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, আমরা নিজেরাই রান্না করে নিচ্ছি।

মা কি সে কথা কানে তোলেন? তোমাদের কাউকে হাত লাগাতে হবেনা। তোমাদের দশজনের জন্যে আমি একাই দশভুজা।

আমরা এখানে চড়ুইভাতি করতে আসিনি। আমরা এখানে সন্ন্যাস নিতে এসেছি। রূপান্তরপরিগ্রহের ভূমিকা নির্মাণ করতে।

খিড়কি পুকুরের ধারে তেঁতুল গাছের কটা কুঁদো পড়ে আছে। তাই দিয়ে পূজার দালানের পাশে ধুনি জ্বালানো হল। ধুনির চারদিকে, আয়, গোল হয়ে বসি আমরা দশজনে। এ আগুন কাঠের নয়, আমাদের অধ্যাত্মজীবনের, আমাদের অনির্বাণ ঊর্ধ্বপ্রত্যাশার। এ কাঠ পুড়ছেনা, পুড়ছে আমাদের বন্ধনআবর্জনা। আর এই যে দীপ্তি এ আমাদের বিপাপ বৈরাগ্যের।

'ঈশ্বরোপলব্ধিই আমাদের জীবনের সাধনা। কি করে মানুষ তৈরি করব যদি না নিজেরা মানুষ হতে পারি? আর যার মধ্যে যতখানি ঈশ্বরবিকাশ তার ততখানি মনুষ্যত্ব।' নরেন ঘোষণা করল বজ্রকণ্ঠে। 'এই প্রজ্বলিত অগ্নি স্পর্শ করে আয় শপথ করি সকলে, আমরা মানুষ হব। হব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি।'

প্রত্যেকেই যেন একটা দীপতাপপ্রদ অগ্নিভাণ্ড, প্রত্যেকেই যেন অনুভব করতে লাগল। প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের আশ্রয়, প্রত্যেকের উৎসাহ। প্রত্যেকেই শ্রীরাম-কৃষ্ণের ক্ষয়হীন বিদ্যুৎভাণ্ডার। যেন এক দেহ এক মন এক আত্মা। এক প্রেমের প্রসন্নপ্রবল প্রস্রবণ।

চিত্তশুদ্ধ করে নাও অগ্নিস্নানে। যদি চিত্তশুদ্ধ না হয় তাহলে ত্রিদণ্ডধারণ, মৌনাবলম্বন, জটাভারবহন, শিরোমুণ্ডন, বঙ্কলাজিনপরিধান, ব্রতচর্যা, অগ্নি-হোত্রানুষ্ঠান অরণ্যবাস ও শরীরশোষণ—সমস্তই নিষ্ফল। চিত্তশুদ্ধি না হলে সেবা করবে কি করে? পীড়িতকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষিতকে পানীয়, ক্ষুধিতকে ভোজন ও অভ্যাগতকে নয়নমন প্রিয়বচন দানই সেবা।

উত্থিত হও, উদ্বুদ্ধ হও, যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনের চরম বর পরম সম্বোধি না লাভ করতে পারো নিবৃত্ত হয়োনা। অগ্নির অক্ষরে সই করো প্রাণের প্রতিজ্ঞাপত্র।

উপরে খোদিত স্ফুলিঙ্গাকীর্ণ স্তব্ধ আকাশ, নিচে এই মানুষের হাতে জ্বালানো অগ্নিকুণ্ডের ঊর্ধ্বশিখ অভ্যর্থনা। চারদিকে অক্ষয় প্রশান্তি! অগ্নিকুণ্ড

ঘিরে বসেছে বন্ধুরা। বসেছে ধ্যানাবিষ্ট হয়ে। স্তব্ধতায় এককেন্দ্রিক হয়ে।
কতক্ষণ কেটে গেল রাত কে জানে। নরেন হঠাৎ চোখ খুলল। বলতে লাগল
যীশুখৃষ্টের কথা। তার জন্ম তার মৃত্যু তার পুনরুত্থানের কথা। এই পৃথিবীর
নবীন-সঞ্জীবনের জন্যে আমাদের হতে হবে যীশুখৃষ্ট। জীবকষ্টের কাষ্ঠফলকে
প্রাণ উৎসর্গ করে যাব যাতে সেই মৃতকাষ্ঠে ফুটতে পারে আনন্দের অরুণমঞ্জরী।

ঈশ্বরের সামনে, পরস্পরের সামনে এই আজ আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক, আমরা
সন্ন্যাসী হব। ঈশ্বরানুভবের আনন্দ বিতরণ করব দিকে দিকে। সেই আমাদের
লোককল্যাণ। মানুষ যে ছোট নয়, মানুষ যে এখানে বয়ে যেতে আসেনি শোনাব
সেই আত্মার গভীরগুহার প্রতিধ্বনি।

বরানগরের মঠে ফেরবার কালে চল একবার যাই তারকেশ্বর।

জয় শিব ওঁকার, জয় শিব ওঁকার, হর হর মহাদেব। হে চন্দ্রচূড়, হে মদনান্তক
শূলপাণি, হে স্থাণু, হে গিরীশগিরিজেশ, হে ভীতভয়সূদন ভূতনাথ, সংসার-
দুঃখগহন থেকে রক্ষা করো আমাকে। হে ভস্মভূষিতাঙ্গ, হে সর্পোপবীতী
ললাটাক্ষ, হে সর্ববিশ্বৈকজেতা বীরেশ্বর, আমার মধ্যে আবির্ভূত হও। হে
সদ্যোজাত হে সর্বেশাতিশয়, সর্বদা আমাতে অবস্থান করো।

মঠে ফিরে চল এবার। দ্যাখ সবাই এল কিনা। হরি এসেছে, সুবোধ এসেছে,
গঙ্গাধর এসেছে। রাখালও চলে এসেছে সংসারের দড়ি টপকে। বৃন্দাবন থেকে
লাটু আর যোগীনও এসে হাজির। ওয়া গুরুজীকি ফতে। জয় গুরুমহারাজজীকি
জয়।

ওরে বৃন্দাবন থেকে তিলকমাটি এনেছিস, দে আমাকে বষ্টুম সাজিয়ে দে।
নরেন ভাবলে খানিকটা লঘু পরিহাস করেনি। দে ঝুলি মালা দে। নিতাই
ঠক-ঠক করি।

সর্বাঙ্গে ছাপতিলক কেটে হাতে ঝুলি মালা নিয়ে নরেন চোখ বুজে জপ
করতে লাগল, নিতাই ঠক-ঠক, নিতাই ঠক-ঠক।

তার ভাবভঙ্গি দেখে আর সকলের তো হাসির অট্টরোল।

অনেক দিন হাসিনি পেট ভরে। নে, আয় এখন একটু কীর্তন করি। খোল-টোল
নিয়ে আয়।

তারপরে বিদ্রূপের ভান করে নরেন নাকী সুরে গান ধরল : নিতাই নাম
এনেছে, নাম এনেছে, নাম এনেছে রে—

হাসতে হাসতে আর সকলে ধুয়ো ধরল। যেন কি একটা হাসির ব্যাপার।
নাচতে লাগল কেউ কেউ।

এ কি! নরেন যে দরদরধারে কাঁদছে।

কোথায় হাসির হুল্লোড়! এ যে দেখি নামপ্রেমের অমৃতপিন্ড। প্রথম
ঝাপটাটা কেটে যেতেই গলতে সুরু করেছে। অভ্যাসের শুষ্ক কোটর থেকে শুরু
হয়েছে অনুরাগের মধুক্ষরণ।

বন্ধুরা প্রথমে নির্বাক হয়ে গেল। পরে সেই গভীরস্পর্শে তারাও উদ্দীপ্ত

হয়ে উঠল। গলে যাবার ঢেলে দেবার উদ্দীপনা।

বেলা বারোটা থেকে সুরু করে একটানা পাঁচটা পর্যন্ত। প্রকাণ্ড ভিড় জমেছে বাইরে। শান্ত হয়ে তদ্গত মনে শুনছে সেই নামকীর্তন।

এবার বিরজা হোমের অনুষ্ঠান করো। বিধিমত বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে। ঠাকুরের পাদুকার সামনে এই হোম। ঠাকুর গেরুয়া দিয়ে গিয়েছেন এবার সে গেরুয়া বসন না হয়ে নিশান হয়ে উঠবে। কৌপীনবান না সৌভাগ্যবান।

"কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।"

বেদান্তবাক্যে যার সদানন্দ, ভিক্ষান্নমাত্রে যার পরিতুষ্টি, অন্তরে যার অশোক, চরাচরে যে একচর, সেই তো সৌভাগ্যবান। স্বানন্দভাবে যার অবস্থান, যে সুশান্ত-সর্বেন্দ্রিয়, অহর্নিশ যে হরিরসমদিরা পান করে, ব্রহ্মেই যার স্থায়ী স্থিতি সেই দেহে-চিত্তে প্রসন্ন সমুজ্জ্বল।

একদিকে বুদ্ধের তপস্যা ও দার্ঢ্য, অন্যদিকে আবার শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তি। তার সঙ্গে মেশাও শঙ্করের অদ্বৈতজ্ঞান। আমিই ব্রহ্ম, সেই উর্জস্বল বিভাবনা। কিন্তু একসঙ্গে সব যেখানে এসে মিশেছে সেই শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাকুলতা কই? চোখের সামনে এত দেখলাম এত ছুঁলাম কিন্তু কই সেই ত্যাগ আর সাধনা, সেই জ্ঞানচক্ষু, সেই ধ্যানমন্থন, সর্বোপরি সেই অনিমেষ ভালোবাসা, সেই ক্ষমা আর শান্তি, সেই আশ্চর্য ভাবসমাধি!

আগুন যেমন বাতাসকে ডেকে আনে তেমনি আমাদের বিশ্বাস ডেকে আনবে ব্যাকুলতাকে। যদি সম্যক ন্যাস বা নির্ভর করতে পারি ভগবানকে, তিনি দেখা দেবেন ধরা দেবেন। দম্ভের স্তম্ভ বিদীর্ণ করে প্রকাশিত হবেন নরসিংহ।

হোমের পর সন্ন্যাস নিল সকলে। গুনে-গুনে পনেরো জন। নতুন আশ্রমে এসে জন্মান্তরের সঙ্গে-সঙ্গে নামান্তর ঘটল। নরেন বিবেকানন্দ, রাখাল ব্রহ্মানন্দ, বাবুরাম প্রেমানন্দ। তারক হল শিবানন্দ, শরৎ হল সারদানন্দ, হরি তুরীয়ানন্দ। যোগানন্দ যোগীন, অভেদানন্দ কালী, অখণ্ডানন্দ গঙ্গাধর। লাটু অদ্ভুতানন্দ, শশী রামকৃষ্ণানন্দ, বুড়োগোপাল অদ্বৈতানন্দ। নিরঞ্জনানন্দ নিরঞ্জন, সুবোধানন্দ সুবোধ, ত্রিগুণাতীতানন্দ সারদাপ্রসন্ন।

ভাঁড়ারে আজ এককণাও চাল নেই। ভিক্ষায় বেরিয়েও একমুঠো জুটলনা। না জুটুক, কীর্তন জুড়ে দাও। অবসাদকে অবসন্ন করে দেব। ঈশ্বরের নামে ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হয়ে যাবে। মৃত্যুকেও মনে হবে অমৃততুল্য।

সবাই কীর্তনে মেতে উঠল। শশী আস্তে-আস্তে সরে গেল দল থেকে। এরা তো নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলতে চায় কিন্তু এদিকে ঠাকুর যে উপবাসী। এক কণা চাল না পেলে ঠাকুর যে থাকেন আজ অনশনে। তাঁকে কী দিয়ে ভোলাব?

বেদনায় দগ্ধ হতে লাগল শশী। ঠাকুর, তোমার মুখে দেবার জন্যে এক মুঠো অন্নেরও কি আজ সংস্থান হবে না?

পাশের বাড়ির ছোকরাটি বন্ধুস্থানীয়। কিন্তু তাদের বাড়ির সকলেই সন্ন্যাসীদের উপর খাপ্পা। জোয়ান-জোয়ান ছেলে ভিক্ষে করে, সারাদিন দাপাদাপি

করে, কীর্তন করে, পড়ে-পড়ে ঘুমোয়, এরা দৈত্য-দানা ছাড়া আর কি।

তবু সেই ছোকরাটিকেই নির্জনে ডেকে নিল শশী। ভাই, ভিক্ষেয় আজ কিছুই পাওয়া যায়নি। আমাদের ঠাকুর উপোস করে আছেন। কিছু আলো চাল দুটো আলু আর এক ছিটে ঘি দিতে পারবে?

কঠিন কোমল হয়ে গেল। পোয়াটাক চাল কটা আলু আধ ছটাকটাক ঘি পৌঁছে দিয়ে গেল ছেলেটি।

জয় শ্রীরামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণানন্দ আনন্দে অন্নভোগ ঠাকুরকে নিবেদন করল। অন্নপ্রসাদ চটকে নিয়ে ছোট-ছোট পিণ্ড তৈরি করে নিয়ে গেল দানাদের ঘরে। দানারা সবাই তখন হরিনামে উন্মত্ত কীর্তনে বিভোর। হাঁ করো, ঠাকুরের প্রসাদ এনেছি। এক-এক দলা চটকানো ভাত সকলের মুখে দিতে লাগল একে-একে। এ অমৃত কোথায় পেলে ভাই?

অমৃতলোক থেকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

২৬

চরম কৃচ্ছ্র চলছে বরানগরে, প্রজ্জ্বলিত তপস্যা, একদিন দেখা গেল সারদা-প্রসন্ন, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মঠে নেই।

কি হল, কোথায় গেল?

অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল সারদা একখানা চিঠি রেখে গেছে। কি লিখেছে চিঠিতে? পড়ে শোনা।

'পায়ে হেঁটে চললুম আমি বৃন্দাবন। এখানে থাকা আমার পক্ষে আর নিরাপদ নয়। কখন আবার মনের গতি বদলে যায় ঠিক নেই। মাঝে-মাঝে বাড়ি-ঘরের স্বপ্ন দেখি, সে সব মায়ার মূর্তিতে মন নরম হয়ে পড়ে। দু-দুবার হেরে গেছি, দু-দুবার ফিরে গেছি বাড়িতে। আর হার স্বীকার করতে পারবনা, তাই এবার দীর্ঘ পথে, দূর পথে বেরিয়ে পড়লাম।'

নরেন অস্থির হয়ে উঠল। সারদা যে নিতান্ত ছেলেমানুষ। কে তাকে পথ বলে দেবে, কে দেবে তাকে আশ্রয়, খিদের সময় একমুঠো শাকান্ন?

রাখালের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল : 'রাজা, তুই ওকে যেতে দিলি কেন?'

রাখাল তার কি জানে! কখন এক ফাঁকে সরে পড়েছে নজর এড়িয়ে। যে যাবেই তাকে রুখবে কে? নদী-পর্বত তার পথ ছেড়ে দেবে, গহন অরণ্য তার জন্যে রচনা করবে আশ্রয়-আরাম। রুক্ষ মরুপ্রান্তরেও তার জন্যে সরল সরণি।

রাখাল ঢোঁক গিলল। বললে, 'আমারও তো বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছে।'

'তোমারও?' নরেন ভয়ে আঁতকে উঠল।

'হ্যাঁ, এখানে বড্ড ভিড়, গোলমাল। আমার একটু সুদূর নির্জনে যাবার ইচ্ছে।' রাখাল তাকাল গভীর দৃষ্টিতে : 'এই ধরো নর্মদার তীরে।'

'তবে তাই যাও, বেরিয়ে পড়ো। বসে আছ কেন?' নরেন ঝাঁজিয়ে উঠল: 'ভেবেছ ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ালেই ঈশ্বরের দেখা পাবে? ঈশ্বর তো বরানগরে নেই, তিনি আছেন নর্মদায়! যা হোথায় থাকতে পারে তা আর হেথায় থাকতে পারে না?'

কোথায়? কোথায় ঈশ্বর?

একদিন এই প্রশ্ন নিয়েই নরেন সম্মুখীন হয়েছিল ঠাকুরের। ঠাকুর বলে দিয়েছিলেন, সর্বঘটে ঈশ্বর। সেই প্রশ্ন নিয়েই এক জিজ্ঞাসু ভক্ত উপস্থিত হল নরেনের কাছে। প্রশ্ন করল, 'কোথায় ঈশ্বর?' নরেন বললে, 'আত্মঘটে। হৃদ্দেশে। তোমার নিজের বুকের মধ্যে।'

'কিন্তু কিছুই তো বুঝি না।'

'তুমি কি করে বুঝবে! কীটাণুকীট, তোমার কী সাধ্য তাঁর মহিমা বোঝো। ব্যাকটিরিয়ার সাধ্য কি ডাক্তারকে বোঝে! পরমাণুপুঞ্জের মধ্যে এক পরমাণু এই পৃথিবী, তার মধ্যে তুমি! কার তুমি ইয়ত্তা করবে?'

'তবে উপায়?'

'উপায়? উপায় আত্মসমর্পণ। উপায় সর্ববিসর্জন। উপায় শরণাগতি।'

'কি করে আত্মসমর্পণ করব?'

'শুধু নাম করে। শুধু তাঁকে ডেকে। হৃদয়ের সমস্ত সুরটুকু তাঁকে নিবেদন করে।'

'তিনি কি তবে আমাকে নেবেন?' যুবক ভক্ত আকুল চোখে তাকাল নরেনের দিকে: 'তবে কি তিনি আমাকে দয়া করবেন? তিনি কি দয়ালু?'

'তিনি কৃপার পারাবার। কৃপার মৌশুমি হাওয়া।'

'তার প্রমাণ কি?'

'তার প্রমাণ তোমার নিজের করুণামাখানো মুখখানি।' নরেন বন্ধুর হাত ধরল: 'তোমার বুকে যদি কোনো করুণা থাকে সে তো তাঁরই করুণা। তোমার বুকে যদি কিছু স্নেহ থাকে তা তো তাঁরই স্নেহ।'

যমেবৈষঃ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। ঈশ্বর যাঁকে কৃপা করেন তিনিই তাকে লাভ করেন। কাকে কৃপা করবেন? সে তাঁর খেয়াল। তুমি দেখ ঈশ্বরের প্রতি একটু ভালোবাসা আসে কিনা! ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার নামই ভক্তি। ভক্তির আরেক নাম "ইতর-বৈতৃষ্ণ্য-রূপিণী।" ঈশ্বর ছাড়া অপর সর্ববস্তুতে যখন বিতৃষ্ণা জন্মে তখনই দেখা দেয় বিশুদ্ধা ভক্তি। সুতরাং সেই ভক্তি আসে বৈরাগ্য থেকে। তাই প্রার্থনা করো, হে ঈশ্বর, আমাকে বিষয়বিমুখ করো, আমাকে দাও তোমাকে একটু ভালোবাসবার অধিকার।

গঙ্গাধর, অখণ্ডানন্দ মহারাজ, চলল তিব্বতের দিকে। বৃন্দাবন থেকে একবার ঘুরে এসেছে কালী—অভেদানন্দ—সে এবার চলল পুরী। একা নয়, সঙ্গে শরৎ মানে সারদানন্দ আর বাবুরাম মানে প্রেমানন্দ।

সবাই চললি?

হ্যাঁ, যত বড়ই সাধনার কেন্দ্র হোক বরানগর ও যেন সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। এর চারপাশে পরিচিত প্রতিবেশী, জুটে যায় এটা-ওটা সাহায্য। উপোস করে দরজা বন্ধ করে পড়ে আছি, হঠাৎ কোনো চেনাজানা লোক পাঠিয়ে দিল খাবারের থালা। তাদের কানে খবরটা গিয়েছিল বলেই না তারা করুণাপরবশ হয়েছিল! এমন এক জায়গায় চলো যেখানে তোমার আত্মীয়-পরিচিত কেউ নেই, তুমি উপোস করে আছ কি না আছ সে খবর কানে নেবার কারু আগ্রহ নেই বিন্দুমাত্র। তবে সেখানেই দেখব ভক্তের জন্যে প্রসাদ পাঠান কিনা ভগবান। বুঝব সত্যিই তাঁর করুণা কতখানি।

'তুই, তুই যাবিনা শশী?' রামকৃষ্ণানন্দকে জিগগেস করল নরেন।

'আমি আবার কোথায় যাব?' শশী একেবারে আকাশ থেকে পড়ল।

'বা, এই যে সবাই তীর্থে যাচ্ছে, কেউ বিন্ধ্য কেউ হিমালয় কেউ শ্রীক্ষেত্র—তুইও বেরিয়ে পড় এই সঙ্গে। তুই চলে যা দক্ষিণে।'

'কোন দুঃখে?' শশী ঘুরে দাঁড়াল : 'এই মঠের জিম্মায় ঠাকুরের পূতভস্ম, তাই এই মঠই আমার সারতীর্থ, দক্ষিণেশ্বরই আমার তীর্থেশ্বর। আমি আমার ঘাঁটি ছাড়বনা কিছুতেই।'

মঠের শিরদাঁড়া হচ্ছে শশী, তাকে কিছুতে বাঁকানো গেল না। নিষ্ঠায় সে নিয়তাত্মা।

সবাই যদি চলে যায়, আমি কেন বসে থাকি? আমার কেন এত মায়া? সন্ন্যাসী হয়ে শেষকালে কি সন্ন্যাসী ভায়েদের মায়ার জড়িয়ে পড়ব? মায়ের পেটের ভাই-বোনেরা তবে কী দোষ করেছিল? লোহার হোক সোনার হোক শৃঙখল শৃঙখল। শৃঙখলকে ছিন্ন-দীর্ণ করতে হবে।

শিব শিব শিবভোঃ, শ্রীমহাদেব শম্ভো।

বেরিয়ে পড়ল নরেন।

পরনে গেরুয়া কাপড় গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, হাতে কমণ্ডলু আর দণ্ড, ভিক্ষায় বেরিয়েছে কোন রাজপুত্র। রূপে রতিপতি তেজে দিনপতি এ কে উধর্বশিখ হুতাশন। চোখে জাগ্রত জ্ঞান মুখভাবে ভক্তির বিনম্রতা! দীপ্তবিশালনেত্র গম্ভীর-বলবাহন এ কে প্রশান্ত পুরুষ! যে দেখে সেই অবাক হয়ে থাকে। যদি কেউ বা নিজের অজানতে কিছু সম্বোধন করে বসে, সনমস্কার উত্তর হয় : 'নারায়ণো হরিঃ।'

প্রথমেই চলে এল কাশী। কাশী সর্বপ্রকাশিকা। গহনগাহিনী গঙ্গা, বীরেশ্বর বিশ্বেশ্বরের মন্দির, কিছু দূরে মহামূর্তি সারনাথ। এখানেই এসেছিলেন বুদ্ধদেব, এসেছিলেন শঙ্করাচার্য, এসেছিলেন রামকৃষ্ণ। নাও এখানকার বায়ুস্পর্শ, ধূলিস্পর্শ, সলিলস্পর্শ। শুদ্ধ হও উজ্জ্বল হও লাবণ্যমনোহর হও। উদারধী প্রসন্নধী হও। হও সূর্যবীর্যসমুদ্ভব।

রাস্তায় কতগুলো বানর তাড়া করল স্বামীজিকে। ভয় পেয়ে ছুটতে লাগল স্বামীজি। হয়তো মনে হল পলায়নেই মুক্তি। পলায়নেই পরা সুধা। যত ছোটে ততই বানরের দল তেড়ে আসে।

সহসা কে হুঙ্কার করে উঠল : থামো, পালিয়ো না। ফিরে দাঁড়াও, রুখে দাঁড়াও, দাঁড়াও বুক ফুলিয়ে!

যেন দৈববাণী হল। কে যেন সবলে দাঁড় করিয়ে দিল স্বামীজিকে। বিপদের সামনে দৃঢ়পদ করে দিল।

আর যায় কোথা! বানরের দল লেজ গুটোলো। চোঁচা চম্পট দিলে।

সুতরাং, ফিরে দাঁড়াও, দাঁড়াও সাহসবিস্তৃত বক্ষ মেলে, দৃঢ়বদ্ধপরিকর হয়ে। যত বড় বাধা তত বড় উৎসাহ। মহাবিঘ্নে মহোৎসাহ। ভয়ের সামনে দাঁড়াও, দাঁড়াও কাপট্যের সামনে। শুধু সম্মুখীন হও। অজ্ঞানের, আলস্যের, অনিশ্চয়তার। সমক্ষ-সঙ্ঘাত করো। দাঁড়াও জীবনের মুখোমুখি। যা কিছু ভয়াবহ তোমার বীর্যে তোমার সামর্থ্যে তাকে তুমি জয়াবহ করো। এড়িয়ে যেওনা, পেরিয়ে এস। পাশ কাটিয়ে যেওনা, অন্তস্তল ভেদ করে সোজা বেরিয়ে এস তীক্ষ্ণ তরোয়ালের মত।

আত্মদীপ হও। উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং। নিজেকেই নিজে উদ্ধার করো। নিজেই নিজের ধাতা-ত্রাতা-মহাদাতা।

তুমি ছাড়া আমার কে আছে? আমি আছি। কেননা তুমিই আমি।

তাই বলো, আমি ছাড়া আমার কে আছে?

কাশীতে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে দেখা করল স্বামীজি। ত্রৈলঙ্গ স্বামী কথা কননা, যদি কখনো নিতান্ত দরকার হয় ইশারায় উত্তর দেন। আছেন অখণ্ড মহামৌনে। অনুভবসিদ্ধ অবস্থায়। অচলপ্রতিষ্ঠ ধ্যানের সমুদ্রের মত।

প্রণাম করে দাঁড়াল স্বামীজি। কোনো কথা কইল না। শুধু ভাবল এঁরই কাছে একদিন এসেছিলেন রামকৃষ্ণ। জিগগেস করেছিলেন, 'জীব আর ব্রহ্ম কি আলাদা?' ত্রৈলঙ্গ স্বামী ইশারায় বলেছিলেন, 'যতক্ষণ ভেদবোধ আছে ততক্ষণ আলাদা। যেই ভেদবোধ দূরে যাবে অমনি এক।'

বহুর মধ্যে এককে দেখা, আপাতভিন্ন প্রতীয়মান বাহ্যজগতের মধ্যে একত্ব আবিষ্কার করা, সেই সাধনাই জীবনসাধনা। মুক্তি সৃষ্টির নয় মুক্তি দৃষ্টির। কি করে চোখের ধাঁধা ঘুচে যাবে মনের দ্বন্দ্ব মুছে যাবে তারই জন্যে অন্তরের আগুনে নিজেকে তপ্ত করা। আর যা তপ্ত করে তাই তপস্যা।

শুধু একজনই আছেন। বলছেন স্বামীজি। যিনি একমাত্র সত্তা, জন্মমৃত্যু-বর্জিত, সর্বব্যাপী, সর্বাংশস্পর্শী। তিনিই একমাত্র আত্মা, একমাত্র পুরুষ। তাঁরই আদেশে আকাশ ছড়িয়ে আছে দিকদেশ আচ্ছন্ন করে, তাঁরই আদেশে বাতাস বইছে, আগুন জ্বলছে, অঙ্কুর মৃত্তিকার বাধা বিদীর্ণ করে উদ্গত হচ্ছে। তাঁরই আদেশে সর্বত্র এই প্রাণরঙ্গ। তিনিই সমস্ত প্রকৃতির ভিত্তিস্বরূপ। তিনি তোমারও ভিত্তিভূমি। সুতরাং, সন্দেহ কি, তুমিই তিনি। তুমি আর তিনি অভগ্ন, অচ্ছিন্ন, অব্যবহিত। যেখানেই দুই সেখানেই ভয় সেখানেই দ্বন্দ্ব। যখন সবই এক তখন তুমি কাকে ঘৃণা করবে কাকে আঘাত হানবে? কার সঙ্গে তোমার যুদ্ধবিগ্রহ? যখন অনেক দেখছ তখনই জানবে তুমি রয়েছ অজ্ঞানে, যখন দেখবে তুমিই সেই সর্বাত্মা নিত্যপুরুষ তখনই তুমি মুক্ত, পূর্ণ, পরমপ্রসন্ন। এ ছাড়া মুক্তির কোনো অর্থ নেই,

নেই যা পূর্ণতার উপলব্ধি। তুমিই সেই ঈশ্বর। সুতরাং চারদিকে মানুষ না দেখে ঈশ্বরকে দেখ।

আগ্রা হয়ে বৃন্দাবনের দিকে চলেছে স্বামীজি। চলেছে পায়ে হেঁটে। একটা কানাকড়িও সঙ্গে নেই। পথের ধারে কোথায় তার জন্যে একটু বিশ্রামের ছায়া পাতা কে বলে দেবে!

চলেছে তো চলেইছে। শ্রান্তিতে-ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে সর্বদেহ। কি করি, কোথায় যাই!

দেখতে পেল পথের ধারে গাছতলায় বসে কে একটা লোক তামাক খাচ্ছে। কলকে থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। লোকটার মুখে প্রগাঢ় তৃপ্তি। যেন তার শরীর থেকে মুছে যাচ্ছে সমস্ত দিনের পুঞ্জিত অবসাদ।

আহা, যদি পেতাম এমনি এক ছিলিম তামাক। স্বামীজি দাঁড়াল একমুহূর্ত। একটি সুখটানে মুছে যেত সমস্ত পথশ্রম?

'ভাই তোমার কলকেটা একটু দেবে? একটা টান দিই—' স্বামীজি হাত বাড়াল।

লোকটা তাকাল স্বামীজির দিকে। উদারদর্শন গৌরকান্তি পুরুষ—দেখে কেমন ত্রস্ত-লজ্জিত হল। কুণ্ঠিত হয়ে বললে, 'মহারাজ, আমি ভাঙ্গি, আমি মেথর।'

প্রসারিত হাত সংবৃত করল স্বামীজি। মেথরের উচ্ছিষ্ট কলকে কি করে মুখে দিই!

আরামের মুখে ছাই দিয়ে ফিরে চলল স্বামীজি। এগিয়ে চলল। কি হবে আমার সুখে-আরামে? অপরিমেয় দুঃখই আমার সুখ। অনপনেয় ক্লান্তিই আমার আরাম।

খানিকটা পথ এগিয়ে এসে থেমে পড়ল স্বামীজি। এ কি, আমি সন্ন্যাসী না? আমি না সমস্ত সংসারশৃঙ্খল ছিন্ন করেছি, ছিন্ন করেছি সমস্ত সংস্কারজঞ্জাল? এই আমার সর্বভূতে অভেদদর্শন?

নয়ন উন্মীলন করে সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন কর। এই যে মেথর এও সেই ঈশ্বর ছাড়া কেউ নয়। কাকে তুমি ঘৃণা করছ? কাকে তুমি অবজ্ঞা করে পরিহার করলে? তুমি তাকে ছোট করে দেখছ বলেই সে ছোট নয়। তুমি জিনিসকে হলদে দেখছ বলেই তা হলদে নয়। সূর্য সূর্যই আছে শুধু তোমার দেখবার ভুল। আর এই দেখবার ভুলের জন্যেই তোমার যত দুঃখ। শাশ্বত সুখ কার? যিনি এক, একমাত্র, যিনি সকলের নিয়ন্তা, সকলের অন্তরাত্মা, যিনি একরূপকে বহুধা করছেন বিচিত্র করছেন, তাঁকেই যে দেখছে অহরহ, অন্তরে আর বাহিরে—তার। যিনি অনিত্যের মধ্যে নিত্য, চেতনের মধ্যে জাগ্রত, যিনি একাকী হয়েও সকলের কাম্যবস্তু বিধান করছেন তাঁকে যে দেখে, দেখতে শেখে, তারই অচ্ছেদ শান্তি। যার চোখ আছে সে দেখ, যার কান আছে সে শোনো। তুমি সন্ন্যাসী, তুমি কি অন্ধ তুমি কি বধির? যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি। এ কথা ঘোষণা করোনি গুঞ্জরণ করোনি অনুভবের গভীরে? তবে কেন ফিরে এলে? তোমার মধ্যে ঐ যে পুরুষ রয়েছেন সে আমিই। বলো আরেকবার বলো।

ফিরল বিবেকানন্দ।

লোকটার কাছে এসে বললে, 'ভাই, আমাকে শিগগির এক ছিলিম তামাক সেজে দাও।'

'মহারাজ, আমি যে মেথর।'

'কে বললে? তুমি নারায়ণ। তুমি আমার সহোদর।'

'কিন্তু এ তো তামাক নয়, এ বড়ো-তামাক।'

'তা হোক। তুমি দাও আমাকে কলকে ধরিয়ে।'

কিছুতেই নিবৃত্ত হল না সন্ন্যাসী। ভরাট কলকে টানতে লাগল তৃপ্তিতে।

ঘটনাটা কানে গেল গিরিশের। সে বললে, 'বিশ্বাস করিনা।'

'কি বিশ্বাস করিসনে?'

'তুই গাঁজাখোর, তোর অমনি নেশা করবার মন হয়েছিল, তাই গাঁজার কলকে দেখে সখ করে টান মেরেছিলি।' বললে গিরিশ ঘোষ। 'নইলে কেউ কি আর মেথরের কলকেতে মুখ দেয়?'

'আমি দিই।' বজ্রকণ্ঠে বললে স্বামীজি। 'এইটে পরীক্ষা করবার জন্যে দিই আমি জাতিভেদের পরপারে বেদান্তের জগতে চলে আসতে পেরেছি কিনা। পূর্ব-সংস্কারে এখনো আচ্ছন্ন হয়ে থাকব তবে কিসের বিরজা হোম কিসের সন্ন্যাসব্রত। ঠিক ব্রত ধরেছি কিনা নিজেকে একবার বাজিয়ে নিতে ইচ্ছে করল। নিজের কাছে যদি পরীক্ষায় জিতি তবেই নিজের কাছে নিজে আশ্বাসস্বরূপ আনন্দস্বরূপ হয়ে উঠি। ভাই জি-সি, কথায় ও কাজে এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই।'

কাশীতে ভাস্করানন্দ স্বামীর সঙ্গে দেখা।

কথায় কথায় কামকাঞ্চনের কথা উঠল। ভাস্করানন্দ বললে, 'মানুষের এই দুই নির্দয় গ্রন্থি।'

'সন্ন্যাসীরও?' ঝলসে উঠল স্বামীজি।

'হ্যাঁ, সন্ন্যাসীরও। সাধ্য কি সেও এ বন্ধন থেকে ষোল আনা মুক্ত হয়।'

'মিথ্যে কথা। কামকাঞ্চনই যদি ত্যাগ করতে না পারল তবে আর সে সন্ন্যাসী কোথায়?' স্বামীজি দৃপ্তমুখে বললে।

'মুখে বলাই সহজ।' ভাস্করানন্দ গম্ভীরমুখে বললে, 'কিন্তু মনে-মনে তার মূল বহু দূর।'

'মানিনা। বিশ্বাস করিনা।'

'তোমার এই নবীন বয়স', ভাস্করানন্দ অনুকম্পার হাসি হাসল : 'তুমি কি জান? কতটুকু তোমার অভিজ্ঞতা?'

'জানি মানে? আমি দেখেছি।'

'দেখেছ?'

'হ্যাঁ, স্বচক্ষে দেখেছি। এই কিছুদিন আগে। কলকাতায়। দক্ষিণেশ্বরে।'

'কী দেখেছ?'

'সে এক আশ্চর্য প্রদীপ্ত পুরুষ। কামকাঞ্চনের বাষ্প পর্যন্ত নেই। মাটি টাকা, টাকা মাটি বলে একসঙ্গে তিনি টাকা আর মাটি নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে

দিয়েছিলেন।' দুই চোখ জ্বলতে লাগল স্বামীজির : 'যাঁর কাছে সমস্ত স্ত্রীজাতি মা। তিনি নিজের স্ত্রীকে পূজা করেছিলেন। টাকা পয়সা দূরের কথা, সামান্য ধাতুদ্রব্যের স্পর্শে যার হাত বেঁকে যেত—'

যেন গাঁজাখুরি গল্প এমনিভাবে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল ভাস্করানন্দ। স্বামীজি রাগ করে চলে গেল। গুরুর অবজ্ঞা সইতে পারব না।

'কে হে তোমাদের বিবেকানন্দ?' পরবর্তীকালে স্বামী শুদ্ধানন্দ ও নিরঞ্জনানন্দের সঙ্গে দেখা হলে জিগগেস করেছিল ভাস্করানন্দ। 'সমস্ত জগৎসংসার যে তাকে নিয়ে মেতে উঠল। আমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিতে পারো?'

তখন ভাস্করানন্দকে কে বলে দেবে যে নবীনবয়স সন্ন্যাসীকে সেদিন সে উপেক্ষা করেছিল সেই বিশ্ববিজেতা বিবেকানন্দ। কে বলে দেবে যার শিষ্যত্ব নিয়ে তার এই দিগ্বিজয় সেই অমিতমহিমা অব্যর্থ পুরুষের নাম কি!

প্রমদাদাস মিত্রর সঙ্গে ভাব হ'ল কাশীতে। একেই পর-পর কত চিঠি লিখেছে স্বামীজি :

'আশীর্বাদ করুন যেন আমার হৃদয় মহা ঐশবলে বলীয়ান হয় এবং সকল প্রকার মায়া আমার থেকে দূরপরাহত হয়ে যায়। আমরা ক্রুশ ঘাড়ে করেছি, হে ঈশ্বর, তুমিই তা আমাদের অর্পণ করেছ। এখন আমাদের বল দাও, যেন আমরণ তা বহন করতে পারি।

একটি গুরুভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছি। সে কিছুতেই আমার সঙ্গত্যাগ করবেনা। তাই তাকে উত্যক্ত করে বিদায় করেছি। কি করি, আমি বড় দুর্বল, বড়ই মায়াচ্ছন্ন, আশীর্বাদ করুন যেন কঠিন হতে পারি। আমার মানসিক্ অবস্থা আপনাকে কি বলব, মনের মধ্যে দিবারাত্র নরক জ্বলছে—কিছুই হলনা, এ জন্ম বুঝি বিফলে গেল। আশীর্বাদ করুন যেন অটল ধৈর্য ও অধ্যবসায় আমার হয়।'

ঠাকুরের একটা স্মরণচিহ্ন ও তাঁর ভক্তশিষ্যদের একটা আশ্রয়স্থান তৈরি করবার জন্যে স্বামীজি তখন পাগল। লিখছে প্রমদাদাসকে :

'যদি বলেন, আপনি সন্ন্যাসী, আপনার এ সকল বাসনা কেন, আমি বলব আমি রামকৃষ্ণের দাস, তাঁর নাম তাঁর জন্মভূমিতে ও সাধনভূমিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করতে ও তাঁর শিষ্যদের সাধনের অণুমাত্র সাহায্য করতে আমাকে যদি চুরি-ডাকাতিও করতে হয়, আমি তাতেও রাজি।

এখন সিদ্ধান্ত এই যে, রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নেই। সে অপূর্ব সিদ্ধি আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া এ জগতে আর নেই। হয় তিনি অবতার যেমন তিনি নিজে বলতেন অথবা বেদান্তদর্শনে যাঁকে নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ লোকহিতায় মুক্তোঽপি শরীরগ্রহণকারী বলা হয়েছে তিনি, তাই।'

অযোধ্যায় এসেছে স্বামীজি।

এই সেই লোকবিশ্রুতা অযোধ্যা। মানবেন্দ্র মনু যে পুরী তৈরি করেছিলেন। যেখানে সত্যসন্ধ রামের জন্ম। নবদূর্বাদলশ্যাম কমলায়তাক্ষ রাম। গাম্ভীর্যে সমুদ্র ধৈর্যে হিমালয়। ক্রোধে কালাগ্নিসদৃশ, ক্ষমায় পৃথিবীর সমান। জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ,

সর্বগুণোপেত সৌম্য ও করুণাময়। লোকাভিরাম রাম।

অযোধ্যা থেকে লখনউ, লখনউ থেকে আগ্রা, আগ্রা থেকে বৃন্দাবন।

২৭

বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে আশ্রয় নিল স্বামীজি। ঠাকুরের শিষ্য বলরাম বসু তারই পূর্বপুরুষদের তৈরি এই মন্দির, কালাবাবুর কুঞ্জ।

নতুন করে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হল স্বামীজি। সর্বকর্মকৃৎ শ্রীকৃষ্ণ। গীতায় অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, অর্জুন, ত্রিলোকে আমার করণীয় কিছু নেই, নেই কিছু অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য, তবুও আমি সর্বক্ষণ কর্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত। আমি যদি অলস হয়ে কর্মবিমুখ হয়ে থাকি, আমাকে দেখে সকলে তাই নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবে, উচ্ছন্নে যাবে সর্বসৃষ্টি। তাই আমি নিরবচ্ছিন্ন কর্ম করে যাচ্ছি। একমুহূর্ত আমার তন্দ্রা নেই বিশ্রাম নেই বিরতি-বিচ্যুতি নেই।

চেয়ে দেখ আগুন হয়ে তাপ দিচ্ছি, জল হয়ে শীতলতা। মাটি হয়ে শস্য, সমীরণ হয়ে প্রাণস্পন্দ। সমস্ত জগতের চক্ষু যে সূর্য সেই সূর্য হয়ে বিতরণ করছি দীধিতি। কর্মবলেই ইন্দ্র দেবরাজ্য অধিকার করেছিল, বৃহস্পতি হতে পেরেছিল দেবাচার্য। মানুষের মধ্যে যে পৌরুষ তাও আমারই বিভূতি। আমারই প্রেরণায় সকলের কর্ম। আমিই অপ্রমেয় মহাবাহু।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে, ধ্বংস হয়ে গেছে যদুবংশ, শ্রীকৃষ্ণও অন্তর্হিত হয়েছেন। দ্বারকা থেকে হস্তিনায় ফিরছে অর্জুন। রাস্তায় ডাকাতের দল লাঠি নিয়ে তাকে আক্রমণ করল। অমর্ষপরবশ অর্জুন গাণ্ডীব তুলতে উদ্যত হলেন। সে কি! গাণ্ডীব যে তোলা যাচ্ছেনা। তার বাহু যে নির্বল। বহু কষ্টে ধনুতে জ্যা আরোপ করল। কিন্তু সে কি, অস্ত্রের কথা যে মনেও আসছেনা। বল মেধা বুদ্ধি সব যে একসঙ্গে তিরোহিত হল। সামান্য দস্যুকর্তৃক পরাস্ত হল অর্জুন। কোনোদিন পরাজয় কাকে বলে যে জানেনি তার আজ এ কি দশা! রহস্য কি বুঝতে দেরি হলনা। শক্তি পার্থের নয়, শক্তি পার্থসারথির। যেহেতু কৃষ্ণ নেই অর্জুন নিষ্পৌরুষ।

গিরিগোবর্ধনের দিকে অগ্রসর হল স্বামীজি। পর্বত পরিক্রমা করছে, প্রতিজ্ঞা করল, আজ কিছুতেই ভিক্ষে করব না। যদি এমনি জোটে তো জুটবে নইলে নিরাহার থাকব। অনশনে প্রাণ বিসর্জন দেব। কী কেবল পরের দুয়ারে ধাওয়া করিয়ে বেড়াচ্ছ, যদি তোমার ডাকেই বেরিয়ে থাকি তবে তুমিই নিজের হাতে খাবার জুটিয়ে দেবে। তোমার করুণা চাইতে হবে কেন, তোমার করুণা নিজের থেকেই প্রতিমূর্ত হবে।

আজ এ পরীক্ষা আমার নয়, এ পরীক্ষা তোমার। প্রার্থনা করে করুণা নেব না, তোমার করুণাই আমার প্রার্থনাকে ডেকে নেবে। ত্রাণ করবে লজ্জা থেকে।

মধ্যাহ্ন খরতর হয়ে উঠল। জঠরে দুঃসহ ক্ষুধা, দুই পায়ে গুরুভার ক্লান্তি।

তবুও থামছেনা, পিছনে তাকাচ্ছেনা স্বামীজি, অপ্রতিবারণীয় গতিতে এগিয়ে চলেছে। রাস্তার দু'পাশে গৃহস্থের বাড়ি পড়ছে তবু কারু দুয়ারে গিয়ে হাত পাতছেনা। চলব আর দেখব। দেখব তিনিও আমার সঙ্গে চলছেন কিনা, আমাকেও দেখছেন কিনা নির্নিমেষে। পথের ধারে যখন মুখ থুবড়ে পড়ব দেখব তিনি তাঁর কোলের মধ্যে টেনে নিয়েছেন কিনা। তাঁর কৃপা খাদ্যরূপে না আসুক আসবে মৃত্যুরূপে। সফলমনোরথ হবই হব। হয় খাব নয় পাব। হয় ধরব নয় মরব।

তারপর আবার মুষলবর্ষণ বৃষ্টি নামল। না, বৃক্ষতলেও আশ্রয় নেবনা। এই পথই আমার পাথেয়, বিদ্যুৎবিদীর্ণ মুক্ত আকাশই আমার আশ্রয়। আমি থামবনা, আমি নামবনা। আমাকে দেখতে দাওই না এ আকাশ থেকে বজ্র ছাড়া আর কিছু ঝরে কিনা, এ পথের শেষে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু আছে কিনা পরিতৃপ্তি!

বৃষ্টি থামতেই শোনা গেল, কে একজন দূর থেকে তাকে ডাকছে।

স্বামীজি ফিরেও তাকালনা, একাগ্রবেগে সামনে চলতে লাগল।

'শুনছেন? শুনুন—' পশ্চাৎবর্তী লোক ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ক্ষীণকণ্ঠ স্পষ্টতর হচ্ছে।

কে শোনে! গ্রাহ্যও করলনা স্বামীজি। যে চলেছে তার কাছে পশ্চাৎ মিথ্যা, পশ্চাৎ মৃত।

'শুনুন, আপনার জন্যে খাবার এনেছি।'

স্বামীজি এবার ছুটতে আরম্ভ করল। এ কি ছলনা না প্রহসন? কান্তারে-প্রান্তরে ভোজ্যবস্তু? এ নিশ্চয়ই রাত্রি না হতেই নিশির ডাক। হয়তো বা প্রচ্ছন্ন প্রলোভনের আর্তনাদ।

স্বামীজি ছুটল ঊর্ধ্বশ্বাসে। ভুলেও একবার তাকালনা পিছন দিকে। কিন্তু এ ছলনা নয়, প্রহসন নয়। এ অঘটনকারিণী কৃপা।

পিছনের লোকও ছুটতে লাগল পিছু পিছু। দু-দশ রশি নয় প্রায় এক মাইল। স্বামীজি যত ছোটে পিছনের লোকও তত দৌড়য়। শেষকালে প্রায় এক মাইলের মাথায় পিছনের লোক স্বামীজিকে ধরে ফেলল। বললে, 'এই দেখুন, আপনার জন্যে খাবার নিয়ে এসেছি।'

লোকটির হাতে খাবারের পুঁটলি।

স্বামীজি নিল হাত পেতে। দুই চোখ ফেটে নিরর্গল অশ্রু ঝরতে লাগল। লোকটির কোনো পরিচয় জানতে চাইলনা। সে ঈশ্বরের বার্তাবহ। ঈশ্বরের কৃপার প্রতিমূর্তি।

স্বামীজিকে খাইয়ে লোকটিও চলে গেল নীরবে। অরণ্যে না লোকালয়ে, কে বলবে তার ঠিকানা। কৃপার ঠিকানা যত্রতত্র। শূন্যে মরুভূমিতে পাতালের অন্ধকারে। আমি আছি এটুকু বোঝাবার জন্যেই ঈশ্বরের কৃপা। আর তুমি যে আছ এটুকু বোঝাবার জন্যেই আমার ভক্তি।

গোবর্ধন থেকে স্বামীজি চলে এল রাধাকুণ্ডে।

একখণ্ড কৌপীনই তখন একমাত্র পরিধেয়। নদীতে নির্জনে স্নান করছে

স্বামীজি, কৌপীনখানা পাড়ে শুকোতে দেয়া হয়েছে। স্নান করতে-করতে হঠাৎ নজরে পড়ল কৌপীন নেই। ইতিউতি খুঁজতে লাগল স্বামীজি, কোথায় কৌপীন! দেখল সেই কৌপীন বৃক্ষপরে এক শাখামৃগের হাতে। হাত তুলে স্বামীজি প্রার্থনা করল কিন্তু বানর তা গ্রাহ্যও করল না। ভীষণ রাগ হল স্বামীজির, বানরের উপর নয় রাধিকার উপর, যিনি এই কুণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী। তাঁর রাজত্বে এই অবিচার! আমি গভীর অরণ্যগহ্বরে প্রবেশ করব ও অনশনে মরব তিলে তিলে। এই দেহ আর রাখবনা।

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছে, কোত্থেকে কে একটি লোক এসে হাজির। হাতে তার একখানি গেরুয়া কাপড় আর কিছু খাবার।

কিছু জিগগেস করলনা স্বামীজি। যেন জিগগেস করবার কোনো প্রয়োজনও নেই।

নিল সব হাত বাড়িয়ে। জঙ্গল পেরিয়ে এল আবার সেই নদীর ধারে। দেখল যেখানে তার কৌপীনটি শুকোতে দেওয়া হয়েছিল সেইখানেই কৌপীনটি পড়ে আছে।

বলো জয় শ্রীরামকৃষ্ণ!

'বিপদে প্রলোভনে, ভগবান রক্ষা কর, বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি, কেহই উত্তর দেয় নাই, কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন, নিজে অন্তর্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন। যদি আত্মা অবিনাশী হয়, যদি এখনও তিনি থাকেন, আমি বারংবার প্রার্থনা করি, হে অপার দয়ানিধে, হে মমৈকশরণদাতা রামকৃষ্ণ ভগবন, কৃপা করিয়া আমার এই নরশ্রেষ্ঠ বন্ধুবরের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আপনার সকল মঙ্গল, এ জগতে যাঁহাকে অহেতুকদয়াসিন্ধু দেখিয়াছি, তিনিই করিবেন।'

হরিদ্বারের পথে হাতরাস রেল স্টেশনে এসে উঠেছে স্বামীজি। ট্রেনে করে নয় পায়ে হেঁটে। স্টেশনের এককোণে মাটির উপর বসে পড়েছে। অনাহার ও ক্লান্তির শুষ্কতা সারা গায়ে বৃহদক্ষরে লেখা। এসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন মাস্টার শরৎ গুপ্তের নজরে পড়ল। কে এই সৌম্যসুন্দর উদারদর্শন যুবক সন্ন্যাসী! এত ঔজ্জ্বল্য এত পবিত্রতা তো কোথাও দেখিনি এর আগে!

শরৎ গুপ্ত জৌনপুরী মুসলমানদের সঙ্গে মিশে তাদেরই রীতিনীতি বেশি রপ্ত করেছে। মাতৃভাষা বাঙলার চেয়ে উর্দুই তার বেশি আসে, কিন্তু রক্তের সংস্কার যাবে কোথায়? সন্ন্যাসী দেখেই সমস্ত মন সেবাশ্রদ্ধায় উথলে উঠল।

তাড়াতাড়ি স্বামীজীর কাছে এসে শরৎ জিগগেস করলে, 'কিছু মনে করবেন না। স্বামীজি, আপনি কি ক্ষুধার্ত?'

কণ্ঠস্বরে অপার আন্তরিকতা। অমেয় মাধুর্য।

স্বামীজি বললে, 'তাই তো মনে হচ্ছে। ক্ষুধাই তো চৈতন্যকে জাগিয়ে রাখে।'

'যদি আমার চৈতন্যকে একটু জাগান।' প্রাণঢালা প্রীতির কণ্ঠে শরৎ জিগগেস করল, 'আমার কোয়ার্টারে একটু যাবেন?'

হাসিমুখে স্বামীজী উঠে পড়ল : 'কি খেতে দেবে?'

শরৎ একটি পার্শি বয়েত আবৃত্তি করল : 'হে প্রিয় তুমি আমার ঘরে এসেছ। সবচেয়ে সুস্বাদু ভোজ্য তোমাকে পরিবেশন করব। সুস্বাদু ভোজ্য আমার হৃদয়ের মাংস দিয়ে তৈরি।'

স্বামীজি শরতের আতিথ্য নিল। আকাশের মত উন্মুক্ত হৃদয়ের আতিথ্য।

ক্ষণে-ক্ষণে স্বামীজির চক্ষুদুটিই দেখতে লাগল শরৎ। ফুল্ল ইন্দীবরের মত চক্ষু। যেমন প্রদীপ্তভাস্বর তেমনি যেন আবার ললিতমধুর। নির্মলজ্ঞানচক্ষু আবার কোমলপ্রেমনেত্র। একদিকে বিদ্যুৎ আরেকদিকে নীহার। সর্বপাপ-বিশুদ্ধাত্মা সূর্য আবার সর্বপ্রেমমোহনাত্মা সুধাংশু।

কত দিন কিছু খায়নি। মৃতকল্প হয়েছিল এতদিন। আজ খেল পেট পুরে। জঠরবাসী কঠোর দেবতা আহুতি পেল।

শরৎ বললে, 'আমাকে কিছু বলুন।'

'কি আর বলব একটা গান গেয়ে শোনাই।' স্বামীজি গান ধরল। বিদ্যাসুন্দরে মালিনী সেই যে বলেছিল সুন্দরকে সেই গান। 'যদি বিদ্যাকে পেতে চাও তাহলে চাঁদমুখে ছাই মাখো, নইলে কেটে পড়।'

যেন ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল শরৎ। যদি ঈশ্বরকে পেতে চাও ত্যাগী হও, বৈরাগী হও।

শরৎ অন্তঃপুরে চলে গেল। তারপর স্বামীজির কাছে বৈঠকখানায় যখন ফিরে এল তখন তার গায়ে আর সরকারী পোশাক নেই, পরনে সামান্য কাপড়—আর সব চেয়ে যা আশ্চর্য, মুখে ছাই মাখা।

'এ কি, এ কী করেছ?' স্বামীজী চমকে উঠল।

'ঠিকই করেছি। আপনি যদি বলেন আমাকে সঙ্গে নেবেন তাহলে সব ছেড়ে-ছুড়ে এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়তে পারি।'

স্বামীজি আনন্দে উছলে উঠল : 'কিন্তু, জীবনের ঘোর বর্ষাবাদল কি কেটে গেছে এরই মধ্যে, এসেছে কি শরতের শেফালি লগ্ন!'

হাতরাসে ব্রজেনের সঙ্গে দেখা। কলকাতায় থাকতে চেনা, ব্রজেন হাত বাড়িয়ে স্বামীজিকে ডেকে নিল তার বাড়িতে। সমস্ত বাঙালিমহল ভেঙে পড়ল। কত কি দলাদলি ছিল তাদের মধ্যে পালিয়ে গেল এক নিমেষে। যত সব সংকীর্ণ আলের বন্ধন ডুবে গেল ভাবের বন্যায় প্রেমের বন্যায়। সঙ্গীতসুধারসস্রোতে। লোক যত শোনে ততই তাদের আত্মার তৃষ্ণা বাড়ে। ঈশ্বরই তো একমাত্র প্রসঙ্গ যার কোথাও কোনো সমাপ্তির রেখা নেই, কোথাও ইতি নেই সে প্রেমপত্রে। যে বলে সে ক্লান্ত হয়না, যে শোনে তার কানে চিরঅতৃপ্তি লেগে থাকে।

কিন্তু এক জায়গায় বেশিক্ষণ আবদ্ধ হয়ে থাকবে এ তো সন্ন্যাসীর ব্রত নয়। এক জায়গায় আটকে থাকলেই তো মমতার শিকড় গজিয়ে যাবে। সুতরাং মায়াবন্ধন উচ্ছিন্ন করো। যে জল বয়ে চলে আর যে সাধু ঘুরে বেড়ায় সে জল সে সাধুই সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছ বেশি পবিত্র।

এক জায়গায় কি, এক বৃক্ষতলেও সনাতন গোস্বামী একদিনের বেশি বসেন নি।
স্বামীজি চলবার জন্যে পা বাড়াল।
শরৎ বললে, 'দাঁড়ান।'
'তুমি কোথায় যাবে?'
'আপনার সঙ্গে যাব।'
'পারবে যেতে?'
'পারব।'
'তবে তার আগে পরীক্ষা দাও।'
'কিসের পরীক্ষা?' শরৎ গুপ্ত তাকাতে লাগল এদিক-ওদিক।
'একটা পাত্র নিয়ে এস। ভিক্ষে করো। সকলের সামনে মেলে ধরো সে ভিক্ষা-পাত্র। পারবে?'
'পারব।'
ভিক্ষাপাত্র হতে নিয়ে স্টেশনের কুলিদের সামনে এসে দাঁড়াল শরৎ। কুলিরা তো স্তম্ভিত। না, আমি আর স্টেশনমাস্টার নই, আমি তোমাদেরই একজন, তোমাদেরই সঙ্গীসাথি। শুধু সঙ্গীসাথি নই, তোমাদেরই সেবক-পরিচারক।
'তবে চলো আমার সঙ্গে।' ডাক দিল স্বামীজি।
এ যেন অগাধস্পর্শ সমুদ্রের ডাক, অপারস্পর্শ আকাশের। শরৎ বললে, 'আমি প্রস্তুত।'
তবু এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বোধহয় স্বামীজি। বললে, 'তুমি কি ভেবেছ সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়লেই সহজে খুঁজে পাবে ঈশ্বরকে? কেন, ঘরের মধ্যে কি তিনি নেই? তিনি কি নেই তোমার নির্ধারিত কর্মের মধ্যে?'
'আছেন, জানি। সমস্তর মধ্যেই তিনি। তবু মন বড় উতলা হয়েছে।' শরৎ গুপ্ত স্বামীজির হাত চেপে ধরল। 'কিছুতেই আপনার সঙ্গ ছাড়তে পারছি না।'
'এই কথা? বেশ তো, আমি বারে বারে ঘুরে ঘুরে এসে তোমাকে দেখা দিয়ে যাব।'
'না, না, আমি যাব। আমাকে নিয়ে চলুন। ঈশ্বর সর্বভূতে, এ কে না জানে! কিন্তু যেখানে আপনি সেখানে ঈশ্বর বেশি প্রজ্বলন্ত।'
তবে চলো হৃষীকেশ।
আলস্যে-বিলাসে সমৃদ্ধ জীবন, এখন এসে দাঁড়াল ক্লেশ ও কাঠিন্যের মধ্যে। সুখ-শান্তি আরাম-বিশ্রাম কে চায়, আমাকে লজ্জা দিও না, আমাকে এবার তোমার রণসজ্জায় সাজিয়ে দাও। আমাকে অক্লান্ত করো, অক্ষুণ্ণ করো। যা দুঃখের দ্বারাও দুর্লভ সেই দুরধিগম্যকে লাভ করার শক্তি অনুভব করতে দাও নিজের মধ্যে। যে পথ শানিত ক্ষুরধারের মত দুর্গম সেই পথ দিয়ে নিয়ে চলো।
হিমালয়ের মধ্য দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে শরৎ একদিন মূর্ছিত হয়ে পড়ল। ক্ষুধার অন্ন নেই, তৃষ্ণার জল নেই, কোথায় আর কতদূর নিয়ে যাবে? এই তোমার

কোলেই এবার আশ্রয় নিই। জীবন পর্বতরুক্ষ কিন্তু মৃত্যু সমুদ্রশীতল।

চোখ চেয়ে দেখল স্বামীজি তার মাথা কোলে নিয়ে বসেছে। শুষ্ক মুখে জল ঢেলে দিচ্ছে। দারুণ কঠিনের পাশে এ কে শ্যামলশীতল।

আরেকবার ঘোড়া থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে পড়ে যাচ্ছে শরৎ, নিচেই তীক্ষ্ণস্রোতা পার্বতী নদী, কোত্থেকে স্বামীজি ছুটে এসে ঘোড়ার মুখ চেপে ধরল, বাঁচিয়ে দিল শরৎকে। নিজের প্রাণ বিপন্ন হচ্ছে তা হোক তবু যে আমাকে নির্ভর করে দুঃসহ দুঃখভারাক্রান্ত জীবন তুলে নিয়েছে তাকে আমি না ধরি তো কে ধরবে?

ঘোর অসুখে পড়েছে শরৎ, উঠতে পারছেনা। উঠতে পারলেও চলতে পারছেনা। তবু যেতে হবে এগিয়ে। যাব কি করে? আমি আছি। দেখল পাশে দাঁড়িয়ে স্বামীজি। আমি তোকে বয়ে নিয়ে যাব। শুধু তোকে? তোর লোটা কম্বল জুতো ছাতা সমস্ত।

কাতর হয়ে চারদিকে আঁধার দেখে মাঝে-মাঝে স্বামী সদানন্দ বলেছে বিবেকানন্দকে, 'স্বামীজি, আপনি আমাকে ত্যাগ করবেন না তো?'

'মূর্খ! মনে নেই আমি তোমার জুতো পর্যন্ত বয়ে বেড়িয়েছি!'

প্রেম—মূর্তিমান প্রেম। তাছাড়া আর কোন কথায় স্বামীজিকে প্রকাশ করা সম্ভব?

'কর্ম, কর্ম, কর্ম, হাম আওর কুছ নহি মাঙগতে হেঁ—কর্ম, কর্ম, কর্ম, ইভন্ আনটু ডেথ। দুর্বলগুলোর কর্মবীর, মহাবীর হতে হবে। টাকার জন্যে ভয় নেই, টাকা উড়ে আসবে। টাকা যারা দেবে, তারা নিজের নামে দিক, হানি কি? কার নাম—কিসের নাম? কে নাম চায়? দূর কর নামে। ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌঁছাতে যদি নাম-ধাম সব রসাতলেও যায়, অহোভাগ্যং, অহোভাগ্যং।' অখণ্ডানন্দকে আলমোড়া থেকে লিখছেন স্বামীজী : 'হৃদয়, হৃদয়ই শুধু জয়ী হয়ে থাকে, মস্তিষ্ক নয়। পুঁথিপাতড়া বিদ্যেসিদ্যে যোগ ধ্যান জ্ঞান—প্রেমের কাছে সব ধূলসমান। প্রেমেই অণিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মুক্তি। এই তো পূজো, নরনারীশরীরধারী প্রভুর পূজো, আর যা কিছু 'নেদং যদিদমুপাসতে।' এই তো আরম্ভ, ঐরূপে আমরা ভারতবর্ষ, পৃথিবী ছেয়ে ফেলব না? তবে কি প্রভুর মাহাত্ম্য! লোকে দেখুক, আমাদের প্রভুর পাদস্পর্শে লোকে দেবত্ব পায় কিনা। এরি নাম জীবন্মুক্তি, যখন সমস্ত 'আমি', স্বার্থ চলে গিয়েছে।'

বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে দু'জনে, অকস্মাৎ, স্বামীজি থমকে দাঁড়াল।

কি? চারিদিক চাইতে লাগল শরৎ।

'বাঘ।'

'বাঘ? কোথায়?'

'এই তোমার চোখের সামনে। বাঘের খাদ্যের ভুক্তাবশেষ।'

তাকিয়ে দেখল শরৎ, কখানা মানুষের হাড় পড়ে আছে। পাশে গেরুয়া

কাপড়ের টুকরো।

'বুঝতে পাচ্ছ? এক সন্ন্যাসীকে সাবড়ে দিয়েছে বাঘ।' বললে স্বামীজি।

'দিক।'

'আমাদের সে মিত্রটি কাছেকাছেই আছে।'

'থাকুক।'

'তোমার ভয় করছেনা?'

'আপনি থাকতে আবার কিসের ভয়!'

হৃষীকেশে এসে দেহমন ঠান্ডা হল। এদিকে সফেনজলহাসিনী গঙ্গা, আরেকদিকে বীরসাধনারূঢ় হিমালয়। খুব ধ্যান আর প্রার্থনা লাগিয়ে দাও। ধ্যানের মূর্তি দৃঢ়স্তব্ধ হিমালয় আর প্রার্থনার মূর্তি কল্লোলকলভাষিণী জাহ্নবী।

কিন্তু কতদিন? শরৎ আবার অসুখে পড়ল।

এবারের অসুখ আরো সাংঘাতিক। কেদার-বদরী পর্যন্ত যাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু প্রভু চোখ তুলে চাইলেন না। এই তো পরীক্ষা। এই তো সাধনসংগ্রামের প্রস্তুতি। ব্যর্থতাই তো সিদ্ধির বনিয়াদ। পরাজয়ই তো সাফল্যসৌধের স্তম্ভ।

তবে আর কি। ফিরে চল হাতরাস। পুনর্মূষিকো ভব।

হাতরাসে ফিরে এসে স্বামীজি শয্যা নিল। সেবা যে করবে সে সৌভাগ্যও শরতের হলনা, কেননা নিজেই যে শয্যাশায়ী। উপায়?

তুমি আগের মতন হাতরাসে, আমি আগের মতন বরানগর।

বরানগর মঠে ফিরে এল স্বামীজি। যাবার আগে শরৎ বললে, 'বন্ধু, এই বিচ্ছেদ আর কতদিন?'

কয়েক মাস পরে সুস্থ হল শরৎ। গায়ে একটু জোর পেতেই চলল স্বামীজির কাছে, বরানগরে।

'এ কি, তুমি?'

'বিচ্ছেদ দুর্বিষহ। এবার একেবারে পাকাপাকিভাবে চলে এসেছি। চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।'

'সে কি, চাকরি ছেড়ে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ, শেকড়সুদ্ধু বিষবৃক্ষ তুলে ফেলেছি উপড়ে। এখন রোগ হোক শোক হোক আর ফেরবার পথ নেই, আর ছাড়ব না আপনাকে।'

সন্ন্যাসে দীক্ষিত হল শরৎ গুপ্ত। নাম হল স্বামী সদানন্দ।

'অনুভূতিই হচ্ছে সার কথা।' বলছে স্বামীজি: 'হাজার বৎসর গঙ্গাস্নান কর, আর হাজার বৎসর নিরামিষ খা, ওতে যদি আত্মবিকাশের সহায়তা না হয়, তবে জানবি সর্বৈব বৃথা হল। আর, আচারবর্জিত হয়েও কেউ যদি আত্মদর্শন করতে পারে তবে সেই অনাচারই শ্রেষ্ঠ আচার। যে যতটা আত্মানুভূতি করতে পেরেছে তার বিধিনিষেধ ততই কমে যায়। আচার্য শঙ্করও বলেছেন, নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ, কো নিষেধঃ? অতএব মূল কথা হচ্ছে অনুভূতি। তাই জানবি লক্ষ্য, মত—পথ, রাস্তা মাত্র। কার কতটা ত্যাগ হয়েছে এইটিই জানবি

উন্নতির কষ্টিপাথর। কামকাঞ্চনের আসক্তি যেখানে দেখবি কমতি, সে যে মতের যে পথের লোক হোক না কেন, তার জানবি শক্তি জাগ্রত হচ্ছে। তার জানবি আত্মানুভূতির দ্বার খুলে গেছে। আর হাজার আচার মেনে চল, হাজার শ্লোক আওড়া, তবু যদি ত্যাগের ভাব না এসে থাকে তো জানবি জীবন বৃথা। এই অনুভূতি লাভে তৎপর হ, লেগে যা। শাস্ত্রটাস্ত্র তো ঢের পড়লি। বল দিকি তাতে হল কি? কেউ টাকার চিন্তা করে ধনকুবের হয়েছে, তুই না হয় শাস্ত্রচিন্তা করে পণ্ডিত হয়েছিস। উভয়ই বন্ধন। পরাবিদ্যালাভে বিদ্যা-অবিদ্যার পারে চলে যা।'

বরানগরের মঠে প্রায় একবছর কাটিয়ে দিল স্বামীজি। এই একটা বছর তীব্রতর সাধন করল। এইবারের সাধন শুধু ঈশ্বরপ্রেমের নয়, দেশপ্রেমের। দেশই ঈশ্বর। দেশের মুক্তিই ঈশ্বরের উপাসনা।

'ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখ মানুষ চাই, পশু নয়। প্রভু তোমাদের এই নড়নচড়ন-রহিত সভ্যতা ভাঙবার জন্যেই ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে প্রেরণ করেছেন। মনে কোরোনা আমরা দরিদ্র, অর্থ জগতে শক্তি নয়, সাধুতাই, পবিত্রতাই শক্তি।'

কিন্তু কলকাতার কাছে থাকাই মা-ভায়েদের দুঃখ দেখা। সেই দুঃখের প্রতিবিধানে নিজেকে উদ্যত করবার চেষ্টা করা। সেই তো আবার সেই মায়ার নাগপাশ, আবার সেই বন্ধনমোচনের সংগ্রাম।

কাশীতে প্রমদাদাসবাবুকে লিখছে স্বামীজি: 'আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না ইহাই অত্যন্ত কষ্ট। আমার মা-ভায়েদের অবস্থা পূর্বে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত বড়ই দুঃস্থ, এমন কি কখনো কখনো উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা দুর্বল দেখিয়া পৈত্রিক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল, হাইকোর্টে মোকদ্দমা করিয়া যদিও সেই পৈত্রিক বাটির অংশ পাইয়াছেন, কিন্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন, যে প্রকার মোকদ্দমার দস্তুর। কখনো কখনো কলিকাতার নিকটে থাকিলে তাঁহাদের দুরবস্থা দেখিয়া রজোগুণের প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকারস্বরূপ কার্যকরী বাসনার উদয় হয়, সেই সময়ে মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে, তাহাতেই লিখিয়াছিলাম মনের অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর। এবার তাঁহাদের মোকদ্দমা শেষ হইয়াছে। কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া তাঁহাদের সমস্ত মিটাইয়া এদেশ হইতে চিরদিনের মত বিদায় লইতে পারি আপনি আশীর্বাদ করুন।'

বিদায়! বিদায়! আবার বেরিয়ে পড়ল স্বামীজি।

এবার প্রথমেই বৈদ্যনাথধাম।

হে ঈশ্বর, তুমি আমার সারথি হও।

বাসুদেব ঘুমিয়ে আছে পালঙ্কে। দুর্যোধন প্রথমে ঘরে ঢুকল। শয্যার শিয়রে প্রশস্ত আসন, সেখানেই সে বসল। পরে অর্জুন এসে বসল পায়ের কাছে। দুর্যোধনের ভঙ্গি গর্বারূঢ়, অর্জুনের বিনয়স্নিগ্ধ।

চোখ চাইল বাসুদেব। প্রথমেই দেখল অর্জুনকে। পরে দুর্যোধনকে। স্বাগত সম্ভাষণ করে জিগগেস করল, কেন এসেছ তোমরা?

দুর্যোধন বললে, 'এ যুদ্ধে আমাকে আপনার সাহায্য করতে হবে। আমাদের দু পক্ষের সঙ্গেই আপনার সমান সম্বন্ধ, সমান বন্ধুতা। কিন্তু এক্ষেত্রে আমিই আগে এসেছি আপনার কাছে, সুতরাং আমার পক্ষেই আপনি আসবেন। যে প্রথম আসে সাধুরা তাকেই সর্বাগ্রে গ্রহণ করে। আপনি সাধুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং সদাচার পালন করুন।'

'আপনি যে আগে এসেছেন তাতে সন্দেহ কি।' বললে শ্রীকৃষ্ণ। 'কিন্তু আগে আমি অর্জুনকে দেখেছি। সুতরাং আমি দু পক্ষকেই সাহায্য করব। কিন্তু যেহেতু অর্জুন বালক তাকেই আগে আমাকে বরণ করতে হবে। বালকই অগ্রবরেণ্য, সুতরাং তারই নির্বাচনে অগ্রাধিকার।'

দুর্যোধন বললে, 'তাই হোক।'

শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে সম্বোধন করে বললে, 'এক পক্ষে থাকবে এক অর্বুদ গোপসৈন্য আরেক পক্ষে আমি। গোপসৈন্যরা সশস্ত্র, যুদ্ধব্রত, আর আমি নিরস্ত্র, ত্যক্তকর্ম। বলো, তুমি কাকে নেবে?'

অর্জুন বললে, 'তোমাকে নেব।'

কি নীরন্ধ্র মূর্খ! মনে মনে উৎফুল্ল হল দুর্যোধন। নারায়ণী সেনাতেই তার জয়বর্ধন, তার যশোবর্ধন। কৃষ্ণ যখন অস্ত্র ধারণ করবেনা তখন আর ভাবনা কি। নিরস্ত্র কৃষ্ণ মানেই বিজিত অর্জুন।

দুর্যোধন চলে গেলে অর্জুনকে জিগগেস করল বাসুদেব, 'আমি অস্ত্রত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, এ জেনেও তুমি আমাকে নিলে কেন?'

'তুমি আমার সারথি হবে বলে।'

'সারথি হব?'

'যুদ্ধ আমিই করব, তুমি শুধু আমাকে বয়ে নিয়ে বেড়াবে। এ ছাড়া আর আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, প্রার্থনা নেই। তুমি আমার এ অভিলাষ পূরণ করো, আমার সারথি হও।'

স্পর্ধিত প্রার্থনা। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সারথ্য হেয় কর্ম। অর্জুনের কি ঔদ্ধত্য, এমন অসম্ভব প্রার্থনা সে করতে পারে।

অর্জুনই তো পারবে। অর্জুন যে ভক্ত। স্পর্ধিত প্রার্থনা তো একমাত্র ভক্তেরই অধিকার। ভগবানও তো একমাত্র ভক্তেরই।

'এ স্পর্ধা একমাত্র তোমাকেই সাজে।' সহাস্যমুখে বললে, শ্রীকৃষ্ণ, 'আমি তোমার সারথি হব।'

যুধিষ্ঠির খুশি কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বললেন, যুদ্ধ না করুন, অগ্রভাগে তো থাকবেন। কৃষ্ণ যার অগ্রণী তাকে কে প্রতিরোধ করবে?'

আমাকে অপ্রতিরোধ্য করো। তুমি আমার সারথি হও। আমার অগ্রনায়ক হও।

বৈদ্যনাথধামে এসে স্বামীজি তাকালো কাশীর দিকে।

শুনতে পেল এলাহাবাদে যোগানন্দের অসুখ। কি অসুখ? বসন্ত। পত্রপাঠ রওনা হল স্বামীজি। আগে রোগীসেবা পরে তীর্থসেবা। কদিনের অক্লান্ত সেবাযত্নে ভালো হয়ে উঠল যোগানন্দ।

এখানেই কানে এল গাজীপুরের পওহারী বাবার কথা।

দেখা করতে গেলে পাব তাঁকে দেখতে?

কে এই পওহারী বাবা?

কাশীর কাছে এক অখ্যাত গ্রামে তার জন্ম। সংসারে থাকবার মধ্যে আছে খুড়ো, তিনিই তাকে প্রতিপালন করছেন। খুড়ো আজীবন ব্রহ্মচারী, রামানুজ-পন্থী। অর্থাৎ দ্বৈতবাদী। গাজীপুরের মাইল দুই উত্তরে এক টুকরো জমি আছে, তাতেই বসবাস করেন। নিজে বৈরাগী-বাউন্ডুলে হোন, ভাইপোটা মানুষ হোক, দিগগজ হোক, এই তাঁর স্বপ্ন।

ব্যাকরণ আর ন্যায় অল্প কদিনেই আয়ত্ত করল ভাইপো। ক্রমে-ক্রমে আরো সব শব্দশাস্ত্র। এমন সময় হঠাৎ একদিন খুড়ো চোখ বুজলেন। চতুর্দিক আঁধার দেখল ভাইপো। যেন প্রকান্ড একটা গাছ ছিল দাঁড়িয়ে, শাদা একটা ফাঁক হয়ে গেল। সমস্ত পুঁথিপত্রকে মনে হল একটা ফাঁকি, শুধু কথার ঘোরপ্যাঁচ। যার উপর চিত্তের সমস্ত ভালোবাসা, সম্পূর্ণ নির্ভর, সে এমনি করে চলে গেলে কী অর্থ থাকে আর জীবনে। জীবনে এমন কি কিছুই নেই যা আমার এই শূন্যতা ভরে দিতে পারে, যা কোনোদিন শূন্য হয় না, যার কোনো পরিণাম নেই, যা অপরিবর্তনীয়!

আছে। কে যেন বললে অন্তস্তল থেকে।

কোথায় সে, কী সে, পথে-পথে বেরিয়ে পড়ল সে শোকার্ত যুবক।

ঘুরতে ঘুরতে এল সে কাথিয়াওয়াড়। গিরনার পর্বতের চূড়ায় বসে প্রথম যোগসাধনার সে আস্বাদ পেল।

নেমে এসে চলল সে কাশী। সেখানে গঙ্গাতীরে মিলল তার গুরু। নদীর উঁচু পাড়ে এক গর্ত খুঁড়ে সে সেখানে বাস করছে। দেখাদেখি পওহারীও এক গর্ত খুঁড়ল। আমিও তোমার মত থাকব এই মৃত্তিকার বিবরে।

নির্জন গুহাতেই যোগাভ্যাসের সুবিধে। শব্দ নেই, চাঞ্চল্য নেই, আবহাওয়ার অদল-বদল নেই। মনকে বিচলিত করতে পারে মন ছাড়া আর কিছুই নেই। আর মত কতদিন যন্ত্রণা দেবে? নিশ্চেষ্ট করে-করে তাকে নিশ্চল করে দেব।

সেখানে অদ্বৈতবাদ শিখল পওহারী।

তারপর ছাড়া পেয়ে বেরুল ভ্রমণে। চার ধাম ঘুরে এল। ভারতবর্ষের চার-কোণে চার ধাম। উত্তরে কেদারবদরী, পূবে পুরী, দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পশ্চিমে দ্বারকা। ভ্রমণের সঙ্গে-সঙ্গে সাধন। শ্রীচৈতন্যের বাঙলা দেশেও কাটিয়ে গেল অনেকদিন। কাটিয়ে গেল শঙ্করাচার্যের দাক্ষিণাত্যে।

তারপর ফিরে এল গাজীপুর, জন্মভূমিতে। সমস্ত মুখে ব্রহ্মোপলব্ধির বিভা। ভূমিতে থেকে ভূমাকে যে দেখেছে তারই দু চোখে জাগতে পারে এই রত্নদীপ।

নদীতীরে ছোট একটা গর্ত খনন করলে। তাতেই বাস করতে লাগল। অন্তত মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। মধ্যরাত্রে নদী সাঁতরে ওপারে যায়, আরেকরকম নির্জনে সাধন-ভজন করে ভোর হবার আগেই ফিরে আসে। প্রেমিক-প্রভু রামচন্দ্রের সেবা আর নিজের হাতে রেঁধে অতিথি সাধুদের খাওয়ানো এই তার দুই ব্রত।

নিজের খাওয়ার মধ্যে একমুঠো নিম পাতা আর কটা লঙ্কা।

তাও বন্ধ হল আস্তে-আস্তে। এখন শুধু বাতাস খেয়ে থাকে। তাই তার নাম হল পও-আহারী, বায়ুভুক।

কিন্তু কি করে দেখা হয় তার সঙ্গে? প্রায় সর্বক্ষণই সে মাটির নিচে বসে থাকে।

গুহায় বসে থাকলে লোকের উপকার হবে কি করে?

লোকের উপকার করতে আমার কি মাথাব্যথা? যাঁর লোক তিনি করবেন। তাছাড়া, তোমরা কি বলতে চাও শুধু স্থূল দেহেই উপকার সম্ভব? একটি মন আরেকটি মনকে, শতশত মনকে, সাহায্য করতে পারে সঞ্চালিত করতে পারে এ তোমরা সম্ভব বলে মানোনা?

বাল্যসখা সতীশ মুখুজ্জের বাড়ি আছে স্বামীজি।

চিঠি লিখছে কলকাতায়, বলরাম বসুকে : 'পওহারীবাবার বাড়ি দেখিয়া আসিয়াছি। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, ইংরেজি বাঙলোর মতন, ভিতরে বাগান আছে, বড়-বড় ঘর, চিমনি ইত্যাদি। কাহাকেও ঢুকিতে দেন না, ইচ্ছা হইলে দ্বারদেশে আসিয়া ভিতর থেকে কথা কন মাত্র। একদিন যাইয়া বসিয়া বসিয়া হিম খাইয়া আসিয়াছি। রবিবারে কাশী যাইব। ইতিমধ্যে বাবাজির সহিত দেখা হইল তো হইল, নহিলে এই পর্যন্ত।'

গোখরো সাপে কামড়েছে বাবাজিকে। সবাই ভাবল মারা গিয়েছে বুঝি। কয়েক ঘণ্টা পর চোখ চাইল পওহারী। কি ব্যাপার?

'পাহন দেওতা আয়া। আমার প্রিয়তমের নিকট থেকে দূতরূপে এসেছিল ঐ গোখরো।'

যেমন যত্নে শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করে তেমনি যত্নে বাসন মাজে। প্রত্যেক কাজটিই তার পূজা। উপায়ই উপেয়। উপায়ই সিদ্ধি। যন সাধন তন সিদ্ধি।

'বাবাজির সহিত দেখা হওয়া বড় মুস্কিল, তিনি বাড়ির বাহিরে আসেন না,

ইচ্ছা হইলে দ্বারে আসিয়া ভিতর হইতে কথা কন। অতি উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানসমন্বিত এবং চিমনিদ্বয়শোভিত তাঁহার বাটী দেখিয়া আসিয়াছি, ভিতরে প্রবেশের উপায় নাই।' আবার চিঠি লিখছে স্বামীজী : 'লোকে বলে, ভিতরে গুফা অর্থাৎ তয়খানা গোছের ঘর আছে, তিনি তন্মধ্যে থাকেন। কি করেন তিনিই জানেন, কেহ কখনও দেখে নাই। একদিন যাইয়া অনেক হিম খাইয়া বসিয়া বসিয়া চলিয়া আসিয়াছি, আরও চেষ্টা করিব। রবিবার কাশীধাম যাত্রা করিব—এখানকার বাবুরা ছাড়িতেছেন না, নহিলে বাবাজি দেখিবার সখ আমার গুটাইয়াছে।'

গুরুকা ঘরমে গো য্যায়সা পড়া রহনা। প্রভুর দ্বারে পড়ে থাকাই আসল কাজ। পড়ে থাকতে পারলে প্রভুর দয়া হবেই হবে। তুমি যে তোমার দুয়ার ধরে পড়ে থাকতে দিয়েছ এই তো তোমার অকৃপণ দয়া। আর কিছু করে উঠতে না পারি পড়ে থাকতে পারব। আমার পড়ে থাকাই ধরে থাকা।

কতগুলি লোক নদীর দিকে যাচ্ছে। একটা লোক তাদের সঙ্গ নিল। কোথায় যাচ্ছ? ওপার। লোকগুলির সঙ্গে সেও নদী পার হল। ওপারে গিয়ে দেখে আবার কতগুলি লোক নদীর দিকে যাচ্ছে। কোথায় চলেছ? ওপার। আবার মিলল যাত্রীদল, আবার তাদের সঙ্গে চলে গেল ওপার। তোমরা আবার কারা? আমরা ওপার চলেছি। আবার তাদের সঙ্গ নিল। কোনটা যে আসল পার স্থির করতে না পেরে এপার ওপার করতে লাগল। তখন হঠাৎ নদীতীরে এক সাধুর সঙ্গে দেখা। লোকটা তখন তাকে গিয়ে জিগগেস করলে, মহারাজ, পার কোথায়? কি করে পার পাব?

সাধু বললে, একধারে বসে পড়। যেখানে বসবে সেই তোমার পার।

পার কহে তো ওপার
ওপার কহে তো পার।
বইঠ কিনারা পাকড় রহ
যো পার সোই ওপার।

২৯

আফিম আপিসের বড়বাবু গগনচন্দ্র রায়ের বাড়িতে এসে উঠেছে স্বামীজি। দেখব যখন মনে করেছি দেখে যাবই। পওহারী বাবার আশ্রমের কাছাকাছি এক লেবুর বাগান। সেখানেই দিনরাত পায়চারি করে, আর থেকে থেকে বাবাজির দরজায় গিয়ে বসে থাকে। ফিরবনা বাড়ি খাবনা ভাত-জল, লেবুর রস খেয়ে থাকব।

বাবাজি দর্শন দিলেন। দর্শন মানে চাক্ষুষ দর্শন নয়। দরজার ওপাশ থেকে গভীর মধুর সম্ভাষণ।

বলরাম বসুকে চিঠি লিখছে বিবেকানন্দ : 'বহু ভাগ্যবলে বাবাজির সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি অতি মহাপুরুষ—বিচিত্র ব্যাপার, এবং এই নাস্তিকতার দিনে ভক্তি এবং যোগের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার অদ্ভুত নিদর্শন। আমি ইঁহার শরণাগত হইয়াছি, আমাকে আশ্বাসও দিয়াছেন, সকলের ভাগ্যে ঘটেনা। বাবাজির ইচ্ছা—কয়েক দিবস এই স্থানে থাকি, তিনি উপকার করিবেন। অতএব এই মহাপুরুষের আজ্ঞানুসারে দিন কয়েক এস্থানে থাকিব। ইহাতে আপনিও আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। পত্রে লিখিবনা, কথা অতি বিচিত্র, সাক্ষাতে জানিবেন। ইঁহাদের লীলা চক্ষে না দেখিলে শাস্ত্রে বিশ্বাস পুরা হয় না।'

এখন মিষ্টি ডাক মিষ্টি কথা কোনোদিন শোনেনি স্বামীজি।

'তিতিক্ষা ক্যায়সে বনে?' স্বামীজি জিগগেস করল।

'দাস ক্যা জানে?'

একদিন দরজা খুলে দিল পওহারী। প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের দেখা হল। যে প্রশ্ন সেই উত্তর।

চিঠি লিখছে স্বামীজি : 'বাবাজি আচার বৈষ্ণব, যোগ ভক্তি এবং বিনয়ের মূর্তি বলিলেই হয়। তাঁহার কুটির চতুর্দিকে প্রাচীর দেওয়া, তাহার মধ্যে কয়েকটি দরজা আছে। এই প্রাচীরের মধ্যে এক অতি দীর্ঘ সুড়ঙ্গ আছে, তন্মধ্যে ইনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়া থাকেন। যখনই উপরে আসেন তখনই লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা কহেন। কি খান কেহই জানেনা। মধ্যে একবার পাঁচবৎসর একবারও গর্ত হইতে উঠেন নাই, লোকে জানিয়াছিল যে শরীর ছাড়িয়াছেন, কিন্তু আবার উঠিয়াছেন। কথা অভূতপূর্ব মিষ্ট কিন্তু যেন আগুন বাহির হয়। আমাকে বলেন, আপনি কিছুদিন এস্থানে থাকিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। এ প্রকার কখন কহেননা। আমি আশায়-আশায় আছি। আপনার ইচ্ছা থাকে পত্রপাঠ চলিয়া আসুন। ইনি অতি পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু কিছুই প্রকাশ পায় না, আবার কর্মকাণ্ডও করেন, পূর্ণিমা হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত হোম হয়। সে সময় গর্তে যাইবেন না নিশ্চিত। আপনি চলিয়া আসুন। ইঁহার সঙ্গ না হইলেও, এ প্রকার মহাপুরুষের জন্যে কোন কষ্টই বৃথা হইবেনা।'

কোমরে বাত হয়েছে স্বামীজির। চলতে পারে না। দুদিন যেতে পারেনি আশ্রমে। পওহারী বাবা লোক পাঠিয়েছে, কেন আসছনা? তোমাকে না দেখে মন বড় উচাটন।

এবার একেবারে আশ্রমের ভিতরে স্বামীজিকে টেনে আনল পওহারী। একেবারে গুহার মধ্যে।

এ কি! গুহার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের পট।

'এ কে?' জিগগেস করল স্বামীজি।

'সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার।'

পওহারীর উপরে শ্রদ্ধা আর অনুরাগ আরো বেড়ে গেল স্বামীজির। স্বামীজির আকাঙ্ক্ষা হল পওহারীর কাছ থেকে দীক্ষা নিই। অন্তত তাঁর কাছ থেকে

হঠযোগের ক্রিয়াটা শিখে নিলে যে কোমরের বাত সেরে যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

'আপনার কাছ থেকে দীক্ষা নিতে চাই।' বললে স্বামীজি।

'আমার কাছ থেকে? তুমি?'

'হ্যাঁ, আপনার মত জানতে চাই যোগমার্গের রহস্য। দীর্ঘকাল একাসনে বসে থাকার সমাধি।'

পওহারী হাসল, বললে, 'খুব ভালো কথা কিন্তু লগ্ন আসুক।'

স্বামীজির সংকল্পের কথা শুনতে পেল বরানগর। তারা প্রতিবাদ করে উঠল, রামকৃষ্ণভক্তের আবার গুরু কে! আবার কিসের দীক্ষা!

গাজীপুর থেকে অখণ্ডানন্দকে চিঠি লিখছে স্বামীজি : 'এখানে পওহারীজি নামক যে অদ্ভুত যোগী ও ভক্ত আছেন, এক্ষণে তাঁহারই কাছে রহিয়াছি। ইঁনি ঘরের বাহির হননা—দ্বারের আড়াল হইতে কথাবার্তা কহেন। ঘরের মধ্যে এক গর্ত আছে তন্মধ্যে বাস করেন। শুনিতে পাই, ইঁনি মাস-মাস সমাধিস্থ হইয়া থাকেন। ইঁহার তিতিক্ষা বড়ই অদ্ভুত। আমাদের বাঙ্গালা ভক্তির দেশ ও জ্ঞানের দেশ, যোগের বার্তা একেবারে নাই বলিলেই হয়। যাহা কিছু আছে তাহা কেবল বদ্‌খত দমটানা ইত্যাদি হঠযোগ—তা জিমনাস্টিকস। এই জন্য এই অদ্ভুত রাজযোগীর নিকট রহিয়াছি—ইঁনি কতক আশাও দিয়াছেন। এখানে একটি বাবুর একটি ছোট্ট বাগানে একটি সুন্দর বাংলা ঘর আছে, ঐ ঘরে থাকিব। উক্ত বাগান বাবাজির কুটিরের অতি নিকট। ঐখানেই ভিক্ষা করিব। অতএব এ রঙ্গ কতদূর গড়ায় দেখিবার জন্য এক্ষণে পর্বতারোহণসংকল্প ত্যাগ করিলাম। কোমরে দুমাস ধরিয়া একটা বেদনা—বাত হইয়াছে, তাহাতেও পাহাড়ে ওঠা এক্ষণে অসম্ভব। অতএব বাবাজি কি দেন, পড়িয়া পড়িয়া দেখা যাউক। আমার মূলমন্ত্র এই যে, যেখানে যাহা কিছু উত্তম পাই, তাহাই শিক্ষা করিব। ইহাতে বরানগরের অনেকে মনে করে যে গুরুভক্তির লাঘব হইবে। আমি ঐ কথা পাগল এবং গোঁড়ার কথা বলিয়া মনে করি। কারণ, সকল গুরুই এক এবং জগদগুরুর অংশ ও আভাসস্বরূপ।'

দীক্ষার দিন এবার তবে ঠিক করতে যেতে হয়।

বাবাজির গুহার দিকে যাবে বলে যাত্রা করেছে স্বামীজি, এ কি, পা যেন কে টেনে ধরেছে! সমস্ত শরীর ভার, পাথর হয়ে উঠেছে। কোমরের বাত পায়ে নামল নাকি?

তবু জোর করে চলতে চাইল স্বামীজি। সাধ্য কি পায়ের শৃঙখল মুক্ত করে। নিশ্চয়ই এ এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছে তাকে নিয়তি। এ পরীক্ষায় সে নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হবে। শরীর অপটু হোক কিন্তু মন সক্ষমসমর্থ। শরীরকে বন্দী করতে পারো কিন্তু মন সমস্ত বন্ধনবেষ্টনের ওপার।

দীক্ষার দিন ঠিক করে পাঠালেন বাবাজি।

আগের রাত্রে লেবুবাগানের ছোট ঘরটিতে একটি খাটিয়ার উপর শুয়ে আছে বিবেকানন্দ, দেখতে পেল ঘর আলো করে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে।

কে? ধড়মড় করে উঠে বসল স্বামীজি।

স্থির স্নিগ্ধ মূর্তি। আয়ত প্রশান্ত চোখ দুটিতে কোমল বিষণ্ণতা।

চিনতে কি আর ভুল হয়? শুধু বরানগরের মঠে নয়, গাজীপুরে বাবাজির গুহায় নয়, প্রতি ঘরে-ঘরে যাঁর একদিন পট পুজো হবে সেই শ্রীরামকৃষ্ণ।

চোখ দুটি স্বামীজির চোখের উপর ফেলল সেই মূর্তি। সেই চোখদুটি জলভরা, স্নেহভরা, ব্যথাভরা।

দুহাতে মুখ ঢাকল বিবেকানন্দ। আমি কি অবিশ্বাসী, আমি কি অকৃতজ্ঞ!

মূর্তি আর নেই।

তবে কি শুধু ছায়া? শুধু একটা মনের ভেলকি?

'পওহারীজির সঙ্গে আর দেখা করিতে যাইতে পারি নাই', আবার চিঠি লিখছে বিবেকানন্দ : 'কিন্তু তাঁহার বড় দয়া, প্রত্যহ লোক পাঠাইয়া খবর নেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি, উল্টা সমঝালি রাম। কোথায় আমি তাঁহার দ্বারে ভিখারী, এখন তিনি আমার কাছে শিখিতে চাহেন! বোধহয় ইনি এখনও পূর্ণ হন নাই, কর্ম এবং ব্রত এবং আচার অত্যন্ত, এবং বড় গুপ্তভাব। সমুদ্র পূর্ণ হইলে কখনও বেলাবদ্ধ থাকিতে পারেনা, নিশ্চিত। অতএব অনর্থক ইঁহাকে উত্তেজিত করা ঠিক নহে স্থির করিয়াছি। শীঘ্রই বিদায় লইয়া প্রস্থান করিব। কি করি, বিধাতা নরম করিয়া যে কাল করিয়াছেন। বাবাজি ছাড়েননা, আবার গগনবাবুও ছাড়েননা। বাবাজির তিতিক্ষা অদ্ভুত, তাই কিছু ভিক্ষা করিতেছি, কিন্তু উপুড়হস্তের নামটি নাই, খালি গ্রহণ, খালি গ্রহণ। অতএব আমিও প্রস্থান।'

পওহারী বাবা খবর পাঠালেন, দীক্ষার দিন নতুন করে ধার্য করা হয়েছে। এবার যেন আসতে ভুল না হয় স্বামীজির।

না, এবার ঠিক যাবে। সেদিন রাতে যে মূর্তি দেখেছিল ঘরের মধ্যে সে শুধু তার চিন্তাজ্বরজীর্ণ মনের রচনা। বাবাজির যখন এত আগ্রহ তখন একবার নেওয়া যাক তাঁর উপলব্ধির সংস্পর্শ। লোক মারফৎ জানিয়ে দিল তার সমর্থন। যাবে নির্ধারিত সময়ে। এবারের লগ্ন বিফল হতে দেবেনা।

কিন্তু আবার আগের রাত্রে সেই আগেকার রাত্রির মূর্তি। আবার এসে দাঁড়িয়েছেন ছলছল চোখে। মুখে সেই বিষাদমাখানো মমতা, সেই করুণাবিধৌত বাৎসল্য।

তুই আমাকে ছেড়ে যাবি? আমি তোর কেউ নই?

তুমি? তুমি-ছাড়া আমার আর কে আছে? তুমি-ছাড়া আমি নক্ষত্রহীন দ্যুলোক, বায়ুহীন আকাশ, শস্যশূন্য পৃথিবী, সংস্কারহীন বাক্য, সলিলহীন তরঙ্গিণী, হতসিংহ গিরিকন্দর। তোমার কমলদলকোমল পাণিতল দাও আমার করতলে। আমাকে তুমি ছেড়োনা।

শুধু একরাত্রি নয়, পর-পর পাঁচ রাত্রি দেখা দিলেন ঠাকুর।

দিগন্তে অস্ত হল দীক্ষার দিন।

'আর কোনো মিঞার কাছে যাইবনা। আপনাতে আপনি থেকো, যেওনা মন কারু ঘরে। যা চাবি তাই বসে পাবি খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে।' আবার চিঠি

লিখছে স্বামীজি : 'তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই, আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালবাসা আমার পিতামাতাও কখনও বাসে নাই। ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা কঠোর সত্য এবং তাঁহার শিষ্যমাত্রেই জানে। বিপদে, প্রলোভনে, ভগবান রক্ষা কর, বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি, কেহই উত্তর দেয় নাই, কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন, নিজে অন্তর্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন। যদি আত্মা অবিনাশী হয়, যদি এখনও তিনি থাকেন, আমি বারংবার প্রার্থনা করি, হে অপারদয়ানিধে, হে মমৈকশরণদাতা রামকৃষ্ণ ভগবন, কৃপা করিয়া আমার এই নরশ্রেষ্ঠ বন্ধুবরের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।'

সবই পূর্ণ। পূর্ণের থেকে পূর্ণ চলে গেলেও পূর্ণ।

গাজীপুর থেকে আবার চলে এল বারাণসী।

৩০

কাশীতে এসে খবর পেল বলরাম বসু দেহ রেখেছে।

শোকে ভেঙে পড়ল স্বামীজি। ঠাকুরের গৃহীভক্তদের প্রথম লাইনের একজন এই বলরাম। কত দিনের কত স্মৃতি দিয়ে শ্রীমন্ত সেই মূর্তি। যার বাড়ি ছিল ঠাকুরের 'কলকাতার কেল্লা।' যার বাড়ির অন্ন ঠাকুরের কাছেও শুদ্ধান্ন। ঠাকুরের রসদদারদের একজন।

প্রমদাবাবু প্রমাদ গুনলেন। বললেন, 'আপনি এমন একজন বৈদান্তিক, আপনার মৃত্যুশোক!'

'বলবেন না ও কথা। সন্ন্যাসী হয়েছি বলে কি হৃদয় খুইয়ে এসেছি? চোখের জল কি ধোঁয়া হয়ে গিয়েছে?'

বাড়ির কর্তা হয়ে দাসের মত থাকতেন, কত বড় ভক্ত এই বলরাম। অর্থ সঞ্চয় করতেন সাধুসেবার জন্যে। ছোট একখানি শতরঞ্চি পেতে শুচ্ছেন, লাটু বললে, আপনার এত পয়সা, আপনার এই হাল কেন? বলরাম হেসে বললে, মাটির দেহ মাটিতে মিশবে, কিন্তু বিছানার পয়সা সাধুসেবায় লাগাব।

যার জন্যে একবার শ্রীমার উপরেও বিরক্ত হয়েছিলেন ঠাকুর। বলরামের স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনীকে ঠাকুর বলতেন, অষ্টসখীর প্রধানা। তার ভারি অসুখ করেছে। মাকে ঠাকুর বললেন, একবার গিয়ে দেখে এস। কিন্তু মা কি করে যাবেন, গাড়ি কই, পালকি-ডুলি কই? ঠাকুর বললেন, 'কেন, হেঁটে যাবে। আমার বলরামের সংসার ভেঙে যাচ্ছে আর তুমি কিনা গাড়ি পেলেনা বলে যাবেনা?'

না, যাচ্ছি। গাড়ি পাওয়া গিয়েছে ঠিক। পায়ে হাঁটবার দরকার নেই।

এই সেই বলরাম যার বাড়িতেই ঠাকুরের পূতাস্থিভস্ম রাখা হয়েছে। বলরাম

চলে গেল কে আর তবে তা আগলাবে সযত্নে? কোথাও কি একটুকরো জমি পাওয়া যাবেনা যেখানে সেই অস্থিভস্মের সমাধি হতে পারে?'

কলকাতায় ফিরে এল স্বামীজি। কাশীতে প্রমদা দাসকে চিঠি লিখলে :

'যাঁহার জন্মে আমাদের বাঙগালীকুল পবিত্র ও বঙগভূমি পবিত্র হইয়াছে—যিনি এই পাশ্চাত্ত্য বাকছটায় মোহিত ভারতবাসীর পুনরুদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—যিনি সেই জন্যই অধিকাংশ ত্যাগী শিষ্যমণ্ডলী ইউনিভার্সিটি-মেন হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই বঙগদেশে তাঁহার সাধনভূমির সন্নিকটে তাঁহার কোনো স্মরণচিহ্ন হইল না, ইহার পর আর আক্ষেপের কথা কি আছে? সুরেশচন্দ্র মিত্র এবং বলরাম বসু নামক রামকৃষ্ণের দুই গৃহস্থ শিষ্যের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে গঙগাতীরে একটি জমি ক্রয় করিয়া তাঁহার অস্থি সমাহিত করা হয় এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দও তথায় বাস করেন এবং সুরেশবাবু তজ্জন্য এক হাজার টাকা দিয়াছিলেন এবং আরও অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায়ে তিনি কল্যরাত্রে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার এই গদি ও অস্থি লইয়া কোথায় যায় কিছুই স্থিরতা নাই। (বঙগদেশের লোকের কথা অনেক, কাজে এগোয় না, আপনি জানেন) তাহারা সন্ন্যাসী, তাহারা এইক্ষণেই যথা ইচ্ছা যাইতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহাদিগের এই দাস মর্মান্তিক বেদনা পাইতেছে, এবং ভগবান রামকৃষ্ণের অস্থি সমাহিত করিবার জন্য গঙগাতীরে একটু স্থান হইল না ইহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।'

ঠাকুরের আরেকজন রসদদার এই সুরেন বা সুরেশ মিত্তির। ঠাকুরের কাশীপুরের বাড়ির ভাড়া যুগিয়েছে, যার টাকাতেই বরানগর মঠের সূত্রপাত। শুধু তাই নয় যার হাতেই ঠাকুরের জন্মোৎসবের প্রবর্তন। ঠাকুরের ভক্তদের জন্যে ব্যয় করতে না পারলেই যার অভিমানের পর্বত।

'মশাই, আমাদের আর কেন যন্ত্রণা দিচ্ছেন?' সেদিন ঠাকুরকে বললে সুরেন মিত্তির।

ঠাকুর তো অবাক।

'মশাই, আমরা পাপী এ কে না জানে। কিন্তু আপনার সংস্পর্শে এসে আমাদের কী উন্নতি হল? আমরা কোন ছাই সাধু হলাম!'

ঠাকুর হাসতে লাগলেন।

'আমরা আপনার মত মহাপুরুষের কাছে সর্বদা আসছি, হরি বলে নৃত্য করছি, ভাবে গদগদ হচ্ছি, লোকে ভাবছে খুব সাধু হয়েছি আমরা, কিন্তু যদি হৃদয়কে জিগগেস করা যায় সে বলবে এক বিন্দুও সাধুর বাতাস পাইনি। যে সব অসৎ সংস্কার ছিল সব ঠিক-ঠিক বজায় আছে। এ আমাদের কি দশা! বরং, লাভের মধ্যে, শঠতা শিখলাম। আগে এমন করে কাঁদতে পারতাম না, এখন বেশ কাঁদছি।'

'তোমাকে কাঁদতে কে বলেছে, তুমি আনন্দে থাকো।'

'আনন্দে থাকব?'

'হ্যাঁ, আনন্দে থাকো। তোমাকে সাধু সাজতে হবেনা। তোমার আনন্দই

তোমাকে সাধু করবে।'

'আনন্দে থাকবার উপায় কি?'

'এক উপায়। শুধু মা-মা বলো, মাকে ডাকো। যেখানে খুশি সেখানে যাও, শুধু আনন্দময়ী মাকে সঙ্গে নিয়ে যাও।'

সুরেশ আরেক দিন এসেছে ঠাকুরের কাছে। মনে সুখ নেই।

'কি হল?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'কিছুই হচ্ছেনা। না জপ না ধ্যান না কিছু।'

'কি করো তবে?'

'মা-মা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ি।'

'বেশ, তা হলেই হল।'

সেই সহজ পথের পন্থী সুরেশ মিত্তিরও চলে গেল।

'রাখালকে বলবে, লোকে যা হয় বলুক'গে। লোক না পোক!' শশী মহারাজাকে লিখছে স্বামীজি : 'শুধু তোমাদের ভাবের ঘরে যেন চুরি না থাকে। আর কখনো কপটতার দিক মাড়াবে না। অনুষ্ঠানী পৌরাণিক হিন্দু আমি কোন কালে, বা আচারী হিন্দু আমি কোন কালে? আই ডু নট পোজ য়্যাজ ওয়ান। বাঙালীরা কি বলে না বলে, ওসব কি গ্রাহ্যের মধ্যে নিতে হয় নাকি? যাঁর জন্মে ওদের দেশ পবিত্র হয়ে গেল, তাঁর একটা সিকি পয়সার কিছু করতে পারলেনা, আবার লম্বা কথা! রাম! রাম! আহার গেঁড়িগুগলি, পান পুকুরজল, ভোজনপাত্র ছেঁড়া কলাপাতা, শয্যা ভিজে মাটির মেঝে, মুখে যত জোর! ওদের মতামতে কি আসে যায়? তোরা আপনার কাজ করে যা। মানুষের কি মুখ দেখিস, ভগবানের মুখ দ্যাখ।'

বরানগর মঠে দু মাস কাটিয়ে স্বামীজি ঠিক করল আবার নিরুদ্দেশ হব। এবার আর ফিরবনা। চলে যাব হিমালয়।

অখণ্ডানন্দ সদ্য ফিরেছে কাশ্মীর থেকে। তার কাছে যত রাজ্যের রোমহর্ষ গল্প শুনছে স্বামীজি। কাশ্মীরের কথা, তিব্বতের কথা, কেদারবদরীর কথা। এবার তবে চলো হিমালয়—মৌন, ধ্যান ও যোগের লীলালোকে।

মঠের খরচ না হয় এখন গিরিশ ঘোষ চালাচ্ছে, কিন্তু হিমালয়ে যাবার ভাড়া কোথায়?

সারদানন্দ তখন আলমোড়ায়, তাকে চিঠি লিখছে স্বামীজি।

'আমি শীঘ্রই, অর্থাৎ ভাড়ার টাকা যোগাড় হলেই আলমোড়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। সেখান হইতে গঙ্গাতীরে গাড়োয়ালের কোন এক স্থানে গিয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার ইচ্ছা। গঙ্গাধর, অখণ্ডানন্দ আমার সঙ্গে যাইতেছে। বলিতে কি, আমি শুধু এই বিশেষ উদ্দেশ্যেই তাহাকে কাশ্মীর হইতে নামাইয়া আনিয়াছি। এবার আর পওহারী বাবা ইত্যাদি কাহারও কাছে নহে, তাহারা কেবল লোককে নিজ উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। এবার একেবারে উপরে যাইতেছি। তোমাদের ঘোরা যথেষ্ট হইয়াছে। উহা ভাল বটে, কিন্তু দেখিতেছি,

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

এ পর্যন্ত একমাত্র যে জিনিসটি তোমাদের করা উচিত ছিল তোমরা সেইটিই কর নাই। অর্থাৎ, কোমর বাঁধো এবং বৈঠ্ যাও। মূর্খ ভবঘুরে হইও না, বীরের মত অগ্রসর হও। ক্রমাগত কাজ করিয়া যাও, বাধা-বিপত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হও।'

ঘুষুড়িতে আছেন তখন শ্রীমা, দেখা করতে গেল স্বামীজি।

বললে, 'মা, আমি চললুম।'

মা চমকে উঠলেন : 'কোথায়?'

'হিমালয়ে। তুঙ্গতম তীব্রতম তপস্যায়। মাগো, আমি আর ফিরব না।'

'সে কি? ফিরবে বৈ কি। আমি যে পথ চেয়ে থাকব।'

'না মা, এবার মহত্তম জ্ঞান পরিপূর্ণতম উপলব্ধির জন্যে চলেছি। যতক্ষণ তা না পাই, কি হবে ফিরে এসে? এমনটি হওয়া চাই যেন যাকেই স্পর্শ করব সে-ই মুহূর্তে নবীনতরো মানুষ হয়ে উঠবে। নিজে যদি স্পর্শমণি হতে না পারি তা হলেই তো প্রমাণ হল ঈশ্বর আমাকে স্পর্শ করেননি। সেই পরাজয় মানব না কিছুতেই। কিন্তু কতদিনে সফল হব তা কে বলবে।'

স্নেহকরুণ চোখে স্বামীজিকে দেখতে লাগলেন শ্রীমা।

এই তাঁর সেই নরেন।

দক্ষিণেশ্বরে এলেই ঠাকুর তাকে রেখে দিতে চাইতেন আর অমনি খবর পাঠাতেন মাকে, ওগো নরেন এসেছে। মোটা মোটা করে রুটি বানাও আর খুব ঘন করে ছোলার দাল। দেখো যেন রুগীর পথ্য কোরো না।

রাখাল ঠাকুরের ছেলে কিন্তু নরেন মায়ের ছেলে। সপ্তর্ষিলোক থেকে নেমে এসেছে।

যেদিন দেহ ছাড়বেন, বিছানায় বালিশে ভর দিয়ে বসে আছেন ঠাকুর, মাকে আর লক্ষ্মীকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা আসতেই ঠাকুর বললেন, 'এসেছ? দেখ আমি যেন কোথায় যাচ্ছি, জলের ভেতর দিয়ে—অনেক, অনেক দূর।'

শ্রীমা কাঁদতে লাগলেন। তবে বুঝি ঠাকুর আর থাকবেন না।

'কাঁদছ কেন? তোমার ভাবনা কি?' কাছে দাঁড়ানো নরেনের দিকে ইঙ্গিত করলেন ঠাকুর : 'তোমার তো নরেনই আছে।'

আমার তো নরেনই আছে।

সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছি বাবা। সর্বতপস্যায় সিদ্ধ হও। ফিরে এস মার আঁচলে। ধুলো মুঠো ধরে সোনা মুঠো করে দাও।

৩১

এত জায়গা থাকতে এল কিনা ভাগলপুর।

কলকাতা থেকে যে বেরিয়ে আসতে পেরেছি তার কাঁকর-পাথরের শুষ্কতা থেকে

এই অনেক শান্তি। স্তব্ধ প্রান্তর মুক্ত আকাশ উধাও-ধাওয়া হাওয়া—আর কি চাই। আর, নতুন জায়গা দেখার আনন্দ। নতুন জায়গা দেখার চেয়েও বেশি সুখ নতুন মানুষ দেখা।

একটা মানুষের হৃদয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো একটা সমুদ্রের তীরে গিয়ে দাঁড়ানো। একটা মানুষের হৃদয় জয় করা মানে একটা সাম্রাজ্য লুট করে নেওয়া।

কুমার নিত্যানন্দ সিংহের বাড়িতে গিয়ে উঠল। সেখান থেকে তার গৃহশিক্ষক মন্মথনাথ চৌধুরির বাড়ি।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর বৈঠকখানায় বসে গল্প করছে মন্মথ আর তার বন্ধু দানাপুরের উকিল মথুরা সিং, স্বামীজি আর অখণ্ডানন্দ এসে হাজির। পরনে ছেঁড়াখোঁড়া গেরুয়া, হাতে দণ্ড-কমণ্ডলু। যেমন শহরে-বাজারে সাধু দেখা যায় তেমনি। এমনি মনে হল মন্মথর। বসতে বললে বটে কিন্তু আর যেন কথা কইবার উপযুক্ত নয়। ইংরিজি একটা বই খুলে তাতেই ডুবে গেল।

স্বামীজিই কথা কইল। জিগগেস করল, 'ওটা কি পড়ছেন?'

লোকটার স্পর্ধা তো কম নয়। পেট-ভিখারী সাধু, কুঁজোর কিনা চিৎ হয়ে শুতে চাওয়া। গম্ভীরমুখে মন্মথ বললে, 'গৌতম বুদ্ধ সম্বন্ধে একটা বই।'

সপ্রতিভের মত স্বামীজি বললে, 'ইংরিজি?'

প্রশ্নের ধরনে বুঝি অবাক হল মন্মথ। জিগগেস করল, 'আপনি ইংরিজি জানেন?'

'যৎসামান্য।'

'গৌতম বুদ্ধের নাম শুনেছেন?'

'একটু-আধটু। আপনারই মত।'

একেবারে আকাট বলে মনে হচ্ছেনা। দেখা যাক না একটু আলাপ করে। মন্মথ বৌদ্ধধর্মের কথা পাড়ল। তর্ক তুলল।

ওরে বাবা, এ যে প্রকাণ্ড পণ্ডিত। সমুদ্রের কাছে গেড়ে-ডোবা এমনি মন্মথর মনে হল নিজেকে। মথুরা সিংও বসল খাড়া হয়ে।

কথা উঠল, ভিক্ষু কে?

যে সর্বত্র সংযত, চোখে কানে ঘ্রাণে জিহ্বায়, কায়ে মনে বাক্যে, সেই ভিক্ষু। তার হাত কাউকে প্রহার করতে উদ্যত হয়না, তার পা বিচার-বিবেচনা করে ধীর-স্থির থাকে। মিথ্যাবাক্যে অন্যের মনে দুঃখ দেয়না, মিত ঋত ও হিতকথায় যে অন্যের উপকার সাধন করে। যে একচারী সতত সন্তুষ্ট ধ্যানপরায়ণ সেই সদানন্দময় অর্হৎ পুরুষই ভিক্ষু।

কে এ সাধু! আপনারা আমার এখানে থাকবেন?

কেন থাকবনা? থাকবার জন্যেই তো এসেছি।

একদিন যোগসাধনের কথা উঠল। এ বিষয়েও পারংগত স্বামীজি। দয়ানন্দ স্বামীর কাছ থেকে যোগসম্বন্ধে কিছু-কিছু শুনেছিল মন্মথ, দেখল তার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এমন সব কথা বলছে যা আগে শোনেনি কোনোদিন।

বাতশূন্যদেশস্থিত দীপ যেমন নিষ্কম্প থাকে মনকে তেমনি বিনিশ্চল করো।

ঈশ্বরকে পাবার সহজ উপায় কি?

সাধুসঙ্গ। যোগ, সাংখ্য-বিবেক, অহিংসা, জপ, কৃচ্ছ্র, সংন্যাস, ইষ্টাপূর্ত, দান, ব্রত, যজ্ঞ, মন্ত্র, তীর্থ, যম-নিয়ম এগুলি কেউই ঈশ্বরকে বশীভূত করতে পারেনা, সর্বসঙ্গনাশক সাধুসঙ্গ যেমন পারে।

আর লোকহিতকর কর্ম করো। যে পর্যন্ত সর্বভূতে ব্রহ্মভাব না জন্মায় সে পর্যন্ত সর্বভূতকে ব্রহ্মজ্ঞানে কায়মনোবাক্যে সেবা করো। জীব আর কিছু নয়, শিবেরই নামান্তর, আকারান্তর। শিবজ্ঞানে জীবসেবা করো।

হাতা ব্রহ্ম হবি ব্রহ্ম অগ্নি ব্রহ্ম হোতা ব্রহ্ম, এমনি কর্মমাত্রই ব্রহ্ম যার দৃষ্টি সেই ব্রহ্মকে লাভ করে।

সংস্কৃতও বেশ জানা আছে মনে হচ্ছে। উপনিষদ পড়তে পারেন?

একটু-আধটু।

একটু শোনাবেন পড়ে?

শোনাচ্ছি। না, না, বই আনবার দরকার নেই। এমনিতেই মনে আছে কিছু কিছু।

আবৃত্তি করতে লাগল স্বামীজি। মন্মথ আর মথুরা তো নিস্পন্দ! কি না জানে এই সাধু! ইংরিজি, সংস্কৃত, সমস্ত যোগশাস্ত্র। তারপর উপনিষৎরাশি।

বেদান্তের অনুবন্ধ চারটি। প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রয়োজন।

বুঝিয়ে দিন।

প্রমাতা মানে অধিকারী। প্রমাণ মানে সম্বন্ধ। প্রমেয় মানে বিষয়। প্রয়োজন মানে ফল। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি সামনে অন্ন দেখলে কি করে? অন্ন ভক্ষণ করে। ভক্ষণ কেন করে, করলে কি হয়? ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, পুষ্টিতুষ্টি হয়। এখানে ক্ষুধার্ত ব্যক্তি প্রমাতা। অন্ন প্রমেয়। অন্নদর্শন ও অন্নভক্ষণ প্রমাণ। ক্ষুন্নিবৃত্তি, তুষ্টি-পুষ্টিলাভ প্রয়োজন। তেমনি বেদান্তের প্রমাতা জীব, প্রমেয় ব্রহ্ম, প্রমাণ চিত্তবৃত্তি, প্রয়োজন অনর্থ-নিবৃত্তি, পরমানন্দলাভ।

আপনি আমার এখানে থাকুন। আতিথেয়তায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মন্মথ।

সাত-সাতদিন থেকে গেল স্বামীজি।

একদিন নিজের মনে গুনগুন করে সুর ভাঁজছে স্বামীজি, শুনতে পেয়ে গুঞ্জরিত হয়ে উঠল মন্মথ। জিগগেস করল, 'আপনি গান জানেন?'

একটু-আধটু।

একটা ধরুন না। সবাই মিলে পিড়াপিড়ি করতে লাগল স্বামীজিকে।

স্বামীজি গান ধরল। যেমন জ্ঞানে তেমনি গানে। উন্মেষনিমেষশূন্য হয়ে শুনতে লাগল সকলে।

ভালো জিনিস আরো অনেকে শুনুক। আমার যা আনন্দ তা সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হোক। মন্মথ পরের দিন বাড়িতে গানের আসর বসাল। অনেক ওস্তাদ গাইয়ে-বাজিয়ের নিমন্ত্রণ হল। বিদগ্ধ সমাজ ভেঙে পড়ল বাড়িতে।

রাত নটা-দশটার মধ্যে আসর উঠে যাবার কথা, কিন্তু স্বামীজি একাই গেয়ে চলল রাত তিনটে পর্যন্ত। কারু জায়গা ছেড়ে ওঠবার নাম নেই। ক্ষুধাতৃষ্ণা সবাই ভুলে গিয়েছে, ভুলে গিয়েছে বাড়ি-ঘরের কথা। কারু খেয়াল নেই এখন কটা রাত। সময়ও যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে গান শুনে।

আরো চাই। আরো শুনব। একটার পর একটা গেয়েই চলেছে স্বামীজি। অবসাদ নেই। অন্যমনস্কতা নেই। কণ্ঠস্বরে নেই এতটুকু ক্লান্তি বা অনানন্দ।

কৈলাসবাবু সঙ্গত করছিল। তার আঙুল কাঠ হয়ে গেল, ব্যথা করে উঠল। তবু থামছে না স্বামীজি। মীলিতনয়নে তন্ময় হয়ে গান গেয়ে চলেছে।

সবাই বুঝলে এ ঐশী শক্তি ছাড়া কিছু নয়।

পরের দিন সবাই আবার ভিড় করল মন্মথর বাড়িতে। আবার শুনব। আবার শোনান।

স্বামীজি রাজি হল না। আর একবার যখন 'না' বলে দিয়েছে তখন লক্ষ উপরোধেও টলবে না স্বামীজি।

একদিন মন্মথ বললে, 'চলুন ভাগলপুরের বড়লোকদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। হেঁটে যেতে হবে না, আমার গাড়িতে করেই যাবেন।'

'বড়লোক!' স্বামীজি গম্ভীরস্বরে বললে, 'বড়লোকের দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ানো সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়।'

মন্মথর ভারি সাধ বাকি জীবন বৃন্দাবনে কাটায় আর সেখানে সাধন ভজন করে। স্বামীজিকে বললে সেই মনের কথা। চলুন বৃন্দাবনে যাই। গোবিন্দের মন্দিরে তিনশো করে টাকা জমা দিলে, আর কিছু ভাবনা নেই, বাকি জীবন নিয়মিত প্রসাদ পেয়ে যাব। খাবার ভাবনাই তো ভাবনা। যখন সে ভাবনা আর থাকবে না তখন মহানন্দে নাম সাধন করব দুজনে।

'ও-সাধন আমার জন্যে নয়।' বললে স্বামীজি : 'স্থির হয়ে বসবার জন্যে আমি আসিনি।'

একদিন ঘরে বসে কাজ করছে মন্মথ, না বলে কয়ে চলে গেল স্বামীজি। মুখোমুখি বিদায় নিতে গেলে যাওয়া হত না, মন্মথ দুহাত মেলে পথ আটকাত। চুপিচুপি চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

শুধু বুদ্ধিমানের কাজ? নিরাসক্ত সর্বপাপবিমুক্ত সন্ন্যাসীর কাজ।

এ কি, স্বামীজি কোথায়? কেউ কিছু বলতে পারছেনা, সবাই একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। তার গুরুভাই বা কোথায়? সেও বেপাত্তা!

ভেবেছিলুম ধরে রাখতে পারব। ভেবেছিলুম অন্তত জানতে দেবে তার পথের ঠিকানা! তুমি কে না কে মন্মথ, তুমি তাকে বাঁধবে। তার ইচ্ছাশক্তির কাছে তোমার ইচ্ছাশক্তি!

তবু কিসের টানে কে জানে মন্মথ বেরিয়ে পড়ল। একবার যেন শুনেছিল স্বামীজি বদরিকাশ্রমে যাবে। চলো তবে সেই বদরিকাশ্রম।

ট্রেনে চেপে বসল মন্মথ। আলমোড়া পর্যন্ত এল। আলমোড়ায় এসে শুনলে

স্বামীজি আরো উত্তরে চলে গিয়েছে।

কেন কে জানে আর এগোতে ইচ্ছা হল না। ঘরে ফিরে এল ঘরের ছেলে।

অখণ্ডানন্দ বললে স্বামীজিকে, চলো বৈদ্যনাথধাম যাওয়া যাক।

বৈদ্যনাথধামে রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে দেখা। এত বড় একটা লোক, বা, দেখা করে যাব বইকি। কিন্তু, খবরদার, ঘুণাক্ষরেও জানতে দেবে না যে আমি ইংরিজি জানি। অখণ্ডানন্দকে স্বামীজি হুঁসিয়ার করে দিল। আমরা অশিক্ষিত সাধারণ সাধুমাত্র এই সবাই মনে করুক।

রাজনারায়ণবাবু তাই এদের সঙ্গে বাঙলাতেই আলাপ চালালেন। কিন্তু বাঙলাই বা এরা কি সুন্দর যে বলে! যেমন কথার ছটা তেমনি বলবার তেজ। আর ইংরিজি জানেনা বলে ইংরিজির বাঙলা প্রতিশব্দ গঠনের কি আশ্চর্য ক্ষমতা! যে সব তর্ক উঠেছে তাতে বেটপকা ইংরিজি শব্দ এসে পড়াই দস্তুর। তাই রাজনারায়ণবাবুরও হয়েছে মুস্কিল। প্রায় প্রতিবাক্যে হোঁচট খেতে হচ্ছে। সামলে নিয়ে এপাশ ওপাশ থেকে বাঙলা শব্দ জুড়ে দিচ্ছেন। ইংরিজি জানেনা অথচ ছোকরা সাধুদের তর্কের ভঙ্গিটি তো বেশ ধারালো।

কি কথার সঙ্গে রাজনারায়ণবাবু ইংরিজি 'প্লাস' কথাটা বলে ফেললেন। বলে ফেলেই বুঝলেন, ভুল হয়ে গিয়েছে, কথাটার মানে তো বুঝবেনা সাধুরা। তখন কি করেন, নিজের একটা আঙুলের উপর আরেকটা আঙুল রেখে যোগচিহ্নের সঙ্কেত করলেন। ব্যাপারটা তখন সাধুদের কাছে বোধগম্য হল!

দেওঘরে একদিন থেকে কাশী। কাশীতে দুদিন থেকে অযোধ্যা। যাবার আগে প্রমদাদাসকে বলে গেল : 'এরপর যখন আসব দেখবেন একটা বোমা হয়ে ফেটে পড়েছি। আর সমস্ত দেশ আমাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে।'

অযোধ্যা থেকে নৈনিতাল।

নৈনিতালে রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের বাড়িতে এসে উঠল। কদিন থাকব? যতদিন পথ আবার না টানে। চোখে এসে না পড়ে দূর পাহাড়ের হাতছানি।

চলো যাই বদরিকার পথে। দিন পনেরো পরেই আবার যাত্রা করল দুজনে। নরেন আর গঙ্গাধর।

যাকে বলে নিটুট নিঃসম্বল, চলেছে দুজনে পায়ে হেঁটে। একটা পাই-পয়সারও মুখ দেখবার আশা নেই কোথাও। তবু চলো এগিয়ে। পাহাড় ডেকেছে। অরণ্য ডেকেছে। ডেকেছে জীবনের সুবিশাল নিস্তব্ধতা।

তিন দিন অবিশ্রাম পায়ে হেঁটে রাত্রে থামল এক ঝর্নার ধারে। একটা বটগাছের নিচে। সেখানে ধ্যানে বসল স্বামীজি।

অসামান্য অনুভূতি হল। অনুভূতি হল আকীটপতঙ্গপিপীলক সমস্তই ব্রহ্ম। অনুভূতিই প্রমাণ। সত্যের মত প্রমাণিত বলে অনুভব করল ব্রহ্মই একমেবাদ্বিতীয়ং। ব্রহ্মে স্বগত ভেদ নেই। গাছে যেমন শাখা শিকড় ফুল পল্লবাদি আছে ব্রহ্মে তেমন নেই। ব্রহ্ম নিরবয়ব, সুতরাং তার অংশ বলে কিছু নেই। স্বজাতীয় ভেদও নেই। এক আম গাছের সঙ্গে আরেক আম গাছের স্বজাতীয় ভেদ আছে, ব্রহ্মে সেরকম

নেই। অহং অনেক কিন্তু আত্মা এক। বিজাতীয় ভেদও নেই। একটা গাছের সঙ্গে একটা শিলার ভেদ আছে, ব্রহ্মে সেরকম নেই। ব্রহ্ম ছাড়া যেমন অন্য আত্মা নেই, তেমনি অন্য জড় পদার্থও নেই।

অতএব কি দেখলাম? দেখলাম চেতন জীব বা জড়জগৎ কিছুই নেই, একমাত্র ব্রহ্ম বিদ্যমান।

ব্রহ্ম অনাদি। নিরতিশয়। অস্তিও বলতে পারোনা, নাস্তিও বলতে পারোনা। সব দিকেই তাঁর হস্ত-পদ, অক্ষিশিরোমুখ, সর্বত্র কান পেতে আছেন, সব কিছু তাঁর আচ্ছাদনে। ইন্দ্রিয় নেই, অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কাজ করেন। চোখ নেই দেখেন, পা নেই চলেন, হাত নেই ধরেন। অসঙ্গ হয়েও সর্বাধার। নির্গুণ হয়েও গুণভোক্তা। অন্তর-বাহির সব তিনি। স্থাবর-জঙ্গম সব তিনি। যে বুঝতে চায়না তার তিনি দূর। যে বুঝতে চায় তার তিনি সন্নিহিত। তিনি জ্যোতির জ্যোতি, প্রকাশকের প্রকাশক। তিনি সমস্ত অন্ধকারের পরপারে।

আলমোড়া পর্যন্তও বুঝি পোঁছুনো হলনা। তার আগেই, একটা জঙ্গলের ধার দিয়ে যাচ্ছে, খিদের কষ্টে অবসন্ন হয়ে বসে পড়ল স্বামীজি। এইখানেই বুঝি শেষশয্যা নিতে হয়। সন্ন্যাসের চমৎকার পরিণাম! লোকে বলবে, রোগে নয় বাঘে নয়, মাত্র খিদের তাড়নায় দেহ ছেড়েছে সন্ন্যাসী। এ আমি কি করে সইব? ঈশ্বর, শক্তি দাও, হাত ধরে তোলো এই ম্রিয়মানকে।

মূর্ছিতের মত শুয়ে পড়ল স্বামীজি। পাশে গঙ্গাধর বসে। সর্বাঙ্গ শিথিল, বিষাদদুর্বল। কোথায় যাবে, কি চাইবে, কেউ বলবার নেই। চারদিকে ঘনবনের শূন্যতা।

কে একজন কাছে এসে দাঁড়াল। এ জঙ্গলে মানুষ আছে?

'কে?' স্বামীজি চোখ চাইল।

'এই জঙ্গলের মধ্যে একটা কবর আছে, আমি তার পাহারাদার।'

'থাকো কোথায়?'

'কবরেরই এক ধারে, আমার কুঁড়েঘরে।'

'আমাদের কিছু খেতে দিতে পারো?'

'পারি।'

একটা শশা নিয়ে এল। খাদ্য আর পানীয় একসঙ্গে। একসঙ্গে মানুষের স্নেহ আর ঈশ্বরের করুণা।

দুই বন্ধুতে খেল তৃপ্তি করে। আবার পথ চলল।

আলমোড়ায় অম্বাদত্তের বাগানবাড়িতে সাধুসন্তদের থাকবার জায়গা আছে, জানা ছিল গঙ্গাধরের। সেইখানে গিয়েই দুজনে উঠল। খবর পেল বৈকুণ্ঠ সান্যাল আর শরৎ মহারাজ আগে থেকেই এখানে আছে, বদ্রীশা থুলঘোড়িয়ার বাড়িতে। তাদের একটা খবর দাও।

বদ্রীশা নিজে এল স্বামীজিকে নিয়ে যেতে। বদ্রীশার প্রীতি-ভক্তির তুলনা হয়না।

তিন সন্ন্যাসী ও এক গৃহী একত্র হল। বিবেকানন্দ, অখণ্ডানন্দ, সারদানন্দ, আর বৈকুণ্ঠ সান্যাল। কিন্তু শান্তি মিলল না। কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম এল স্বামীজির ছোট বোন আত্মহত্যা করে মারা গেছে।

বাণবিদ্ধ পাখির মত যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল স্বামীজি। এই যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে দেখতে পেল ভারতীয় নারীদের অসহায়তার ছবি। কোনো দেশই শক্তিশালী হতে পারেনা যদি সে তার স্ত্রীজাতিকে দুর্বল করে রাখে। কোনো গৃহই স্বর্গ হতে পারেনা যদি সেখানে স্ত্রী শ্রীরূপে না বিরাজ করে। আমাদের দেশ এত অধম কেন, এত অধঃপতিত কেন? শক্তিরূপিণী স্ত্রীজাতির আমরা অবমাননা করেছি বলে। যে গৃহে নারীরা পূজা পায় সেই গৃহেই দেবতারা সানন্দে বসবাস করেন। যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

তাই সারদামণিকে পূজা করলেন রামকৃষ্ণ। তাই তাঁর ব্রাহ্মণী ভৈরবীকে স্ত্রীগুরু-গ্রহণ। তাই তাঁর মাতৃভাব প্রচার।

স্ত্রীজাতির অভ্যুত্থান না হলে জগতের অভ্যুত্থান নেই।

সিস্টার নিবেদিতাকে চিঠি লিখছেন বিবেকানন্দ : 'প্রিয় মিস নোবল, ভারতের জন্য, বিশেষত নারীসমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছেনা, তাই অন্যজাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্‌টিক রক্তই তোমাকে সর্বথা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করেছে।

কিন্তু শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি। এদেশের দুঃখ কুসংস্কার দাসত্ব প্রভৃতি কীদৃশ তা তুমি ধারণা করতে পারোনা। এদেশে এলে তুমি দেখতে পাবে তোমার চারপাশে অর্ধ-উলঙ্গ নরনারীর বাহিনী—তাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে কি বিকট ধারণা! তারা ভয়ে শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে, আর শ্বেতাঙ্গরাও তাদের প্রবল ভাবে ঘৃণা করে। তারপর তুমি যদি আস শ্বেতাঙ্গের দল তোমাকে পাগল ঠাওরাবে আর তোমার সমস্ত গতিবিধি সন্দেহের চোখে দেখবে। তা ছাড়া, তুমি জানো, এদেশের জলবায়ুও গ্রীষ্মপ্রধান, সাধারণ শীতই তোমাদের গ্রীষ্মের মত। শহরের বাইরে কোথাও ইউরোপীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য পাবার উপায় নেই। সর্বত্রই শুষ্কতা ও বিমুখতা। তবু, এ সব সত্ত্বেও তুমি যদি কর্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস কর, তবে আমি তোমাকে শত শত বার স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি। অন্যত্র যেমন, তেমনি এখানেও আমি কেউ নই, তবু আমার যেটুকু সাধ্য সেটুকু দিয়েই তোমাকে আমি সাহায্য করব।'

আলমোড়ায় আর মন টিকলনা, বেরিয়ে পড়ল স্বামীজি। বেরিয়ে পড়ল গাড়োয়ালের পথে। সঙ্গী সারদানন্দ, অখণ্ডানন্দ আর বৈকুণ্ঠ। অন্তর জুড়ে দুই কান্না—এক, বোনের জন্য, আরেক ঈশ্বরের জন্যে। শেষের কান্নাই টেনে নিয়ে যাচ্ছে পর্বতের নিঃসঙ্গতায়, তার ধ্যানমগ্ন গাম্ভীর্যে। এই শেষের কান্নাতেই ডুবে যাবে অন্য আর্তি।

যত যাত্রা তত বাধা। যাঁর মোচন তাঁরই আবার অবরোধ। এক হাতে টানেন,

আরেক হাতে আটকান। এক চোখে প্রশ্রয় আরেক চোখে নিষেধ।

অসুস্থ হয়ে পড়ল অখণ্ডানন্দ। কর্ণপ্রয়াগে এসে তিন দিন অপেক্ষা করতে হল তার ভালো হবার আশায়। সে যদি বা ভালো হল, বাধা এল আরেক মূর্তিতে। দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে ওদিকে, তাই কেদারবদরীর পথ বন্ধ করে দিয়েছে সরকার।

পথ যদি বা খুলল দেখা দিল আরেক বাধা। কর্ণপ্রয়াগ থেকে বেরিয়েছে, স্বামীজি আর অখণ্ডানন্দের দুজনেরই জ্বর এল একসঙ্গে। পথের পাশে একটা চটিতে আশ্রয় নিল।

'কেমন আছ হে গঙ্গাধর?'

'চমৎকার? তুমি?'

'তোমারই মতন।'

'তবে আর শুয়ে কেন?'

'না, ওঠো, চলো, বেরিয়ে পড়ি। জয়ধ্বজার চূড়া ঐ দেখা যাচ্ছে।'

ভালো করে না সারতেই বেরিয়ে পড়ল। চারদিকে শুধু বিরাটের লিপি লেখা। বিরাট আতঙ্ক বিরাট প্রশান্তি। বিরাট আহ্বান বিরাট স্তব্ধতা।

রুদ্রপ্রয়াগে এসে পৌঁছুল। সেখানে এক বাঙালি সাধুর সঙ্গে দেখা। নাম কি আপনার? পূর্ণানন্দ। কবে বেরিয়েছেন বাড়ি ছেড়ে? কেউ জানে না। মৌনের শিলালিপিতে কোথাও এতটুকু ইতিহাসের ইঙ্গিত লেখা নেই। সেই পূর্ণানন্দের যজ্ঞে লোকনেত্রের অলক্ষ্যে কত নামগোত্রহীন পূর্ণানন্দ আত্মাহুতি দিয়েছে কে জানে। তোমাকে এগুতে বলেছেন তুমি এগোও। আমাকে পথের পাশে বসে থাকতে বলেছেন আমি বসে থাকি।

একটা ধর্মশালায় এসে উঠল সকলে। স্বামীজি আর অখণ্ডানন্দের আবার জ্বর এল। এবার আর শক্তি রইলনা যে উঠে বসে। উপায়? এখানে তো একটা কোনো ডাক্তারও নেই। বৈকুণ্ঠ আর শরৎ চোখে অন্ধকার দেখল।

সরকারী সদর আমিন কাছেই কোথাও তাঁবু ফেলেছে তার সঙ্গে দেখা করল দুজনে। কবরেজি টোটকা কিছু দিতে পারি, দেখো, তাতেই আরাম হবে। আরাম কিঞ্চিৎ হল বটে কিন্তু জ্বর আর যায় না। ন মাইল দূরে শ্রীনগর, ডাণ্ডি করে ওঁদের নিয়ে যাও ওখানে। খরচ? যা লাগে আমি দেব। দাঁড়াও, আমিই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

সরকারী সদর আমিন, বদ্রী দত্ত যোশী, সব ব্যবস্থা করে দিল। বৈকুণ্ঠ আর সারদানন্দ চলল পায়ে হেঁটে, ডাণ্ডিতে অখণ্ডানন্দ আর স্বামীজি।

শ্রীনগরে অলকানন্দার ধারে একটি কুটির পেয়েছে সকলে। নদী আর পর্বত, কি জাদুস্পর্শে কে জানে, জ্বরটুকু মুছে নিল গা থেকে। ধীরে ধীরে ফিরে এল স্বাস্থ্যের দীপ্তি, শক্তির উৎসাহ। এখানেই থাকব। স্বামীজি বললে প্রফুল্ল কণ্ঠে।

চলবে কি করে?

কি করে? হাসল স্বামীজি। তিনি মধু আমরা মধুকর। আমাদের তাই মাধুকরী। নারায়ণ হরি। এই বলে গৃহস্থের দরজায় দাঁড়ায় এসে সন্ন্যাসী। গৃহস্থ তার

নিজের খাদ্য থেকে সামান্য একটু অংশ, হয়তো রুটির একটা টুকরো, কিছু ভাজি কিংবা ডাল, দিয়ে দেন সন্ন্যাসীকে। তিন চার পাঁচ বাড়ি ঘুরে যেই নিজের পেট ভরবার মত খাদ্যের সংস্থান হয় সন্ন্যাসী তার ডেরায় ফিরে আসে। বিকেলে আর বেরোয়না। তাই যারা মাধুকরী করে তাদের একবেলা আহার। রাত্রে তাদের অনশন।

সন্ন্যাসীর সঞ্চয় নেই। যা তার আছে ঐ গৃহস্থের ঘরে, গৃহস্থের সেবায়, গৃহস্থের প্রীতিতে। কিন্তু যতটুকু সে দেবে ততটুকু। যতটুকু তোমার দরকার ততটুকু। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে নেয় সেই হরণ করে।

৩২

শ্রীনগর থেকে তেহ্‌রি।

গঙ্গাতীরে একটা পোড়ো বাগান, তার মধ্যে একটা ভাঙা ঘর। যতদিন কেউ না তাড়ায় এইখানেই, এস, বসে পড়ি।

যাত্রা কিসের জন্যে? গন্তব্যস্থলে পেঁছে উপবেশনের জন্যে। উপাসনাই আমাদের উপবেশন। নিত্য প্রার্থনাই আমাদের যাত্রা।

খুব কষে ধ্যান লাগাও। প্রার্থনা করো।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দাদা রঘুনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ হল স্বামীজির। গাড়োয়ালের রাজধানী তেহ্‌রি, তার রাজসরকারের দেওয়ান হচ্ছেন রঘুনাথ। বললেন, 'এখানে নয়, গণেশপ্রয়াগে আমি আপনাদের ধ্যানের জায়গা ঠিক করে দিচ্ছি, গঙ্গা আর বিলাঙ্গনার সঙ্গমস্থানে। সেখানে যান।'

ধ্যান মানে কি? চোখ বুজে আলোকের একটি শিখা-দর্শন। কিসের শিখা? চারদিকের ঘন পুঞ্জীভূত দুশ্ছেদ্য অন্ধকারে করুণার দীপশিখা।

যাবার সব ঠিকঠাক, অখণ্ডানন্দ আবার অসুখে পড়ল। ডাক্তার এসে বললে, পাহাড়ের শীত সহ্য হবেনা, নিচে নেমে যেতে হবে এখুনি।

তথাস্তু। আগে বন্ধু, পরে ঈশ্বর। কে না জানে ঈশ্বরই বন্ধু। তাই গণেশ-প্রয়াগের যাত্রী নেমে চলল মুসৌরি। ঠাকুর যে সব গুরুভাইকে আমার জিম্মায় দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, ওদের কেউ নেই, তুই যদি না দেখিস তো কে দেখবে?

দেরাদুনের সিভিল সার্জনের কাছে চিঠি দিয়ে দিলেন রঘুনাথ। আর দুটো টাট্টু। আর পথে যা দরকার হতে পারে তার খরচপত্র।

ঈশ্বরই বন্ধু। ঈশ্বরই সহযাত্রী।

'আপনার দয়া ভুলব না।' রঘুনাথকে বলছে স্বামীজী : 'যদি আবার সুযোগ আসে আবার আপনার করুণার স্বাদ নেব। যতবারই ধ্যানমৌনের জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছি ততবারই ঠাকুর বাদ সাধছেন। বারেবারে ফিরিয়ে নিয়ে আসছেন সংগ্রামের ক্ষেত্রে।'

পথে পড়ল রাজপুর। শুনল সেখানে হরি-মহারাজ, তুরীয়ানন্দ স্বামী আছে।

এখানে সে কি করছে? ধ্যান করছে।

রাত্রে গাঁয়ে রব উঠেছে, বাঘ এসেছে। ভাঙা ইটের স্তূপ এই তো হরি-মহারাজের ডেরা, কোনোই প্রতিরোধ নেই বাঘকে ঠেকায়। দরজা নেই, দেয়ালও পড়ো-পড়ো। নিশ্চয়ই এ ভাঙা ঘরেই বাঘ ঢুকবে, খাদ্যের জন্যে না হোক, আশ্রয়ের জন্যে। এখন উপায়? দরজার ফাঁক ইট দিয়ে সাজিয়ে বন্ধ করতে চাইল হরিনাথ। খানিকক্ষণ পরে মনের মধ্যে ধিক্কার জেগে উঠল। লাথি মেরে ভেঙে ফেলল ইটের পাঁজা। আমার আর আত্মরক্ষার উপায় নেই? আমি এত নিঃসম্বল?

ঘরের বাইরে অন্ধকারে ধ্যানে বসল হরিনাথ। অদূরে বাঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। কে বাঘ, কে হরিনাথ!

তুরীয়ানন্দ দাঁড়াল এসে স্বামীজির পাশে। রুগীকে নিয়ে চলে এল দেরাদুন।

আগে সিভিল সার্জনকে ডাকাই। তারও আগে দরকার একটা ভদ্র আশ্রয়। সিভিল সার্জনকে ডাকাব কোথায়?

'আমার গুরুভাই বড় অসুস্থ। তাকে কেউ একটু আশ্রয় দেবেন?' দ্বারে-দ্বারে ফিরতে লাগল স্বামীজি: 'কেউ করবেন তার একটু ওষুধপথ্যের ব্যবস্থা?'

এ কি অদ্ভুত ভিক্ষা! নিজের জন্যে নয়, বন্ধুর জন্যে। তাও চাল-ডাল পয়সা-কড়ি নয়, একেবারে একখানি ঘর, একটি আরামের শয্যা, ডাক্তার-পথ্যের রকমারি সরঞ্জাম।

সবাই মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু আবার মানুষের মুখেই তো ঈশ্বরের মুখ। এগিয়ে এলেন আনন্দ নারায়ণ। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ, দেরাদুনের উকিল। তিনি রুগ্ন সন্ন্যাসীর ভার নিলেন। গোটা একটা বাড়ি ভাড়া করলেন। উপযুক্ত ওষুধ-পথ্য তো বটেই, গরম কাপড়চোপড় পাঠিয়ে দিলেন।

'আপনারা?' স্বামীজির দিকে তাকিয়ে জিগগেস করলেন ব্রাহ্মণ।

'আমাদের কোনো ঘরদোরের দরকার নেই।' বললে স্বামীজি: 'আমাদের ভিক্ষা সংস্থান আর বৃক্ষতল আশ্রয়।'

'আপনাদের কিসের দুঃখ? কেন আপনারা কষ্ট করবেন?'

'দুঃখ?' হাসল স্বামীজি: 'দুঃখ আমাদের দেখে দুঃখিত হয়ে চলে গিয়েছে। আমাদের সঙ্গে থাকতে কষ্টের কষ্ট হবে।'

এমন কিছু আছে কিনা
সদানন্দে থাকা যায়,
দুঃখ যেন আমায় দেখে
দুঃখ পেয়ে চলে যায়॥

সর্বং পরবশং দুঃখং, সর্বমাত্মবশং সুখং। যা পরাধীন তাই দুঃখ, যা স্বাধীন, আত্মনির্ভর, তাই সুখ।

একটু সুস্থ হয়ে উঠলে অখণ্ডানন্দকে এলাহাবাদের পথে পাঠিয়ে দিল।

তারপর স্বামীজি আর-আর গুরুভায়েদের নিয়ে চলে এল হৃষীকেশ।
চণ্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পাশে বসে পড়ো যোগাসনে। সুদীর্ঘ ধ্যান লাগাও।

অভেদদর্শনই জ্ঞান, মনের নির্বিষয়তাই ধ্যান, অন্তরের অশুদ্ধিত্যাগই স্নান আর ইন্দ্রিয়সংযমই শৌচ।

আর ধ্যানে বসে এইটিই অনুভব করো, আমিই অগ্নি আমিই হবি। ভোক্তৃরূপেও আমি ভোগ্যরূপেও আমি—আমিই সর্বাত্মক।

কিন্তু কতক্ষণ বসবে? এবার নিজে অসুখে পড়ল স্বামীজি। প্রবল জ্বর, তার সঙ্গে প্রতপ্ত প্রলাপ।

প্রায় প্রাণসংকট। দেখতে দেখতে অবস্থা নৈরাশ্যের শেষসীমার দিকে চলে আসছে। জ্ঞান নেই, কখনো-কখনো নাড়ী পাওয়া যাচ্ছেনা। মাটির উপর দুখানা কম্বল বিছিয়ে শয্যা, তার উপর শুয়ে স্বামীজি চরম মুহূর্তের অপেক্ষা করছে।

গুরুভায়েরা অন্ধকারে পথ খুঁজে পাচ্ছেনা। কি করবে কোথায় যাবে কোন দরজায় হাত পাতবে? ধারে-কাছে ডাক্তার কোথায়? কোথায় বিপদের সহায়বন্ধু? কোথায় ত্রাণকর্তা?

পাহাড়ী একটা লোক এসে হাজির। বললে, 'আমি ওষুধ এনেছি।'

'কি ওষুধ?'

'পাহাড়ী গাছের শিকড়। মধুর সঙ্গে বেটে খাইয়ে দাও। ভালো হয়ে যাবে।'

জানিনা তুমি কে, তোমাকে কে পাঠাল? জানিনা তোমার ওষুধের গুণাগুণ। তবু মন বলছে তুমি তাঁরই দূত, যিনি কষ্টে ফেলে কৃপা দেখান, রোগে ফেলে আরোগ্য আনেন, ক্ষুধার দুঃখ দিয়ে আনেন খাদ্যের সুধাস্বাদ।

ক্লেশ না থাকলে কৃপাকে বুঝত কে? রোগ না থাকলে কোথায় থাকত উপশমের আরাম? খিদে না থাকলে কোথায় খাওয়ার আনন্দ?

ওষুধ খেয়ে ভালো হয়ে উঠল স্বামীজি।

'অন্ধকারেই ঈশ্বরকে মনে পড়ে।' বললেন ঠাকুর: 'মনে হয়, সব এই দেখা যাচ্ছিল, কে এমন করলে!'

আবার আলোকেও সেই ঈশ্বরকে মনে করো। অন্ধকার দেখে মনে হয়েছিল এ বুঝি আর নড়বে না, এ বুঝি আর সরবে না। জগদ্দলন পাথরের মত নিশ্বাস রোধ করে পড়ে থাকবে। কিন্তু না, এই দেখ, আলোয় দশদিক ঝলমল করে উঠেছে। অন্ধকারের তন্তুটিও আর কোথাও নেই।

আশ্চর্য, কি করে রাত্রি আবার প্রভাত হল! তাও আবার হয় নাকি?

> "যেমনি ভোরে জেগে উঠে
> নয়ন মেলে চাই
> খুশি হয়ে আছেন চেয়ে
> দেখতে মোরা পাই।

তাঁরি মুখের প্রসন্নতায়
সমস্ত ঘর ভরে
সকাল বেলায় তাঁরি হাসি
আলোক ঢেলে পড়ে॥"

তাই ঈশ্বরকে আলোকে-আনন্দেও দেখ। দেখ তোমার প্রসাদে-সুস্বাদেও। তাঁকে ভুলে যেওনা। তিনি শুধু খরশর নন, পুষ্পবৃষ্টিও। যাঁহা মুস্কিল তাঁহাই আসান।

তাড়াতাড়ি সবাই চলে এল হরিদ্বার। সেখান থেকে সাহারানপুর। সেখান থেকে মিরাট। মিরাটে আবার অখণ্ডানন্দের সঙ্গে দেখা। সে এলাহাবাদ না গিয়ে মিরাটে ডাক্তার ত্রৈলোক্য ঘোষের চিকিৎসায় আছে। বেশ সেরে উঠেছে।

'কিন্তু এ তুমি কী হয়ে গিয়েছ!' স্বামীজিকে দেখে যেন চিনতে পাচ্ছে না গঙ্গাধর : 'যেন কখানা হাড়ের উপরে মাংসের প্রলেপ! এখানেই থেকে যাও দিন কতক। কনখল থেকে ব্রহ্মানন্দও চলে আসছে।'

এ যে প্রায় সেই বরানগর মঠই হয়ে উঠল। ভিড়লেন এসে যজ্ঞেশ্বরবাবু, ঠাকুরের সেই বুড়ো গোপাল অদ্বৈতানন্দ। যে যজ্ঞেশ্বরবাবু পরে সন্ন্যাস নিয়ে জ্ঞানানন্দ স্বামী হন। প্রতিষ্ঠা করেন ভারতধর্মমহামণ্ডল।

যতদিন শরীর বেশ পটু হয়ে না উঠছে ততদিন থাকি এই আনন্দের নিকেতনে। ত্রৈলোক্যবাবুর কাছ থেকে আমিও ওষুধ খাই। ওহে গঙ্গাধর, কিছু এবার সংস্কৃত সাহিত্য পড়া যাক। শাস্ত্র অনেক ঘাঁটা হয়েছে, এবার নিয়ে এস শকুন্তলা, কুমার-সম্ভব, মৃচ্ছকটিক। এ আবার কী আনলে?

'স্যার জন লাবকের গ্রন্থাবলী।'

'কোত্থেকে আনলে?'

'যেখান থেকে এতদিন আর-আর বই এনেছি সেখান থেকে। এখানকার লাইব্রেরি থেকে।'

পর দিন লাবকের বইগুলি ফেরৎ দিল স্বামীজি। বলে দিও, পড়া হয়ে গেছে একদিনে।

একদিনে? এতগুলি বই? লাইব্রেরিয়ান বিশ্বাস করতে চাইল না। নিশ্চয়ই চাল মেরেছে। একবার দেখা পেতাম, দেখতাম জিগগেস করে।

স্বামীজি তক্ষুনি চলল লাইব্রেরিয়ানের কাছে। বললে, 'বিশ্বাস না হয় জিগগেস করুন। যে কোনো পৃষ্ঠা থেকে যে কোনো প্রশ্ন।'

পর-পর কতকগুলি প্রশ্ন করল লাইব্রেরিয়ান। ঠিক-ঠিক উত্তর দিল স্বামীজি।

এ সব দিয়ে আমার কী হবে? বিদ্যা দিয়ে? বিদ্যা দেখিয়ে?

হৃষীকেশ-হরিদ্বারের জন্যে মন পুড়তে লাগল স্বামীজির। সেই সব বিশাল নিস্তব্ধতার ডাক, সেই সব গূঢ়গহন গভীরতার সংকেত। সেই কৃচ্ছ্র-কাঠিন্যের আনন্দ, সেই দুর্বারণ অরণ্যের উন্মুক্তি।

আহা, হৃষীকেশের সেই দিগম্বর বুড়ো সাধুটির কথা মনে পড়ছে। সবাই ধরে নিয়েছে পাগল। রাস্তায় ছেলেরা তাকে ঢিল মারছে। ঢিল খেয়ে মুখ ও মাথা থেকে রক্ত পড়ছে তবুও উন্দাম সুখে হাসছে সেই সন্ন্যাসী। উল্লাসে উথলে-উথলে উঠছে। যেন অপরিচিত পথচারীর হাতে অকারণ মার খাওয়ার মত সুখ নেই। স্বামীজি সাধুকে কাছে ডেকে আনল, জল দিয়ে রক্ত ধুয়ে দিল, খানিকটা কাপড় পুড়িয়ে তার ছাই দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ করলে। তবুও সাধুর বিন্দুমাত্র যন্ত্রণা নেই অভিযোগ নেই। তবুও সে হাসছে, উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসছে। বলছে, ছেলেদের কী আনন্দ আমাকে ঢিল মেরে। মারুক, ওদের খুশিতেই আমি খুশি।

আর এই যে তোমার মুখে-মাথায় ঘা? রক্ত? কালশিরে?

তবুও অনর্গল হাসছে সাধু। বলছে, এ সব তাঁর খেলা।

ঠাকুরও বলতেন, 'সব সেই বুড়ির খেলা।'

'বুড়ির খেলা তো বুড়ি নিজে খেলুক।' বলেছিল নরেন, 'কিন্তু আমি খেলি কেন?'

'তুই খেলবিনে মানে? তুই না খেললে বুড়ির খেলা জমবে কেন?'

৩৩

আমার সঙ্গে কেউ এসোনা। কেউ খোঁজ নিওনা আমার। আমি নিঃসঙ্গ, স্বভুজবীর্যবান। মায়ামূলকে উচ্ছিন্ন করব সবলে।

গুরুভায়েদের ডাকল স্বামীজি। বললে, 'আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এখন থেকে একা-একা থাকব, একা-একা চলব। কেউ খোঁজ নিতে এসো না আমার।'

অখণ্ডানন্দ মিনতি করে উঠল : 'আমাকে তোমার সঙ্গে নাও।'

'কাউকে না।'

'কে তোমাকে দেখবে?'

'আমার অসুখ হলে তুমি আমাকে দেখ, তোমার অসুখ হলে আমি তোমাকে দেখি—আবার গড়ে তুলি সেই মায়ার মৌচাক। আর নয়, এবার আমাকে সত্যি করে অনুভব করতে দাও, আমার কেউ নেই, আমি নিরাশ্রয়, আমি নিঃসহায়, আমি নিরাবরণ। আমাকে দাও একবার সেই একলা-থাকার উন্দাম উন্মত্ততা।'

দিল্লি চলে এল স্বামীজি। নাম নিল বিবিদিষানন্দ।

সে কি! এখানেও গুরুভায়েরা পিছু নিয়েছে।

'এ কি, তোমরা এখানে কেন দেখা করতে এসেছ?' স্বামীজি বিরক্ত হয়ে বললে।

'বা, আমরা কি জানি তুমি?' গুরুভায়েরা অপ্রস্তুত হয়ে গেল : 'আমরা শুনলুম নতুন কে-এক ইংরিজি-জানা সন্নেসী এসেছে, নাম বিবিদিষানন্দ স্বামী,

তাই কৌতূহলী হয়ে দেখা করতে এসেছি। তা তোমাকেই দেখব কে জানে।'

হ্যাঁ, বেশিক্ষণ দেখো না। মানুষের চোখের মধ্যেই মায়ার বাসা।

দিল্লি ছেড়ে সোজা আলোয়ার।

একলা চলো, একলা চলো। সামনে পথ নেই, তবুও। যেখানে তোমার পদ সেখানেই তোমার পথ। তবু একলা চলো, এগিয়ে চলো। কিছু হিসেব না করে গ্রাহ্য না করে। নিঃশঙ্ক ও নিরঙ্কুশ। এককবিহারী গণ্ডারের মত। অরণ্যে যত গর্জন উঠুক তুমি বধির থাকো। বিপথ বলে কিছু নেই, বিপদ বলে কিছু নেই, শুধু চলো, সামনে চলো, এগিয়ে চলো।

স্টেশনে নেমে হাঁটতে-হাঁটতে হাজির এক ডাক্তারখানায়। ডাক্তারটিকে যেন বাঙালি বলে মনে হচ্ছে। স্বামীজি জিগগেস করল, 'এখানে সন্নেসীদের কোথাও থাকবার জায়গা আছে?'

ডাক্তার বাঙালিই বটে। নাম গুরুচরণ লস্কর। বিদেশে কোমলকণ্ঠের বাঙলা কথা শুনে চমকে উঠল। এ কে সন্ন্যাসী! দৃঢ়ায়ত চেহারা অথচ মুখখানি এত সুকুমার! পবিত্র চিন্তার পেলব লাবণ্যে ভরপুর।

'আছে, আছে, আসুন আমার সঙ্গে।'

বাজারের মধ্যে একটা দোকানের দোতলায় খালি একখানা ঘর পাওয়া গেল। পারবেন থাকতে এখানে?

'স্বর্গসুখে থাকব।'

'কিছু লাগবে?'

'কিছু না।'

তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল ডাক্তার, সঙ্গে কম্বলজড়ানো গুটি কয় বই, একখানা গেরুয়া, একটা দণ্ড আর কমণ্ডলু, এই শুধু সম্বল সন্ন্যাসীর। আবার কী লাগবে! আহার? তা দু একমুঠো যোগাড় করে দেবেন ভগবান। যদি না দেন থাকব অনশনে। বুঝব আমার উপবাসই তাঁর পরিতোষ।

ইস্কুলের মৌলভি সামনেই থাকে—গুরুচরণের বন্ধু। গুরুচরণ তার কাছে ছুটে গেল। এস এস নতুন দরবেশ দেখবে এস। বাঙালি দরবেশ। এমন উজ্জ্বল অথচ এমন মধুর কোথাও তুমি দেখনি।

দরজার পাশে জুতো খুলে রেখে খালি পায়ে ঘরে ঢুকল মৌলভি। শুধু সেই মৌলভি? ক্রমে-ক্রমে আরো অনেক মুসলমান। শুধু মুসলমান? সব ধর্মের সব জাতের লোক ভিড় করল। স্বামীজির কণ্ঠ থেকে ঝরতে লাগল পুরাণ-কোরান, বেদ-বাইবেল। শুধু শহরের লোক নয়, যেন চলে এসেছে বুদ্ধ-শঙ্কর নানক-চৈতন্য কবির-তুলসীদাস, আর সকলের হাত ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ।

ঘরে লোক আর ধরে না। আলোয়ারের ইঞ্জিনিয়র শম্ভুনাথবাবু বললেন, স্বামীজিকে আমার বাড়িতে নিয়ে চলো।

চলো।

সারাদিন ধ্যান আর উপাসনা, আর বিরাম হলেই ঈশ্বরকথা। সব প্রসঙ্গের

ইতি আছে, ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ইতিহীন। সব আগুনই নেবে, ঈশ্বর-আগুন অনির্বাণ।

'মহারাজ, আপনার শরীরের জাত কি?' কত লোক আসে, একজন জিগগেস করে বসল। প্রশ্ন শুনে সাধারণ সন্ন্যাসীর মত বিরক্ত হলনা স্বামীজি। পূর্বাশ্রম তো একটা ছিল, তা গোপন করে লাভ কি? গোপন করাই তো অসাধুতা। স্পষ্ট নির্ভীক স্বরে বললে, 'এ কায়স্থ শরীর।'

চুপ করে থেকে কিংবা পাশ কাটিয়ে গিয়ে অনায়াসে বোঝানো যেত পূর্বাশ্রমে স্বামীজি ব্রাহ্মণ ছিল। কিন্তু সত্যবাদিতায় ঢের বেশি ব্রাহ্মণত্ব।

সবাই শ্রদ্ধায় ভরে উঠল।

'আচ্ছা স্বামীজি, আপনি গেরুয়া পরেন কেন?'

'নিষ্কিঞ্চন বলে।' প্রসন্ন হাস্যে বললে স্বামীজি, 'গেরুয়া দরিদ্রের ভূষণ। আমি যদি শাদা সাধারণ কাপড় পরতাম, ভিক্ষুক এসে আমার কাছে ভিক্ষে চাইত। বুঝতনা যে আমিও একজন ভিক্ষুক। নিজের কাছে কত সময় একটা পয়সাও থাকেনা, কি করে মেটাতাম তাদের প্রার্থনা? একজন চাইবে অথচ আমি দিতে পারবনা এ ভাবতেও দুঃসহ। তার চেয়ে এই গেরুয়াই ভালো, গেরুয়াই স্পষ্ট। কেউ আর চাইবেনা কাছে এসে। ভাববে এ তো আমাদেরই একজন, আমাদেরই মতন দীনহীন। ভিখিরি কি ভিখিরির কাছে ভিক্ষে চায়?' স্বামীজির স্বর আরও উদার হল : 'সমস্ত বিশ্বকে সুমিত্র ও সগোত্র ভাববার নিশানই হচ্ছে গেরুয়া।'

আমার এ গেরুয়া ঐশ্বর্যারূঢ় অহমিকা নয়, দলিত-দীর্ণ দীনদরিদ্রে সমপ্রেম।

মৌলভি সাহেবের ইচ্ছে স্বামীজিকে একদিন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাওয়ায়। হৃদয়ের অমৃত অন্নের মাধ্যমে পরিবেশন করে। স্বামীজির কাছে এক জাতি—সে-জাতির নাম মানুষজাতি—তাঁর নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি হবেনা, ভয় শম্ভুনাথকে। শম্ভুনাথ সনাতনী, কিছুতেই স্বামীজিকে ছেড়ে দেবেনা।

'বড় সাধ স্বামীজিকে একদিন সেবা করি।' মৌলভি বললে শম্ভুনাথকে, 'আলাদা পরিচ্ছন্ন ঘরে বামুন দিয়ে রান্না করাব, তাদেরই বাসনকোসনে, তাদেরই কেনা জিনিসে। আর আমি—আমি দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখব তাঁর খাওয়া।'

ভক্তির স্বভাবমধু ঝরে পড়ল কণ্ঠস্বরে। ভক্তের আবার জাত কি। ভালোবাসার আবার আল-বাঁধ কিসের!

শম্ভুবাবু বললেন, 'আমি কাকে আটকাব? এ যে জ্বলন্ত পাবক। জীবন্মুক্ত মায়ামুক্ত পুরুষ। সর্বত্র এঁর সাম্যবুদ্ধি শুদ্ধবুদ্ধি।'

সর্বত্র ঈশ্বরের হস্তপদ, সর্বদিকে তাঁর চোখমুখ, সর্বত্র তাঁর কান পাতা। সমস্ত কিছু আচ্ছন্ন করে আবৃত করে তিনি বিরাজমান। যিনি সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত এবং সমস্ত বিনষ্ট হলেও যিনি বিনষ্ট হন না সেই পরমেশ্বরকে যে দেখে সেই যথার্থদর্শী।

মৌলভিসাহেব খাওয়াল স্বামীজিকে। এবং তার দেখাদেখি আরো অনেক মুসলমান।

ক্রমে-ক্রমে মহারাজার দেওয়ান রামচন্দ্রজির কানে উঠল। স্বামীজিকে নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে। ভাবলেন একে দিয়ে যদি মহারাজার চরিত্রের কিছু সংশোধন হয়।

মহারাজা মঙ্গলসিং ভীষণভাবে সাহেব বনে গিয়েছে। ষোল আনার উপরেও যেন দু আনা বেশি। খানাপিনা তো বটেই, চলন-বলন ধরন-ধারন সব ব্যাপারেই মাত্রাহীন উগ্রতা। দেওয়ান তাঁকে খবর পাঠাল, মস্ত এক সাধু এসেছে—মামুলি সাধু নয়, চমৎকার ইংরিজি জানে, বলতেও পারে অসাধারণ।

ইংরিজি কথা শুনে মঙ্গলসিং আকৃষ্ট হল। সাধুদর্শনে এল দেওয়ানের বাড়িতে।

বললে, 'শুনতে পাই আপনি একজন প্রকাণ্ড পণ্ডিত। ইচ্ছে করলেই তো অনায়াসে রোজগার করতে পারেন, তবে এমন ছন্নছাড়ার মত ভিক্ষে করে বেড়ান কেন?'

স্বামীজি হাসল। বললে, 'শুনতে পাই আপনি একটা রাজ্যের শাসনকর্তা। ইচ্ছে করলেই তো অনায়াসে প্রজার হিতসাধন করতে পারেন, তবে এমন উন্মাদের মত সাহেবিয়ানা করে বেড়ান কেন?'

স্বামীজির কথায় উপস্থিত সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল। কী স্পর্ধা এই সাধুর! মহারাজার মুখের উপর এমন অবিনয় করবার সাহস রাখে। সাধুর অদৃষ্টে কি না জানি আছে আজ নিগ্রহ!

'কেন বেড়াই?' মহারাজা সামলে নিল নিজেকে : 'আমার খুশি।'

'আমারো সেই কথা।' স্বামীজি বললে, 'আপনার খুশি সাহেব সেজে, আমার খুশি ফকির সেজে।'

'কিন্তু যাই বলুন মূর্তিপূজা আমি বিশ্বাস করিনা।' মহারাজা তাকাল স্বামীজির দিকে : 'আপনি করেন?'

'করি।'

'কাঠ মাটি পিতল পাথর এদেরকে ভগবান ভাবেন?'

'ভাবি।' বজ্রদৃঢ় স্বামীজির স্বর।

'আমি যে ভাবতে পারি না, আমার কি উপায় হবে?' মহারাজার কথায় বোধহয় একটু পরিহাসের সুর।

'ভাববেন না।' সহসা দেয়ালের একটা ফটোগ্রাফের দিকে তাকাল স্বামীজি : 'এটা কার ফটো?'

দেওয়ান বললে, 'মহারাজার।'

স্বামীজির অনুরোধে ছবিটা নামিয়ে আনা হল। স্বামীজি নিজের হাতে করে নিয়ে বললে দেওয়ানকে, 'এটার উপর থুতু ফেলুন।'

ঘরের মধ্যে যেন বাজ পড়ল। হতচকিতের মত তাকিয়ে রইল দেওয়ান। মহারাজারও চক্ষুস্থির।

'ফেলুন থুতু। লাথি মারুন। কেন, সঙ্কোচ কিসের? এ তো এক টুকরো

একটা কাগজ। এতে থুতু ফেলতে আপত্তি কি?'

'সে কি বলছেন স্বামীজি?' শুকনো গলায় ঢোক গিলল দেওয়ান : 'এ যে মহারাজার প্রতিচ্ছবি।'

'তাতে কি। এ তো খানিকটা কালিমাখা কাগজ। এর মধ্যে মহারাজা কোথায়?' স্বামীজি ফোটোগ্রাফটা বাড়িয়ে ধরল দেওয়ানের দিকে : 'এর মধ্যে রক্তমাংস কোথায়? প্রাণ কোথায়? এ তো অনড়, নিঃশব্দ। এতে থুতু ছিটোলে থুতু তো কাগজেই পড়বে, মহারাজার গায়ে পড়বেনা। তবু থুতু ফেলছেননা কেন? ফেলছেননা এরই জন্যে, এ মহারাজার ছায়া, একে দেখলে মহারাজাকে মনে পড়ে। একে কলঙ্কিত করলে মহারাজাকেই অপমান করা হয়। তাই এ ছবি শুধু কালিমাখা কাগজ নয়, এ ছদ্মবেশী মহারাজ।'

মঙ্গলসিংকে লক্ষ্য করল স্বামীজি। বললে, 'এক অর্থে আপনি এতে নেই, অন্য অর্থে আপনি এতে বর্তমান। আপনি নেই বলে একে ছিন্ন করা যায়, মলিন করা যায়, আবার আছেন বলে আপনার ভক্ত-সেবকের দল একে শ্রদ্ধা করে প্রণাম করে। তেমনি প্রতিমা এক অর্থে মৃত্তিকা অন্য অর্থে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া। আমরা কি আর মাটিকে পূজা করি, মাটির মাধ্যমে পূজা করি ঈশ্বরকে। আপনার ভক্ত-সেবকেরা কি কাগজকে প্রণাম করে, কাগজের মাধ্যমে প্রণাম করে আপনাকেই।'

মঙ্গলসিং দুই কর যুক্ত করল। প্রণাম করল স্বামীজিকে।

বললে, 'চলুন আমার প্রাসাদে।'

'যাব, কিন্তু এক সর্ত।' স্বামীজি উঠে দাঁড়াল : 'শুধু ধনীরা নয়, শুধু গণ্যমান্যের দল নয়, অধম-অক্ষম দীনদরিদ্রেরাও যদি আসতে চায় আমার কাছে, দরজা খোলা রাখবেন তাদের জন্যে। নির্বিবাদে আসতে দেবেন সকলকে। অশনবসন নেই তো না থাক, সকলের অবারিত প্রবেশ। কি, রাজি?'

'রাজি।'

রাজপ্রাসাদ টলমল করে উঠল।

৩৪

এক বৃদ্ধ এসেছে স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে। কি অভিলাষ? আমাকে কৃপা করুন। কেন, কি করতে হবে? সারাজীবন ভোগের সন্ধানে কাটিয়েছি, বোঝাই করেছি পাপের নৌকো, এবার ভরাডুবি থেকে রক্ষা করুন আমাকে। আমার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন।

প্রার্থনা? ঝলসে উঠল স্বামীজি। প্রার্থনায় কি হবে?

তবে কিসে হবে?

হবে আপনার নিজের পুরুষকারে। পরের কাছে কৃপা চেয়ে কি হবে যদি নিজেকে নিজে না কৃপা করেন? পরকৃপা নয়, আত্মকৃপা। পরের দরজায় আঘাত

করে কি হবে, নিজের অন্তরের দরজায় আঘাত করুন।

যখন সূতপুত্র বলে কর্ণকে বিদ্রূপ করা হল তখন কি বললে কর্ণ? বললে, দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম। উচ্চবংশে বা নীচবংশে জন্ম দৈবাধীন, কিন্তু পৌরুষ আমার নিজের করতলে। আমার নিজের অধিকারের মধ্যে। আমি প্রমাণ করব সে পৌরুষ। মরুভূমিতে দেখবে আমিই এক পল্লববিকীর্ণ পুষ্পিত বৃক্ষ।

বৃদ্ধ বললে, 'সবই দৈব।'

পূর্বজন্মের যা পুরুষকার তারই ফল এই জন্মের অদৃষ্ট। অর্থাৎ আজ যাকে দৈব বলছ জানবে তা তোমার প্রাক্তন পৌরুষের পরিণাম। তেমনি এই জন্মে যা তোমার পুরুষকার তাই পরজন্মে দৈব বা অদৃষ্টরূপে দেখা দেবে। সুতরাং পুরুষকার ছাড়া অদৃষ্টের খণ্ডন নেই। তাই বলি পৌরুষ আশ্রয় করে দন্তে দন্ত চূর্ণ করে কাজে লেগে যাও, ঐহিক শুভকর্ম দ্বারা পূর্বতন অশুভ বর্ষফল জয় করো।

(পৌরুষং নৃষু। মানুষের মধ্যে যে পৌরুষ যে কর্মশক্তি তাই ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হবে মানে নিজের পৌরুষের শরণাপন্ন হও। ঈশ্বরকে দেখবে মানে নিজের কর্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করো, প্রদীপ্ত করো। নিজেকে আলোকিত করে দেখ সেই আলোকময়কে।)

(হে কৌন্তেয়, অর্জুনকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, জলে আমি রস, চন্দ্রসূর্যে আমি প্রভা, সর্ববেদে আমি ওঙ্কার, আকাশে আমি শব্দ আর মানুষের মধ্যে আমি পৌরুষ।)

পৌরুষই দুর্বলের বলাধারের মন্ত্র। পৌরুষেই দগ্ধ হবে সমস্ত পাপ, ক্ষয় হয়ে যাবে সমস্ত দুর্গতি, সমস্ত দারিদ্র্য।

'কিন্তু আমার কিং আর সময় আছে?' অসহায় চোখে তাকিয়ে রইল বৃদ্ধ।

জীবনের শেষ নিশ্বাস শেষ পলক ফেলা পর্যন্ত সময়। 'মাম্ অনুস্মর, যুধ্য চ।' অর্জুনকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, 'আমাকে স্মরণ করো আর যুদ্ধ করো।' যাকে ঠাকুর বলছেন, কর্মযোগ আর মনোযোগ। জীবনের শেষ নিশ্বাস শেষ পলকপতন পর্যন্ত যুদ্ধ, অনন্যগামিনী ঈশ্বরচিন্তা।

আলোয়ার ছেড়ে চলল স্বামীজি। এল জয়পুর।

রাজ্যের প্রধান সেনাপতি সর্দার হরি সিংহের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হল। কিন্তু সেখানেও সেই তর্ক। কি হবে মূর্তি পূজা করে? একটা কাষ্ঠখণ্ড বা মৃৎপিণ্ড কি ঈশ্বর?

অনেক যুক্তি-তত্ত্বের অবতারণা করা হল, কিন্তু হরি সিং নির্বিচল। কোনো মীমাংসাতেই তার সম্মতি নেই। তুমি বলবে বলেই আমি মানব এ কোন নীতি? আমি দেখতে চাই।

একদিন সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরিয়েছে দুজনে। শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি নিয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছে এক শোভাযাত্রা। পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে তাই সর্দার আর স্বামীজি। আর্তিহরণ লাবণ্যে মাখা এ কি প্রসন্ন মূর্তি!

'দেখ দেখ ঈশ্বরকে দেখ। জীবন্ত ঈশ্বর।' স্বামীজি সর্দারের হাত চেপে ধরল : 'তাকিয়ে দেখ ঐ মূর্তির দিকে।'

এ কি, সর্দারের দুচোখ বেয়ে নেমে এসেছে অশ্রুধারা। এ কি, তোমার এ কি হল?

'জীবন্ত-জ্বলন্ত ঈশ্বরকে দেখলাম। স্বামীজি, এতদিন তর্ক করে যা দেখিনি তা দেখলাম তোমার এই চকিতস্পর্শে। বিগ্রহ কোথায়, শরীরপ্রাণবান পূর্ণসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ।'

তাই বলে শাস্ত্র-ব্যাকরণ পড়াও ছাড়বেনা স্বামীজি। অন্তত পাণিনিটা অধিকৃত করতে হবে। নামজাদা এক পণ্ডিত যোগাড় হল। কিন্তু পণ্ডিতের বিদ্যাই আছে, বিদ্যা চালনা করবার বুদ্ধি নেই। তিনদিনের চেষ্টাতেও প্রথম সূত্রটিই বোঝাতে পারলে না। বিরক্ত হল পণ্ডিত, বললে, 'প্রথম সূত্র বুঝতে যখন আপনার তিনদিনও কুলিয়ে উঠছেনা তখন গোটা ব্যাকরণ আয়ত্ত করতে বাকি জীবনই বা যথেষ্ট হবে কিনা কে জানে।'

এই কথা? নিজের চেষ্টাতেই সূত্র-ভাষ্য উদ্ধার করব। পাণিনি নিয়ে বসে পড়ল স্বামীজি। আর কোনো দিকে লক্ষ্য নেই স্পৃহা নেই, গূঢ়ার্থ উপলব্ধি করবার আগে আসন ছাড়বনা। কঠিন মাটির নিচে যেমন জল আছে, তেমনি কঠিন ভাষার নিচে রয়েছে ভাষ্যের স্বচ্ছতা। পণ্ডিত তিনদিনে যা পারেনি তিনঘণ্টায় তা নির্ণীত হল। ইউরেকা! স্বামীজি ছুটে গেল পণ্ডিতের কাছে। দেখুন, আমি বুঝে নিয়েছি। শুনুন, আমার ব্যাখ্যা ঠিক কিনা।

জলের মত তরল আলোর মত সরল ব্যাখ্যা। শুধু ব্যাখ্যা নয় নতুন আলোক-পাত। পণ্ডিত একেবারে হতবাক হয়ে গেল। এ কে অসাধ্যসাধক!

আর স্বামীজিকে পায় কে? একে একে সমস্ত গ্রন্থি খুলে যেতে লাগল। বললে স্বামীজি, 'সংকল্পই আসল কথা। প্রতিজ্ঞায় যদি একবার দৃঢ় হওয়া যায় কোনো কাজই বসে থাকে না।'

'যুদ্ধায় যুজ্যস্ব।' যুদ্ধার্থে উত্থিত হও, উদ্‌যুক্ত হও। উত্থানে-উদ্যোগেই জয়ের প্রভাতোদয়।

টাইলা গ্রামে নীলকণ্ঠ শিবের মূর্তি দেখে এল। প্রজার স্বস্তির জন্যে সমুদ্র-মন্থনের হলাহল যে পান করেছিল সেই দেবাদিদেব শঙ্কর। বিষ পান করবার আগে শিব বললে সতীকে, যারা আত্মমায়ায় মুগ্ধ ও পরস্পর বৈরভাবে বদ্ধ তাদের উপর কৃপা করলেই স্বয়ং শ্রীহরি প্রীত হন। আর শ্রীহরি প্রীত হলে চরাচরসহ আমিও প্রীত হই। সুতরাং এই বিষ আমি খাব, আমার প্রজাদের কল্যাণ হোক। অপরের দুঃখে দুঃখ বোধ করাই অখিলপুরুষের আরাধনা।

(অন্যের জন্যে কল্যাণকর্ম করতে না পারো, অন্তত কল্যাণ চিন্তা করো। কল্যাণকর্মী না হতে পারো, কল্যাণকামী হও। কল্যাণচিন্তাই উপাসনা।)

সমুদ্র হচ্ছে এই মায়ার সংসার। ইন্দ্রিয়ভোগই হচ্ছে হলাহল। তোমার তপস্যায় তাকে নস্যাৎ করে দাও। মৃত্যুর কবল থেকে ত্রাণ করো উদ্‌ভ্রান্তদের।

'আচ্ছা, তুমি অবতার মানো?' পণ্ডিত সুরজনারায়ণ জিগগেস করল স্বামীজিকে।

'না মেনে করি কি?'

'কেন, অবতার কি আলাদা? তার কি চারটে হাত আছে না কপালে চোখ আছে?' পণ্ডিত উদ্ধতস্বরে বললে, 'আমি বলছি, আমিও একজন অবতার। কেন নই প্রমাণ করুন।'

'না, না, আপনি একজন অবতার বই কি। প্রমাণ লাগবেনা।' স্বামীজি হাসিমুখে বললে, 'আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে মাছ কচ্ছপ শুয়োর সবকিছুই অবতার। যদি বলেন অবতারের সঙ্গে আপনার কোনো তফাৎ নেই আপত্তি করব না।'

যারা-যারা ছিল সবাই হেসে উঠল। পণ্ডিতের স্পর্ধায় বাজ পড়ল।

আজমির হয়ে স্বামীজি এল আবুপাহাড়ে। ('সৎ হওয়া ও সৎ ব্যবহার করা, ওতেই সমস্ত ধর্ম নিহিত।') আলোয়ারের গোবিন্দসহায়কে চিঠি লিখল স্বামীজি: 'যে শুধু প্রভু-প্রভু বলে চেঁচায় সে নয়, যে পরমপিতার ইচ্ছানুসারে কাজ করে সেই ধার্মিক। ধর্ম কাজে, কথায় নয়। পর্বত যদি না আসে তুমি নিজেই পর্বতের কাছে যাও।'

পাহাড়ের একটা গুহার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিল স্বামীজি। সঙ্গের সাথি দুখানা কম্বল, একটা কমণ্ডলু আর কখানা বই। আর সাধন কিংবা পাতন এই তপস্যার তপ্ততেজ।

একটি মুসলমান উকিল প্রায়ই বেড়াতে আসে এদিকে। কি করে সন্ধান পেয়েছে, গুহার বাইরে মুগ্ধের মত বসে থাকে আর একটা-দুটো করে কথা কয়। যত বলে তার চেয়ে শোনে বেশি। আর যা শোনে এমনটি আর কোনোদিন শোনেনি।

(তোমার অদৃষ্ট তোমার নিজের হাতে—এই তো বেদান্তের কথা। তোমার এই শরীর তুমি নিজেই সৃষ্টি করেছ, মানে, তোমার নিজের কর্মই তোমার এই দেহাধারকে গঠন করেছে। তোমার হয়ে আর কেউ তোমার এই নিশ্বাসগৃহ নির্মাণ করেনি। যে সমস্ত সুখদুঃখ ভোগ করছ তার জন্যে তুমিই একমাত্র দায়ী। তুমিই তোমার দণ্ডদাতা তোমার সুখধাতা। ভেবোনা তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমাকে এখানে আনা হয়েছে, রাখা হয়েছে এই ভয়াবহ পরিবেশে। তুমিই ধীরে-ধীরে তোমার জগৎ রচনা করেছ, এখনো করছ। তুমিই তোমার পথ তুমিই তোমার পরিবেশ।)

'আমি আপনার কোনো কাজে লাগতে পারি?' জিগগেস করল উকিলসাহেব।

'বর্ষা আসছে, গুহায় কোনো দরজা নেই। কাঠের একজোড়া দরজা লাগিয়ে দিতে পারেন?'

'স্বামীজি, একটা অনুরোধ করতে পারি?' দুই হাত যুক্ত করল উকিলসাহেব: 'কাছেই আমার একখানি বাঙলো আছে। আপনি সেখানে থাকবেন চলুন।'

আশ্চর্য, এক কথায় রাজি হয়ে গেল স্বামীজি।

একটু হয়ত দ্বিধা করল উকিলসাহেব। বললে, 'আমিও সেই বাড়িতে থাকি। কিন্তু, ভয় নেই, আপনার খাওয়া দাওয়ার সব আলাদা বন্দোবস্ত করে দেব।'

উকিলসাহেবের কাঁধে হাত রাখল স্বামীজি।

খেতড়ির রাজার একান্তসচিব মুন্সি জগমোহন লাল এসেছে উকিলসাহেবের ডাকে। কই, কোথায় তোমার আবিষ্কার? দেখল, কৌপীনধারী এক সাধু লম্বা হয়ে ঘুমুচ্ছে। এই, এই তোমার সাতরাজার ধন এক মানিক? ঠোঁট কুঁচকোলো জগমোহন। যেমন হামেসা দেখে থাকি ভবঘুরে বাউণ্ডুলে এ তো তাদেরই একজন।

স্বামীজি চোখ মেলল।

'আপনি তো হিন্দু, তবে এই মুসলমানের সংস্রবে আছেন কেন?' জগমোহন ঝাঁজিয়ে উঠল। 'আপনার খাওয়ায় তো ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায়।'

'তবুও আমার জাত যায় না, আমার জাত যাবার নয়।' দীপ্ত শানিত কণ্ঠে বললে স্বামীজি। 'আমি সন্ন্যাসী আমি মেথরের সঙ্গে বসেও খেতে পারি। সমস্ত মানুষ আমার কাছে সমান, সকলে সেই ঈশ্বরের প্রতিভূ। সর্বত্র সাম্য, সর্বত্র ব্রহ্ম। সর্বত্র শিব, সর্বত্র প্রেম।'

বুকের মধ্যে ধাক্কা খেল জগমোহন। এ যেন মুখস্তকরা কথা নয়, এ একেবারে উদ্দীপ্ত আগুন। (বাক্য শুধু বাক্য নয়, বাক্যই ব্যক্তি, বাক্যই ব্রহ্ম)

একবার রাজাকে দেখালে হয়। জগমোহন হাত জোড় করে বললে, 'স্বামীজি, দয়া করে একটিবার রাজপ্রাসাদে যাবেন? দয়া করে একটিবার দেখা দেবেন রাজাকে?'

৩৫

এখন শুধু কর্ম আর কর্ম। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। এ ভিন্ন উদ্ধারের পথ নেই। বলছে স্বামীজি : এখন চাই গীতারূপ সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা, ধনুর্ধারী রাম, মহাবীরের পূজা। তবে তো লোক মহোদ্যমে ধর্মে লেগে শক্তিমান হয়ে উঠবে। দেশ ঘোর তমতে ছেয়ে গেছে। ফলও তাই হচ্ছে, ইহজীবনে দাসত্ব, পরলোকে নরক। কর্মে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠ। মহারজোগুণের উদ্দীপনা ভিন্ন না আছে ইহকাল না আছে পরকাল।

আরো বলছে : চোর হয়ে যে চুরি করতে পারে, আমার মতে এমন দৃঢ়চেতা দুষ্ট লোকও ভালো। কারণ তার পুরুষকার আছে, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আছে। একদিন ঐ দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভরতাই হয়তো তাকে কুপথ থেকে সুপথে ফিরিয়ে আনবে, প্রবৃত্তির স্থলে নিবৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবে জীবনে। কিন্তু অলস দুর্বল তমোগুণীদের দিয়ে কিছু হবে না। যতই তারা সাধু হোক, যতই সৎসঙ্গ করুক।

মনে আছে ঠাকুরের কথা? ঝাঁপ দিলে হবেই হবে। পনেরো মাসে এক বৎসর করলে কি হয়? তোমার ভিতরে যেন জোর নেই। চিঁড়ের ফলার, আঁট

নেই, ভ্যাদ-ভ্যাদ করছে। উঠে পড়ে লাগো, কোমর বাঁধো। যে গরু বাচকোচ করে খায় সে ছিড়িক-ছিড়িক করে দুধ দেয় আর যে গরু গাবগাব করে খায় সে হুড়হুড় করে দুধ দেয়।)

'স্বামীজি, জীবনটা কি?' খেতড়ির রাজা জিগগেস করলেন।

('প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও আত্মস্বরূপের উন্মোচনের সাধনা।' বললে স্বামীজি।)

প্রাসাদে সসম্মান অভ্যর্থনার পর এখন নিভৃতে কথা হচ্ছে। 'আচ্ছা স্বামীজি, শিক্ষা কাকে বলে?'

• 'কতগুলো সংস্কারকে মজ্জাগত করার জন্যই শিক্ষা।'

'স্বামীজি, সত্য কি?'

'যা পূর্ণ যা অদ্বিতীয় যা শাশ্বত তাই সত্য। দৈনন্দিন ব্যবহারে আমরা যাকে সত্য বলি তা আপেক্ষিক। চরম সত্যের উপলব্ধি হলে আপেক্ষিক সত্যবোধ লোপ পায়।'

'আচ্ছা স্বামীজি, আরেক কথা। নীতি কি?'

'যার মাধ্যমে ঘটনা-পরম্পরার সূত্রটির ধারণা করতে পারি তাই নীতি।'

কোনো কিছুতেই দ্বিধা নেই, তীক্ষ্ণ তীরের মত পরিচ্ছন্ন উত্তর।

রাজপ্রাসাদেই হোক আর গিরিগুহাতেই হোক, সমান নিরাসক্তি। সর্বক্ষণই পূজা, পাঠ, ধ্যান, জপ, ইষ্টকথন। শুধু তাই নয় দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের কাছে পাতঞ্জলের অধ্যয়ন চলেছে। কিন্তু কে বা মাস্টার কে বা ছাত্র! শিশুর যখন প্রথম অক্ষর পরিচয় হয় তখন শুধু অক্ষরের দিকে লক্ষ্য থাকে, যখন শব্দরচনা করতে শেখে তখন গোটা শব্দটা চোখের সামনে ধরা দেয়। পরে পঠনসাধনায় একাগ্র হয়ে আরো অগ্রসর হলে সম্পূর্ণ একটা বাক্য একসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আরও অগ্রসর হও অনন্যচিত্ত হও, পলকে একটা অনুচ্ছেদ তোমার আয়ত্তে এসে যাবে। কিন্তু এ ছাত্র তো জাদুকর। একটা পৃষ্ঠা ধরেছে আর তখুনি উলটিয়ে যাচ্ছে।

'এ কি, হয়ে গেল পড়া?'

'জিগগেস করুন।' বই বন্ধ করল স্বামীজি।

'কাল যা পড়িয়েছিলাম কি বুঝেছেন বলুন দেখি।' নারায়ণ দাস পণ্ডিত গম্ভীরমুখে প্রশ্ন করল।

অবিকল মুখস্ত বলে গেল স্বামীজি।

'আর আজ? এই যে এতক্ষণ একটুখানি চোখ বুলিয়েই পৃষ্ঠান্তরে চলে যাচ্ছেন, কতদূর কি বুঝলেন?'

আজকের পড়াও বলে দিল মুখস্ত।

* ('স্বামীজি, এ কি করে সম্ভব হয়?' নারায়ণদাস বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে রইল।

'একমাত্র যোগে। মনের একাগ্রতায়।'

'কি করে হয় এই যোগ?'

('একমাত্র ব্রহ্মচর্যে। নিষ্ঠাপবিত্র অভ্যাসে।) আপনিও দেখুন না চেষ্টা করে।'
বই-পত্র তুলে নিল নারায়ণদাস। বললে, 'আপনাকে তবে পড়ানো বৃথা।'
'সে কি, ক্ষুণ্ণ হলেন আপনি?'

'না, না, ক্ষুণ্ণ হব কেন? শূন্য হয়ে গেলাম! আপনাকে কিছুই আমার পড়াবার নেই।' দু কর যুক্ত করল নারায়ণদাস : 'সব আপনার জানা। এখন আপনিই গুরু আমিই ছাত্র।'

মহারাজার ভক্তি আরো প্রাঞ্জল, আরো প্রকাশ্য। স্বামীজি যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন সে এসে ধীরে-ধীরে বসবে পায়ের কাছটিতে। ধীরে-ধীরে পায়ে হাত বুলিয়ে দেবে।

একদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই লাফিয়ে উঠল স্বামীজি : 'এ কি, এ কী করছেন?'

'আপনার একটু পদসেবা করছি।' সেবাশান্ত স্বরে বললে মহারাজ।

'সে কি কথা! আপনি রাজা—'

'রাজা? আমি আপনার দাসানুদাস।'

('না, না যার যা মর্যাদা তার তা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।' বললে স্বামীজি, 'আপনার এ ব্যবহার প্রজার চোখে হেয় করবে আপনাকে, এ বিধেয় হবে না।')

এবার আবার রাজপ্রাসাদ থেকে পালাতে হয়।

অর্জুন ভেবেছিল শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় কর্মত্যাগের উপদেশ দেবেন। কিন্তু না, কিছুতেই তিনি কর্ম ছাড়তে বললেন না। যা ছাড়তে বললেন তা হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা, ফলাভিলাষ। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি মানে কি? কর্মত্যাগ নয়—সাধ্য কি, দেহধারী জীব হয়ে কর্ম ছেড়ে তুমি বসে থাকো! নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি মানে কর্মবন্ধনের যে কারণ সেই বাসনা বা আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া। আসক্তি ছেড়ে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কাজ করলেই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি। সন্ন্যাস মানে কর্মসন্ন্যাস নয়, ফলসন্ন্যাস। ফলাভিসন্ধি ছেড়ে সর্বকর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করা।

শুধু কাজ করে, শুধু কাজ করেই, শাশ্বত অব্যয় পদ লাভ করা যায় যদি ঈশ্বরকে আশ্রয় করে সে কর্মচক্র গড়ে ওঠে।

খেতড়ি থেকে চলে এল আজমির, আজমির থেকে আমেদাবাদ। আমেদাবাদ থেকে ওয়াড়োয়ান হয়ে লিমড়ি।

দোর থেকে দোরে ভিক্ষা করতে লাগল স্বামীজি, রাত কাটাল পথের ধারে, এখানে-সেখানে। কাছাকাছি কোথাও সাধুর আস্তানা আছে? সে আশ্রয়ই তো তার স্বদেশ-স্ববাস।

যাও ঐ শহরের উপান্তে, মিলে যাবে আস্তানা।

সাধুরা হাত বাড়িয়ে লুফে নিল স্বামীজিকে। আহা, বড় ক্লান্ত হয়েছ দেখছি, কতদিন না জানি খাওনি, ঘুমোওনি গা ঢেলে। নাও, আগে পেট পুরে খাও, বিশ্রামের সরোবরে গা ভাসাও, চাও তো কায়েমি বাসিন্দে হয়ে থাকো।

এত অভ্যর্থনা যেন ভালো লাগেনা।

দুদিনেই বুঝতে পারল স্বামীজি এ সাধুরা হীনব্রতী, এদের ক্রিয়াকলাপও অপরিচ্ছন্ন। ঠিক করল পালাতে হবে এখান থেকে।

কিন্তু এ কি, দরজায় যে পাহারা বসানো। শুধু তাই নয়, দরজায় একেবারে তালা দেওয়া।

দরজায় ধাক্কা মারতে লাগল স্বামীজি। জানলা দিয়ে দেখা গেল বাইরে পাহারাওয়ালা হাসছে। পালাবার পথ নেই। গুহায় বন্দী করেছি কেশরী।

দলের যে পাণ্ডা, চুপিচুপি এল স্বামীজির কাছে। বললে, 'সন্দেহ কি, তুমি একজন উঁচু দরের সাধু। দীর্ঘ দিনের অটুট তোমার ব্রহ্মচর্য। কিন্তু তোমার এ ব্রহ্মচর্যকে বলি দিতে হবে। সেই বলিতেই আমরা আমাদের সাধনায় সিদ্ধ হব। তোমাকে তাই ছেড়ে দেওয়া হবেনা।'

স্বামীজি ভয় পেল কিন্তু মুখে এতটুকু চিহ্ন ফুটতে দিলনা। বরং এমন একখানা ভাব করল যেন পরিহাসের ব্যাপার।

বন্দীকক্ষে একমনে বিপত্তারিণী দুর্গাকে স্মরণ করতে লাগল।

সেই আড্ডায় প্রায়ই একটি ছেলে আসত বাইরে থেকে। অনেকদিন আসেনা, কিন্তু পরদিন সকালেই সে এসে হাজির। আর একেবারে স্বামীজির ঘরে।

ছোট ছেলে, কারো সন্দেহের কারণ ছিলনা। আর আগে থেকেই সে স্বামীজির ভক্ত।

স্বামীজি তাকে কাছে টেনে নিল। বললে, 'ভাই, আমার বড় বিপদ। আমাকে এরা কয়েদ করে রেখেছে। কে জানে হয়তো খুন করবে।'

ছেলেটি গলা নামিয়ে বললে, 'আমি কোনো উপকার করতে পারি?'

'একমাত্র তুমিই পারো। তারই জন্যে তোমাকে পাঠিয়েছেন ঠাকুর।'

'বলুন, এই মুহূর্তে করব।'

'একটা চিঠি লিখে দিতে চাই। তুমি সেটা নিয়ে রাজবাড়িতে ঠাকুরসাহেবকে পৌঁছে দেবে।'

'এখুনি।'

কিন্তু চিঠি লেখবার কাগজ-কলম কই? চারদিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করে একটা খোলামকুচি পাওয়া গেল, আর একটুকরো কাঠকয়লা। তাইতেই সংক্ষেপে বিপদের কথা লিখল স্বামীজি। বললে, এটাকে তোমার চাদরের তলায় করে নিয়ে যাও! এক দৌড়ে চলে যাও রাজবাড়ি। ভালো করে কিছু লিখতে পারলুমনা। তুমিই সব বোলো বুঝিয়ে।'

কে কোথাকার ছেলে, ছুটল ঝড়ের মত। কোনো রাজরক্ষীর সাধ্য নেই আটকায়, একেবারে গিয়ে হাজির হল ঠাকুরসাহেবের দরবারে। চাদরের তলা থেকে অভিনব পত্রখানি বাড়িয়ে ধরল। বলল, 'চলুন, এক নিশ্বাসও দেরি করবার সময় নেই। আমার প্রভু, আমার স্বামীজিকে বাঁচান।'

সব বুঝে নিল ঠাকুরসাহেব। সশস্ত্র পুলিশবাহিনী পাঠিয়ে দিল সেই মুহূর্তে।

স্বামীজিকে উদ্ধার করে আনা হল। লোপাট হয়ে গেল সাধুদের আস্তানা।

'এবার ভালো হয়ে মাকে রুধির দিয়ে পুজো করব।' অসুখের সময় বলছেন সেবার স্বামীজি : 'রঘুনন্দন বলেছেন, নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমং। এবার তাই করব। মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পুজো করতে হয়, তবে যদি তিনি প্রসন্না হন। মার ছেলে বীর হবে, মহাবীর হবে। নিরানন্দে দুঃখে মহালয়ে মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে।'

নিউইয়র্ক থেকে পেরুমলকে লিখছেন বিবেকানন্দ : 'বৎস, ভয় পাইও না। উপরে অনন্ত তারকাখচিত আকাশমণ্ডলের দিকে সভয়দৃষ্টিতে চাহিয়া মনে করিওনা উহা তোমাকে পিষিয়া-ফেলিবে। অপেক্ষা কর, দেখিবে, অল্পক্ষণের মধ্যে দেখিবে, সমুদয়ই তোমার পদতলে। টাকায় কিছুই হয়না, নামেও কিছু হয়না, বিদ্যায়ও কিছু হয়না—ভালবাসায় সব হয়। একমাত্র চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।'

আরো এগিয়ে চলো।

লিম্বড়ি থেকে জুনাগড়। জুনাগড় থেকে ভুজ। ভুজ থেকে প্রভাস। প্রভাস থেকে পোরবন্দর। এগিয়ে চলো।

৩৬

'সর্বাপেক্ষা প্রধান পাপ স্বার্থপরতা—আগে নিজের ভাবনা ভাবা। যে মনে করে আমি আগে যাইব, আমি অপরাপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্যশালী হইব, আমিই সর্ব-সম্পদের অধিকারী হইব, যে মনে করে আমি অপরের অগ্রে স্বর্গে যাইব, আমি অপরের অগ্রে মুক্তি লাভ করিব সেই ব্যক্তিই স্বার্থপর।' বলছেন বিবেকানন্দ : 'স্বার্থশূন্য ব্যক্তি বলেন, আমি সকলের অগ্রে যাইতে চাইনা, সকলের শেষে যাইব—আমি স্বর্গে যাইতে চাই না—যদি আমার ভ্রাতৃবর্গের সাহায্যের জন্যে নরকে যাইতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুত আছি।'

পোরবন্দরে রাজপ্রাসাদে আছে স্বামীজি।

একদল সাধু মরুতীর্থ হিংলাজ যাবার জন্যে জড়ো হয়েছে পোরবন্দরে। অভিলাষ যদি মহারাজা কিছু অর্থসাহায্য করেন। তীর্থে তারা পদব্রজেই যেত, কিন্তু বহু পথ হেঁটে তাদের পা একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে। তপ্ত বালি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে এমন আর শক্তি নেই। ইচ্ছে, জাহাজে করাচিতে গিয়ে সেখান থেকে উটের পিঠে করে পার হবে মরুভূমি। কিন্তু বলিহারি তাদের সাহস! পথে-ভাসা কতগুলি সাধু, তাদের কিনা স্পর্ধা মহারাজার কাছে দরবার করে!

সাধুর দলের চাঁই একজন বাঙালি। আর সে শুনেছে রাজবাটীতে রয়েছে একজন বাঙালি পরমহংস যার কথায় রাজা প্রায় ওঠেন-বসেন। সে শুধু সংস্কৃতেই পণ্ডিত নয়, এমন ইংরিজি বলে যেন মুখে খই ফোটে। তার কথা ঠেলতে পারবেন

না রাজা। এমন খাতির রাজার সঙ্গে, চার ঘোড়ার গাড়ি চড়ে হাওয়া খেতে বেরোয়, রাজপুত্রদের সঙ্গেও ঘোড়ায় চড়ে খেলা করে। বাঙালি হয়ে বাঙালির জন্যে করবেনা একটু সুপারিশ?

চাঁই আর তার এক সাকরেদ দেখা করতে এসেছে পরমহংসের সঙ্গে।

নিচে নেমে এল স্বামীজি।

এ কে? তুমি? স্বামীজি থমকে দাঁড়াল।

আরে, তুমি সেই পরমহংস? আনন্দে উছলে উঠল আগন্তুক।

আগন্তুক আর কেউ নয়, স্বামীজির গুরুভাই ত্রিগুণাতীতানন্দ স্বামী। একেই নিউইয়র্ক থেকে লিখেছিলেন স্বামীজি: 'তোর নামটা একটু ছোটখাট কর দেখি বাবা, কি নামরে বাপ! একখানা বই হয়ে যায় এক নামের গুঁতোয়। ঐ যে বলে হরিনামের ভয়ে যম পালায়, তা "হরি" এই নামে নয়। ঐ যে গম্ভীর-গম্ভীর নাম, অঘভগনরকবিনাশন, ত্রিপুরমদভঞ্জন, অশেষনিঃশেষকল্যাণকর প্রভৃতি নামের গুঁতোয় যমের চৌদ্দপুরুষ পালায়। নামটা সরল করলে ভালো হয় নাকি? এখন বোধহয় আর হবেনা, ঢাক বেজে গেছে, কিন্তু কি জাঁহাদরী যমতাড়ানে নামই করেছ!'

'তুমি এখানে?' স্বামীজি অপ্রস্তুত। ইচ্ছে ছিলনা কোনো পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়।

'তুমি এখানে?' ত্রিগুণাতীত উচ্ছ্বসিত। স্বপ্নেও ভাবেনি এমন প্রত্যাশিত লোকের আশাতীত দেখা পাবে।

'কি প্রয়োজন?'

বলেন ত্রিগুণাতীত। সাধুরা হিংলাজ যাবে, রাজার কাছে কিছু ভিক্ষা চায়। তুমি যদি বলে-কয়ে রাজাকে রাজি করাতে পারো।

'ভিক্ষে?' দলিত ভুজঙ্গের মত ফণাবিস্তার করল স্বামীজি: 'তুমি সাধু হয়ে অর্থ ভিক্ষে করতে এসেছ? ছি ছি, এ কি হীন বুদ্ধি!'

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল ত্রিগুণাতীত।

'যদি স্বেচ্ছায় কেউ কিছু দেয় তাই নেবে, চাইতে যাবে কেন, হাত পাতবে কোন লজ্জায়?' ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলতে লাগল স্বামীজি: 'আর আমিই বা তোমাদের জন্যে রাজার কাছে নিচু হতে যাব কেন? আমি কি কারু কাছে কখনো অর্থের জন্যে হাত পাতি? আজ রাজপ্রাসাদে আছি কাল হয়তো দেখবে দরিদ্রতমের পর্ণকুটিরে। কিংবা হয়তো গাছতলায়। আমি কি আরাম-বিরাম না সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ধার ধারি? ভুলে যেওনা আমরা পরিব্রাজক, ঘর-বনং জল-আগুন সুখ-দুঃখ আমাদের সব সমান। আমরা দ্বিতীয় মহেশ।'

> শ্মশানে গৃহে বা হিরণ্যে তৃণে বা
> তনুজে রিপৌ বা হুতাশে জলে বা
> স্বকীয়ে পরে বা সমত্বেন বুদ্ধ্বা
> বিরেজেঽবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ॥

ত্রিগুণাতীত উজ্জ্বলমুখে তাকিয়ে রইল স্বামীজির দিকে। এই তো সাধকেন্দ্র বীরেশ্বরের মত কথা। ঠাকুর যে বলতেন এর মধ্যে এমন শক্তি আছে যে ইচ্ছে করলে জগৎ মাতাতে পারে এ যেন দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে।

রাজপ্রাসাদও যা ডোমডোকলার ডেরাও তাই। এ সর্বসম আকাশের মত নির্মল ও নিত্যমুক্ত। স্বভাবসচ্চিদানন্দ।

'তোমার কাছে কিছু আছে?' অন্তরঙ্গের মত জিগগেস করলেন স্বামীজি।

কি বলবে ত্রিগুণাতীত যেন একটু দ্বিধা করতে লাগল।

'যদি কিছু থাকে দিয়ে দাও সাধুদের। নিঃস্ব হয়ে যাও। যে নিঃস্ব সেই নিঃসম্বল নয়। হর হর ব্যোম বলে পথ ভাঙো। হোক মরুভূমি, মরুভূমিই আর্দ্রান্তরাত্মা হয়ে উঠবে। মনে ভাববে জীবনের তীর্থযাত্রা নয় জীবনের জয়যাত্রা।'

এই ত্রিগুণাতীতকেই লিখছে স্বামীজি : 'হুটোপাটিতে কি কাজ হয়? লোহার দিল চাই, তবে লঙ্কা ডিঙোবি। বজ্রবাঁটুলের মত হতে হবে, যাতে পাহাড়-পর্বত ভেদ হতে চায়। আসছে শীতে আমি আসছি। দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দেব—যে সঙ্গে আসে আসুক, তার ভাগ্যি ভালো, যে না আসে তার ইহকাল পরকাল পড়ে থাকবে। তা থাকুক, তুই কোমর বেঁধে তৈয়ার থাক। কুছ পরোয়া নেই, তোদের মুখে-হাতে বাগদেবী বসবেন, ছাতিতে অনন্তবীর্য ভগবান বসবেন—তোরা এমন কাজ করবি যে দুনিয়া তাক হয়ে দেখবে।'

'মনুর মতে সন্ন্যাসীর পক্ষে একটা সৎকার্যের জন্যে পর্যন্ত অর্থ সংগ্রহ করা ভালো নয়।' আবার লিখছেন স্বামীজি : 'আমি এখন বেশ প্রাণে-প্রাণে বুঝছি, ঐ সকল প্রাচীন মহাপুরুষগণ যা বলে গেছেন তা অতি ঠিক কথা। আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং। আশাই পরম দুঃখ এবং আশা ত্যাগ করাতেই পরম সুখ। এই যে আমার এ-করব ও-করব এ রকম ছেলেমানুষি ভাব ছিল, এখন সেগুলিকে সম্পূর্ণ ভ্রম বলে বোধ হচ্ছে। সব বাসনা ত্যাগ করে সুখী হও। কেউ যেন তোমার শত্রু-মিত্র না থাকে—তুমি একাকী বাস কর। এইরূপে ভগবানের নাম প্রচার করতে করতে শত্রু-মিত্রে সমদৃষ্টি হয়ে সুখদুঃখের অতীত হয়ে বাসনা ঈর্ষা ত্যাগ করে কোনো প্রাণীকে হিংসা না করে আমরা পাহাড়ে-পাহাড়ে গ্রামে-গ্রামে ভ্রমণ করে বেড়াব।'

রাজপ্রাসাদ ছেড়ে দিয়ে আবার পথে নামল স্বামীজি। এবার এল দ্বারকায়। প্রভাস আগেই হয়ে গেছে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ তনুত্যাগ করেছিলেন, এবার দ্বারকায়, যেখানে রাজত্ব করেছিলেন মহাপ্রতাপে।

কিন্তু কোথায় সেই দ্বারকা! সেখানে আজ সমুদ্রের নীল নির্জনতা।

কৃষ্ণ কি শুধু পতিতপাবন? না, তিনি আবার পতিতঘাতন। ক্ষমা মৈত্রী অহিংসার কথা কি হিন্দুশাস্ত্রে কম আছে? বিদুরবাক্যই তো এই যে 'অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং অসাধুং সাধুনা জয়েৎ।' শত্রুকে প্রীতি দ্বারা অন্যায়ীকে ন্যায় দ্বারা হিংসুককে অহিংসা দ্বারা জয় করবে। তাই বলে কি শত্রুর কাছে বশীভূত হয়ে থাকবে এই কি হিন্দুত্ব? ন শ্রেয়ঃ সততং তেজঃ, ন নিত্যং শ্রেয়সী ক্ষমা। সবসময়েই

তেজ বা সবসময়েই মৃদুতা এ ঠিক নয়। অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করলে যেমন পাপ, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করলেও সেই পাপ।

যুদ্ধে হেরে এসে ঘুমুচ্ছে সঞ্জয়। তার মা বিদুলা তখন তাকে বলছে : হা অরাতিহর্ষবর্ধন কাপুরুষ, গাত্রোত্থান করো। কূপ অল্প জলে পরিপূর্ণ হয়, মূষিকের অঞ্জলি অল্প দ্রব্যে ভরে ওঠে আর কাপুরুষ অল্পমাত্রলাভেই তুষ্ট থাকে। শত্রুনির্জিত হয়ে আর শয়ান থেকোনা, ওঠো। শ্যেনপাখির মত ঝাঁপিয়ে পড়। অশঙ্কিত চিত্তে শত্রুর ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হও। কি নিমিত্ত বজ্রাহত মৃতের মত পড়ে আছ? মুহূর্তমধ্যে প্রজ্বলিত হও। তুষাগ্নির মত চিরকাল ধূমায়িত হয়োনা। চিরকাল ধূমায়িত হওয়ার চেয়ে ক্ষণকাল প্রজ্বলিত হওয়াও শ্রেয়। নির্জিত হয়েও যে ক্রুদ্ধ হয়না, প্রতিকার করেনা, সে ক্লীব—তার আর কিসের জন্যে প্রাণধারণ? ওঠো। বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের পতনসময়েও শত্রুর জঙ্ঘা আকর্ষণ করে তার সঙ্গে একত্র নিপতিত হয়, ছিন্নমূল হলেও ভগ্নোদ্যম হয়না। সুতরাং আয়াসহীন আলস্যে পড়ে থেকোনা। মধ্যম উপায় সন্ধি, অধম উপায় দান, উত্তম উপায় দণ্ড। উত্তম উপায় অবলম্বন করো। উঠে দাঁড়াও, দণ্ডধর হও।

দ্বারকায় শঙ্করাচার্যের সারদা-মঠে আশ্রয় নিল স্বামীজি। নির্জন কক্ষে বসে ভাবতে লাগল সেই অতীত ভারতের কথা। গৃহহীন চিরপথিক সাধুসন্ন্যাসীদের কথা। শুধু কি অতীত? দেখতে পেল ভবিষ্যৎ ভারতের স্বপ্ন। বীর বিজয়ী নতুন আরেকরকম সন্ন্যাসীর দল। কর্মে ত্যাগে বলে বীর্যে ভক্তিতে শক্তিতে নববলসাধক। রামকৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষিত।

দ্বারকা ছেড়ে চলে এল মাণ্ডবীতে।

কোনো তীর্থ আর দেবতা কোনো মঠ আর মন্দির বাদ রাখবোনা। ভারতের সোনার ধূলি মুঠো-মুঠো করে গায়ে মাখবো।

বরোদা হয়ে চলে এল খাণ্ডোয়ায়। হাঁটতে-হাঁটতে হরিদাস চাটুজ্জে উকিলের বাড়িতে।

'কি চাই?' কোর্ট থেকে ফিরছেন, দরজায় সন্ন্যাসী দেখে বিরক্ত হল হরিদাস। ভাবলে ভেক-ধরে-ভিখ-মাগা পেট-বোরেগীদের কেউ হবে।

'আপনাকে চাই।'

অপার বিস্ময়ে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল হরিদাস। নিশ্চয়ই মক্কেল নয়, নিশ্চয়ই উকিলকে চায়না। আপনাকে চাই। যেন মর্মের অদৃশ্য শিকড় ধরে টান-মারা কথা! দুই চোখে কি গভীর পরিচিতির সোহার্দ্য। আপনজন বলেই তো চাইতে পারছি আপনাকে। উজ্জ্বল করে লেখা দুই চোখে যেন সেই ভাষা!

'আসনু! আসুন!' হরিদাস হাত বাড়িয়ে ডেকে নিল স্বামীজিকে। কথায়-কথায় এ কথা আর মনে হলনা, কোথায় উঠেছেন বা কতদিন থাকবেন। মনে হল এ গৃহই যেন তাঁর চিরন্তন নিকেতন, সময় ক্ষয় হয়ে গেলেও যেন থাকার ক্ষয় নেই।

সমস্ত বাঙালি সমাজ মেতে উঠল। জজসাহেব মাধব ব্যানার্জি ভোজ দিলেন। উপনিষদ নিয়ে কথা উঠল। স্বামীজি ব্যাখ্যা করতে শুরু করল। শুধু পাণ্ডিত্য নয়

প্রাঞ্জলতা। কে তর্ক করবে, কে বলবে বুঝতে পাচ্ছিনা। গভীরে যেতে পারলেই তো সারল্যের স্পর্শ লাগে। আর যে স্বচ্ছ সেই তো মুক্ত সেই তো শত্রুঞ্জয়।

বাক্য ও ব্যাখ্যার আলোকস্নানে সবাই রোমাঞ্চিত হতে লাগল।

পিয়ারীলাল গাঙ্গুলি উকিল হলে কি হবে এ অঞ্চলের সেরা পণ্ডিত। সে মন্ত্রাভিভূতের মত বললে, 'এ জগৎপ্রসিদ্ধ হবে।'

কথাটা কানে উঠল স্বামীজির। স্বামীজি মনে মনে হাসল। মনে পড়ল ঠাকুরের কথা।

'আশ্চর্য দর্শন সব হয়েছে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দদর্শন। টকটকে লাল সুরকির কাঁড়ির মত জ্যোতি। তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র—সমাধিস্থ। একটু চোখ চাইলেঁ। বুঝলুম ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে। তখন বললুম, মা, ওকে মায়ায় বদ্ধ কর। তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।'

'শিকাগোতে যাবেন?' ব্যস্ত হয়ে জিগগেস করল হরিদাস।

'সেখানে কি?'

'সেখানে ধর্মমহাসভা হবে। সবধর্মের প্রতিনিধি যাবে। আপনি যাবেন হিন্দুর হয়ে।'

স্বামীজি হাসল। সেই যে বলে 'নেই চাল নেই পাত, চড়িয়ে দাও শুধু ভাত' এ প্রায় সেই অবস্থা। ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার।

'আপনি বম্বে যাচ্ছেন?' ঝলসে উঠল হরিদাস: 'আমি সেখানকার বিখ্যাত ব্যারিস্টার শেঠ রামদাস ছবিলদাসকে চিঠি লিখে দিচ্ছি।'

৩৭

সঞ্জয় বললে, মা, আমি তোমার একমাত্র পুত্র। আমি যদি যুদ্ধে নিহত হই তবে পৃথিবীর জয়ৈশ্বর্য দিয়ে তোমার কী হবে? তোমার হৃদয় কি লৌহনির্মিত? ছেলের জন্যে তোমার এতটুকু করুণা নেই? মা হয়ে তুমি তাকে শত্রুমুখে ঠেলে দেবে?

সৌবীররাজমহিষী বিদুলা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। বললে, পুত্র, তোমার বংশগৌরব আজ কলঙ্কসাগরের অতলজলে ডুবেছে। নষ্ট কীর্তি উদ্ধারের জন্যে তোমাকে উৎসাহ না দিলে আমার পুত্রস্নেহ শুধু গর্দভীর সন্তানবাৎসল্যেরই অনুরূপ হবে। শত্রুনির্জিত ধর্মার্থভ্রষ্ট ভোগসুখবঞ্চিত হয়ে জীবনধারণের উপদেশ কেউই দেবেনা, কোনো দিন না। এমন জীবন সজ্জনবিগর্হিত, মূর্খসেবিত। ছি ছি, তুমি স্নেহের কথা বলছ, তোমার দেহের জন্যে তুচ্ছ মায়ার কথা? দেহে আত্মবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে যদি বিজয়কেশরীর বৃত্তি অবলম্বন করতে পারো তবেই তুমি আমার স্নেহের ধন, আমার অঞ্চলের নিধি। নচেৎ তোমাকে ধিক। নিরুৎসাহ কাপুরুষ পুত্র দিয়ে কোনো নারীই পুত্রবতী হয় না। যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছেই। একবার

হার হয়েছে বলে পুনরায় জয় হবে না এ কেউ বলতে পারে না। শত্রু জয় করবে বলেই তোমার নাম সঞ্জয় রেখেছিলাম। অন্বর্থনামা ভব মে পুত্র মা ব্যর্থনামকঃ। হে পুত্র, সার্থকনামা হও, বিফলনামা বিপরীতনামা হয়ো না।

সঞ্জয় কি তবু চুপ করে থাকবে?

বিদুলা বলতে লাগল, 'যে গ্লানিপঙ্কের মধ্যে তুমি নেমে এসেছ তার চেয়ে অবমাননাকর আর কী আছে? যার প্রতিদিন অন্নচিন্তা তার মত হতভাগ্য আর কেউ নেই। দারিদ্র্য মরণের তুল্য, রাজ্যনাশ পতিপুত্রবধের চেয়েও দুঃখকর। মরালী যেমন এক সরোবর থেকে আরেক সরোবরে উড়ে যায় আমিও তেমনি এক রাজকুল থেকে আরেক রাজকুলে এসেছি। কুলকন্যা থকে কুলবধূ। রাজ্যনাশের বেদনা তাই আমার কাছে সহনাতীত। সঞ্জয়, ওঠো, অকুলে কুল দাও, অস্থানে স্থান দাও, বিপদসাগরে নিস্তারনৌকা হও—'

সঞ্জয় কশাহত তুরঙ্গের মত উঠে দাঁড়াল। বললে, মা, আমি যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত।

যে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত সে জয়ের জন্যেও প্রস্তুত।

শ্রীকৃষ্ণকে সেই কথাই বলছে কুন্তী। বলছে, বাসুদেব, যুধিষ্ঠিরকে তুমি আমার এই কথা বোলো যে সে মন্দমতি, ক্ষত্রিয়ব্রতে অপটু। সঙ্কট হতে মানুষকে ত্রাণ করাই ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য। শান্তি ও স্বাধীনতার সতর্ক প্রহরী ক্ষত্রিয়। তাকে আরো বোলো, তোমার ধর্ম রাজধর্ম, রাজর্ষিধর্ম নয়। তুমি ক্ষত্রত্রাতা বহুবীর্যোপজীবিত। তোমার মায়ের দুঃখ বোঝো, তাকে পরগৃহে নিরাশ্রয়া প্রতিষ্ঠাশূন্যা করে রেখোনা। দণ্ড ধরো, ধনুকে জ্যা আরোপ করো, টঙ্কার দাও—

যেন কুম্ভকর্ণ ঘুমিয়ে আছে, স্বামীজি বললে, যেন 'শিলপিং লেভায়াথান', ঘুমন্ত সমুদ্রদানব। সাড়া নেই স্পন্দন নেই, বিরাট জাড্যের অনড় মৃৎপিণ্ড—এরই নাম বোধ হয় হিন্দুজাতি। একে বলসাধনায় আলোড়িত করতে হবে। জীবন্মৃতকে চেতনাপ্রহারে জর্জরিত সঞ্জীবিত করতে হবে। চাই লৌহদৃঢ় মাংসপেশী, ইস্পাত-কঠিন স্নায়ু, বজ্রভীষণ মনোবল। অশ্বিনী দত্তকে বললেন, 'অশ্বিনী, আর কিছু নয়, এনার্জি ইজ রিলিজিয়ন। শক্তিসাধনাই ধর্মসাধনা।'

বলবীর্যসম্পন্ন হয়ে ওঠাই ধর্মপরায়ণ হয়ে ওঠা।

বম্বে থেকে পুনায় এল স্বামীজি। সেখানে বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে আলাপ।

আলাপ ট্রেনের কামরায়। তিলক আর তাঁর কজন সঙ্গী আলাপ করছেন, এক কোণে স্বামীজি বসে। সেকেন্ড ক্লাস ট্রেনের কামরায় সন্ন্যাসী দেখে স্বভাবতই সন্ন্যাসী নিয়ে কথা উঠল। কর্মবিমুখ আত্মসুখলিপ্ত ভাবভোগীর দল। এই সন্ন্যাসীরাই জগৎ-মায়া-জীবন-অনিত্য ধ্বনি তুলে দেশের সর্বনাশ ঘটিয়েছে। সন্ন্যাসের আদর্শ দেশ থেকে লুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত দেশের মুক্তি নেই।

আলাপ হচ্ছে ইংরিজিতে। আর যেহেতু সবাই স্বামীজিকে সাধারণ একজন মুসাফির মনে করছে, তাই মন খুলে। সংস্কৃত হলে ছিটেফোঁটা জানতে পারে কিছু

বা, কিন্তু ইংরিজির আশা দূরপরাহত।

কান খাড়া করে শুনছে সব স্বামীজি, আর আশ্চর্য হচ্ছে এদের মধ্যে মাত্র একজন সন্ন্যাস-আদর্শের নিন্দা করছে না, বরং সমর্থন করছে, সম্মাননা করছে।

একদিকে একজন অন্যদিকে বহু।

স্বামীজি আর চুপ করে থাকতে পারল না, সেই একক ক্ষীণকণ্ঠের সঙ্গে মেলাল তার বজ্রঘোষ। সন্ন্যাসীর মুখে বিশুদ্ধ-উচ্চারিত অনর্গল ইংরিজি শুনে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল।

সম্যকপ্রকার ত্যাগের নামই সন্ন্যাস। ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ। ত্যাগরূপ-যজ্ঞ ছাড়া অমৃত-উদ্ধার হবার নয়। কিন্তু ত্যাগ যে করবে তার আগে অর্জন দরকার। নিবেদন যে করবে তার আগে নৈবেদ্য-সংগ্রহ করো। দূরে শরনিক্ষেপ করবে তার আগে ধনুকের জ্যা আকর্ষণ করো নিজের দিকে। অহং না পেলে আত্মায় উৎসর্গ করবে কি করে? যার ঐশ্বর্য বা বিভূতি নেই সে ত্যাগ করবে কী! তাতে আর দীনহীন পথের ভিক্ষুকে তফাৎ কোথায়?

মুগ্ধ বিস্ময়ে সবাই তাকিয়ে রইল স্বামীজির দিকে।

আত্মশক্তির বিকাশ করো, সেই শক্তিতেই অনাত্মভাব বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। অর্জন করে সব আপন করো, বিশ্বশক্তি তোমারই আত্মভাবের প্রকাশ। কিছুই আর তোমার পর নয়। তোমার আপনরূপ ছাড়া দ্বিতীয়রূপ আর কিছু নেই। আত্মকে জেনে বিশ্বে তাকে বিস্তার করো। আর জ্ঞান ছাড়া কি ত্যাগ হয়? বিদ্বৎসন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস।

এ কে অনন্যানন্দ মহাপুরুষ?

অনন্তচৈতন্যময় সত্তার সাগরে আত্মভাবের বুদ্বুদকে নিমজ্জিত করে দাও। তাতেই অমৃতত্ব। ঐ অমৃত ছাড়া তৃপ্তি নেই ক্ষান্তি নেই। ঐ অমৃতেই সকল ভ্রমণের শেষ, সকল অন্বেষণের উত্তর।

যে একা সন্ন্যাস-আদর্শের স্তুতি করছিল সে এগিয়ে এল স্বামীজির কাছে। জিগগেস করল, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'পুনায়। আপনি? আপনার নাম কি?'

'আমার নাম বালগঙ্গাধর তিলক।'

তিলক স্বামীজিকে পুনায় নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। একমাস রাখল নিজের কাছে। দেশমাতৃকার মুক্তিসাধনব্রতের নবোচ্চারিত মন্ত্রের অর্থ শুনল।

মহাবলেশ্বরে লিমড়ির ঠাকুরসাহেবের সঙ্গে দেখা। 'স্বামীজি, কেন সারাদেশ পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন? লিমড়িতে চলুন, আমার প্রাসাদে চিরদিন বিশ্রাম করবেন।'

স্বামীজি হাসল। বললে, 'আমার বিশ্রাম নেই। আমি যে কাজ উদযাপন করতে বেরিয়েছি তার টানে আমাকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে হবে। ভ্রমণই আমার স্থিতি। কর্মই আমার বিশ্রাম।'

মহাবলেশ্বর থেকে কোলাপুর।

কোলাপুরের রাণী স্বামীজিকে একখানি গেরুয়া দিল। যদি নেন তো চিরকৃতার্থ হব। কত কিছু দান করছি ভাণ্ডার থেকে। তার সঙ্গে অহঙ্কার কোন না মেশানো থাকে। কিন্তু এ দান নয়, এ নিবেদন। এতে দীনতার পুণ্যগন্ধ।

সেই সুবাসটুকু অনুভব করল বলেই গ্রহণ করল স্বামীজি।

সেখান থেকে বেলগাঁও। প্রফেসর ভাটের বাড়ি।

এ এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী। আর-আরদের মত খালি গায়ে থাকেনা, বেনিয়ান পরে। মাথায় জটা নেই, পাগড়ি। হাতে দণ্ড নেই, লম্বা একটা লাঠি, বেড়াবার ছড়ি বললেই ভালো হয়। কমণ্ডলু আছে একটা বটে কিন্তু পকেটে তিনখানি বইয়ের মধ্যে একখানি ফরাসী গানের স্বরলিপির বই। আর কথা বলে কিনা ইংরিজিতে। শুধু ধর্ম আর ঈশ্বরের কথা নয়, সমস্ত লোকসংসারের কথা, সমাজনীতি রাজনীতি অর্থনীতি। শুধু শাস্ত্র নয়, সমস্ত খবরের কাগজ যেন মুখস্ত। তারিখ মিলিয়ে দেখ, এতটুকু নেই কোথাও ভুলচুক।

শিষ্যা মৃণালিনী বসুকে চিঠি লিখলেন স্বামীজি :

'মুষ্টিমেয় ধনীদের বিলাসের জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞতার অন্ধকারে ও অভাবের নরকে ডুবিয়া থাকুক, তাহাদের ধন হইলে বা তাহারা বিদ্যা শিখিলে সমাজ উচ্ছৃংখল হইবে! সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না, এই তুমি-আমি দশজন বড় জাত? সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে—শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে সে বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ। যে সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্তির ব্যাঘাত করে তাহা অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয় তাহাই করা উচিত—'

তার উপর কিনা পান-শুপুরি চেয়ে নিয়ে খায়। সেদিন কিনা দোক্তাও চেয়ে বসল। এতে স্তম্ভিত হবার কিছু নেই। বলছে স্বামীজি। শ্রীগুরুমহারাজ আমার অসম্ভব রকম পরিবর্তন ঘটিয়েছেন কিন্তু এসব তুচ্ছ নেশাগুলির দিকে নজর দেননি। বলেছেন এ থাক, এতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

'মাছমাংস খান, না, নিরামিষ?'

'মাঝখানের ঐ না-টুকু নেই। যখন যা জুটবে তাই খাব।'

'যদি না জোটে?'

'উপবাসে থাকব। নিরম্বু উপবাস।'

'যদি অহিন্দু নিয়ে আসে খাবার?'

'খাব। কত মুসলমানের বাড়ি অতিথি হয়েছি।'

অসাধারণই বটে। অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি পড়ছিল ভাটে, পাশটিতে চুপ করে এসে বসেছে স্বামীজি। ভুল উচ্চারণ ও ভুল উদ্ধৃতির সংশোধন করে দিচ্ছে।

সমস্ত শাস্ত্র যেন জিহবাগ্রে।

তর্কেও বিন্দুমাত্র রোষ নেই রূঢ়তা নেই। সেদিন তো বেলগাঁওয়ের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র তর্ক করতে এসে কটু কথা বলে বসল, তত্রাচ স্বামীজির মুখের

সরল লাবণ্যটুকু ম্লান হলনা। বললে, যাই বলুন বেদান্ত বনের জিনিস নয় ঘরের জিনিস, কোনো সম্প্রদায়ের নয় সমস্ত বিশ্বমানবের।

এই বিশ্বমানবের একটিমাত্র ধ্বনি। তাই ওঁ। ওঁ-ই পরমাত্মার প্রিয়নাম। ওঁ-ই সম্মতিবাচক স্বীকৃতিজ্ঞাপক শব্দ। তাই ওঁ-ই পরমাত্মার প্রতীক। ওঁ-এর মানেই হচ্ছে, হাঁ, আছে, পেয়েছি। সেই ধ্বনিটি শুধু আমাতে নয় সমস্ত চরাচরে। সমস্ত পরিপূর্ণতার স্বীকারমন্ত্রই ওঁ! এইটিই আমার পতাকার পত্রচিহ্ন।

পথে-প্রান্তরে এই পতাকা বহন করে নিয়ে যাব, প্রাসাদে-কুটিরে, হাটে-বাজারে, গঞ্জে-গ্রামে, যত্রতত্র। যিনি দিয়েছেন তিনিই বহন করবার শক্তি দেবেন। আর যদি না দেন, প্রকৃতির কাছে না হয় বলিপ্রদত্ত হব।

'জগতের মধ্যে যারা পরমসাহসী যাতনাই তাদের বিধিলিপি', লিখছেন স্বামীজি : 'আমার স্বাভাবিক অবস্থায় আমি তো নিজের দুঃখযন্ত্রণাকে স্বচ্ছন্দেই বরণ করি। কাউকে না কাউকে এ জগতে দুঃখ ভোগ করতেই হবে। আমি আনন্দিত, প্রকৃতির কাছে যারা বলিপ্রদত্ত হয়েছে আমিও তাদেরই একজন।'

৩৮

কোথাও বিশ্রাম করব না এই আমার প্রতিজ্ঞা।

এ মহাবীর হনুমানের কথা।

'হে হরিশার্দূল, হে বানরশ্রেষ্ঠ, মহার্ণব লঙ্ঘন করো।' সেনাপতি জাম্ববান বলছে হনুমানকে, 'তুমি ছাড়া কারু সাধ্য নেই এই দুষ্পার পারাবার অতিক্রম করে। এই পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গ-আচ্ছন্ন সমুদ্র দেখে বানরকুল বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে, তুমি একবার তোমার বিক্রম দেখাও। তুমি বীর্যবান, বুদ্ধিমান, মহাবলপরাক্রম। শৈশবে নবোদিত সূর্য দেখে পরিপক্ক ফল মনে করে হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়েছিলে, তিন-শত যোজন উঠেছিলে আকাশে। আবার তোমার সেই দুর্দমবেগ প্রকাশিত করো।'

বানরবৃদ্ধদের অভিবাদন করে হনুমান বললে, 'সকলে নিশ্চিন্ত হও, আমি মহেন্দ্র পর্বতের তুঙ্গতম শিখরে গিয়ে উঠছি। আমি সেখান থেকে লাফ দেব। রামের হস্তনিক্ষিপ্ত শর যেমন ছোটে তেমনি প্রধাবিত হব শূন্যে। আকাশে-সমুদ্রে এমন কেউ নেই যে আমার বেগ প্রতিরোধ করে।'

মহাকায় মহাকপি লাফ দিল। পক্ষসমন্বিত পর্বতের মত শোভিত হল আকাশে। তখন সাগর ভাবল এর কিছু আনুকূল্য করি। জলমগ্ন মৈনাকপর্বতকে বললে, 'গিরিবর, তুমি এবার একবার উত্থিত হও। ভীমকর্মা হনুমান শ্রান্ত হয়েছে, তোমার উপর বসে সে একটু বিশ্রাম করবে।'

সাগরজল ভেদ করে মৈনাক উত্থিত হল।

হনুমান ভাবল আকস্মিক এক বিঘ্ন এসে উপস্থিত হল বুঝি। বুকের আঘাতে তাকে আবার অবনমিত করল।

মৈনাক বললে, 'বানরোত্তম, তুমি আমাকে ভুল বুঝোনা। তোমাকে বিশ্রাম দেবার জন্যেই আমি আবির্ভূত হয়েছি। তুমি দুষ্করকর্মে ধাবমান হয়েছ, তোমাকে অত্যন্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত দেখাচ্ছে। দুদণ্ড আমার শৃঙ্গে বসে বিশ্রাম করো। তারপর আবার যাত্রা কোরো।'

আকাশপথে হনুমান উত্তর দিল, 'তোমার কথাতেই আমি আতিথ্যলাভ করেছি। দুঃখিত হয়োনা, আমার বিলম্ব করার সময় নেই। কোথাও বিশ্রাম করব না এই আমার প্রতিজ্ঞা।'

সেই প্রতিজ্ঞা স্বামী বিবেকানন্দেরও।

ফরেস্ট অফিসর হরিপদ মিত্রর ইচ্ছে স্বামীজিকে তাঁর বাড়ি নিয়ে যায়।

'কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?' স্বামীজি ইতস্তত করল : 'বাঙালি দেখেই যদি চলে যাই তবে মারাঠি ভদ্রলোক ক্ষুণ্ণ হতে পারেন।'

'কিন্তু কাল সকালে আমার ওখানে চা খেতে আপত্তি নেই তো?'

'না, না, যাব চা খেতে।'

আটটা বেজে গেল, তবু স্বামীজির দেখা নেই। এ কেমনতরো চা খাওয়া! ভুলে গেল নাকি? ভুলেই বা যাবে কেন?

হরিপদ নিজেই দেখতে চলল কি ব্যাপার।

গিয়ে দেখল মারাঠির বাড়িতে বিরাট মজলিশ। শহরের বহু জ্ঞানী-গুণী লোক স্বামীজিকে ঘিরে বসে ধর্মসম্বন্ধে বিচিত্র প্রশ্ন করছে, ইংরিজিতে, বাঙলায়, হিন্দিতে, সংস্কৃতে—আর স্বামীজি যার যা ভাষা সেই ভাষায় তাকে উত্তর দিচ্ছে অনর্গল। এতটুকু বিরতি নেই, বিরক্তি নেই। প্রশ্নকর্তারাই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। সাধারণত উত্তরদাতাই ঘায়েল হয়, আমতা-আমতা করে আবোলতাবোল বকে, এখানে প্রশ্নকারীই নিরস্ত-পরাস্ত। কোথাও সুতীক্ষ্ন যুক্তি, কখনো বা গভীর উপলব্ধির তেজ, কোথাও বা নৃশংস বিদ্রূপ। প্রাচীন শাস্ত্র থেকে আধুনিক বিজ্ঞান সর্ববিষয়েই অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি। মুগ্ধবিস্ময়ে শুনতে লাগল হরিপদ।

হাত জোড় করল স্বামীজি। হরিপদকে লক্ষ্য করে বললে, 'ভাই, যেতে পারিনি, মার্জনা চাই। এতগুলো লোকের প্রাণের পিপাসা মেটাতে গিয়ে নিজের পিপাসাকে ভুলে যেতে হয়েছে।'

'আপনি আমার বাড়ি চলুন। শুধু একবেলা চা খেতে নয়, কয়েকদিন থাকতে।'

'বড় জোর তিনদিন। একটি বৃক্ষের নিচেও সনাতন গোস্বামী তিনদিনের বেশি বসতেন না। কিন্তু তার আগে এই গৃহস্বামীর মত করো। তিনি না ছাড়লে যাই কি করে?'

মারাঠি ভদ্রলোকের মত করিয়ে হরিপদ স্বামীজিকে নিয়ে গেল স্বগৃহে। বললে, 'মহারাজ, একটা কথা জিগগেস করব?'

'করো।'

'ধর্ম ঠিক ঠিক বুঝতে হলে অনেক কিছু লেখাপড়া করতে হয়, তাই না?'

কেমন যেন অসহায় দেখাল হরিপদকে। স্বামীজি কত কিছু পড়েছেন, তাঁর

পাণ্ডিত্য অগাধ স্মৃতিশক্তি দুর্মর—সেই তুলনায় হরিপদ তো সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের চেয়েও তুচ্ছ। তার কি উপায় হবে?

স্বামীজি হাসল। বললে, 'ধর্ম বুঝতে কানাকড়ি বিদ্যেরও দরকার হয়না। বোঝাতে গেলেই জাহাজবোঝাই বিদ্যের দরকার। ঠাকুর বলতেন, নিজেকে মারতে একটা নরুন হলেই চলে, কিন্তু অন্যকে মারতে হলে দা-কুড়ুল বর্শা-টাঙি অনেক রকম অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হয়। প্রভুকেই দেখনা। রামকেষ্ট বলে সই করতেন কিন্তু তাঁর মত ধর্ম আর কে বুঝেছিল বলো?'

শ্রীকৃষ্ণ কি বললেন অর্জুনকে? বললেন, যে অনন্যভাক বা অনন্যভক্তি হয়ে আমাকে ভজনা করে সে যদি ঘোর দুরাচারও হয়, জানবে সে সাধু। ভক্তির স্পর্শেই সে সাধু হয়ে যাবে। আর, যে ভক্ত, জানবে তার কখনো বিনাশ নেই।

ঈশ্বরকে ভালোবাসাই তো ধর্মসাধন। আর ভালোবাসাই তো সহজসাধন।

ভক্তির স্পর্শেই দুর্বৃত্তও নিমেষে সাধু হয়ে উঠবে। হাওয়াতে মেঘের টুকরোটুকু সরে গেলেই মুহূর্তে সূর্যের দীপ্তিতে জগৎ উদ্ভাসিত। ভক্তিরই এই পতিতপাবনী শক্তি। হেন পাপ নেই যা জগাই-মাধাই করেনি, প্রেমের স্পর্শে কি হয়ে গেল? নিশাকালে গঙ্গাস্নান সেরে নির্জনে বসে প্রতিদিন এখন দুইলক্ষ কৃষ্ণনাম জপ করছে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, আমার চিন্তায়ই মনকে নিযুক্ত রাখো, আমাতেই ভক্তিমান হও, পূজাপরায়ণ হও, আমাকেই নমস্কার করো। আমাতেই শরণ নিয়ে অধিষ্ঠিত থাকো। যা কিছু করো, কর্ম ও ভোজন, দান বা তপস্যা, সব আমাকেই অর্পণ করো। যে অনন্যচিত্ত হয়ে আমাকে চিন্তা করে আমি তার যোগক্ষেম বহন করি। অর্থাৎ যা তার নেই তার সংস্থান করি, যা তার আছে তা রক্ষা করি।'

অলব্ধ বস্তুর সংস্থান হচ্ছে যোগ আর লব্ধবস্তুর রক্ষণ হচ্ছে ক্ষেম।

'যে কোনো কাজ করবে মনপ্রাণ ঢেলে করবে।' বললেন স্বামীজি, 'নির্ধারিত কাজ সুচারুরূপে নির্বাহ করাই ধর্ম। আমি এক সাধুকে জানতাম, বসে-বসে অনেকক্ষণ ধরে নিজের পিতলের লোটাটাকে মাজত একমনে। মেজে-মেজে সোনার মত ঝকঝকে করে তুলত। যেমন তার পূজায় নিষ্ঠা তেমনি এই লোটা-মাজায়। কোনোটাই কম নয়। লোটা মাজছে যেন অন্তর মার্জনা করে স্বর্ণবর্ণ করে তুলছে।'

একটি ছাত্র এসেছে স্বামীজির কাছে। সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা, মতলব কি করে তা এড়ানো যায়, তাই সাধু হবার অভিলাষ। বললে, 'আমাকে আশ্রয় দিন। সাধু করে নিন আপনার সঙ্গে।'

স্বামীজি বললে, 'এম, এ-টা পাশ করে এস সাধু করে নেব। সাধু হওয়ার চেয়ে এম, এ পাশ অনেক সোজা।'

কি আশ্চর্য, মনের কথাটা কি করে ধরে ফেললেন! যুবক চলে গেল হেঁটমুখে।

সব সময়েই অসুখ—এই মনোব্যাধিতে ভুগছে হরিপদ। আর থেকে থেকে

একটার পর একটা ওষুধ খাচ্ছে।

স্বামীজি বললে, 'আমি তোমার অসুখ সারিয়ে দিচ্ছি।'

প্রায় আকাশ থেকে পড়ল হরিপদ। বললে, 'সারিয়ে দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, দিচ্ছি।' বজ্রকণ্ঠে বললে স্বামীজি, 'তোমার কোনোই অসুখ নেই—এই বলবান প্রত্যয়ের ভাবই তোমার সর্ব অসুখের মহৌষধ। বিষ নেই বললে সাপের বিষও চলে যায়, অসুখ নেই বলতে পারলে অসুখও উড়ে যাবে। আনন্দ করো, সেই আনন্দ যাতে শরীর না ক্লান্ত হয় মনে না অনুতাপ জাগে, আর শুদ্ধ-ভাবে থাকো আর মহৎ চিন্তা মনে লালন করো। কোথায় ব্যাধি, কোথায় অবসাদ! আর মৃত্যু? মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে দাও। ভাবো, তোমার আমার মত শতসহস্র লোক মরে গেলেও পৃথিবীর কিছু আসে যায়না। মরাটাকে বয়ে যেতে দাও, বাঁচাটাকেই বয়ে যেতে দিও না।'

হরিপদর রোগব্যাধি সেরে গেল।

আরো এক ব্যাধি আছে—সবসময়ে অফিসের কর্তাদের সমালোচনা করা। সমালোচনা করা মানে নিন্দে করা।

'তোমার সমালোচনা কে করে! পালটা একবার শুনে এলে হয় তোমার কর্তাদের মুখে!' স্বামীজি ধমক দিয়ে উঠল : 'শোনো। তুমি যদি তাদের প্রতি প্রসন্ন হও তারাও তোমার প্রতি প্রসন্ন হবে। তুমি বিরূপ হলে তারাও বিরূপ। অন্যের গুণ দেখ, অন্যেও তোমার গুণ দেখবে। তোমার প্রতি অন্যের ব্যবহার তাদের প্রতি তোমারই মনের প্রতিচ্ছায়া। যেমন ভিতরের চিত্ত তেমনি বাইরের চিত্র।'

নিরভিযোগ হয়ে গেল হরিপদ।

হরিপদর বিলিতি ভঙ্গি, ভিখিরিকে ভিক্ষে দেবেনা।

'দারিদ্র্য তাড়াতে পারো বুঝি, নয়তো দোরগোড়া থেকে ভিখিরিকে তাড়িয়ে দিয়ে বাহাদুরি কি?'

'পয়সা দিলেই তো গাঁজা কিনে খাবে।'

'দেবে তো দুচারটে পয়সা, কি খেল না খেল তোমার খোঁজখবরে কি দরকার? তোমার উদ্বৃত্ত আছে, দিয়েই তোমার পাপক্ষয়।'

হরিপদর কৃপণ মুষ্টি উন্মুক্ত হল।

আরো এক উপসর্গ আছে, তর্ক করে।

স্বামীজি বললে, 'তর্ক মরুভূমি। উপলব্ধিই হচ্ছে শ্যামছায়াচ্ছন্ন খর্জুর-কুঞ্জ।'

কয়েকদিন ধরে রাখতে চাইল হরিপদ, স্বামীজি ঘাড় নাড়ল। এবার যাব দাক্ষিণাত্যে। নাগমাতা সুরমার মত সংসাররাক্ষসী যতই মুখব্যাদান করুক হনুমানের মত যাব নিষ্ক্রান্ত হয়ে।

হনুমান সাগর লঙ্ঘন করছে দেখে সিদ্ধ-গন্ধর্ব-দেবতারা নাগমাতা সুরমাকে বললে, রাক্ষসরূপ ধরে হনুমানের যাত্রাপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করো। সুরমা ভয়াবহ

মূর্তি ধরে মুখবিস্তার করলে। হনুমানকে বললে, 'বানরোত্তম, দেবতার বিধানে তুমি আমার ভক্ষ্যরূপে নির্বাচিত হয়েছ, সুতরাং আমার মুখে প্রবেশ করো।'

কি দুর্নিমিত্ত! হনুমান দেহ স্ফারিত করতে লাগল, সুরমার গ্রাসও বড় হতে লাগল অনুরূপ। হনুমান তখন কি করে! মুহূর্তমধ্যে অংগুষ্ঠপ্রমাণ হয়ে গেল। ছোট্টটি হয়ে মুখবিবরে প্রবেশ করেই চক্ষের পলকে বেরিয়ে এল। অন্তরীক্ষে উঠে বললে, 'নাগমাতা, তোমার কথা রেখেছি। এবার চলেছি শ্রীরামের কথা রাখতে।'

মহামায়া যতই বন্ধনরজ্জু আনুন দড়িতে কুলোবেনা। আর যদি বেশি দড়ি আনেনও, এত ছোট্টটি হয়ে যাবে, গ্রন্থি দিতে পারবেননা কিছুতেই।

৩৯

আমি যেমন বুঝি আর কেউ তেমনি বোঝেনা এই ভাবটা ত্যাগ করো।

এক রাজার রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে বিদেশী। রাজা মন্ত্রণাসভা ডাকলেন। কি উপায়ে রাজ্যরক্ষা হতে পারে তার উপদেশ করো। কারুশিল্পীরা বললে, রাজ্যের চারদিকে গভীর করে পরিখা খনন করলেই হবে। মৃৎশিল্পীরা বললে, শুধু পরিখায় ঠেকানো যাবেনা। আমরা বলি উঁচু করে মাটির দেয়াল দিন। সূত্রধরেরা বললে, দেয়াল দেওয়া ভালোই তবে মাটির নয়, কাঠের। চর্মকারেরা বললে, কাঠের নয় চামড়ার, কে না জানে কাঠের চেয়ে চামড়া মজবুত। কর্মকারেরা হাসল। বললে, লোহার চেয়ে আর শক্ত কে? লোহার দেয়ালই সবচেয়ে সমর্থ। উকিল-মোক্তারের দল এগিয়ে এল। বললে, ও সবে অনেক শ্রম অনেক অর্থ। আমাদের বলুন আমরা শত্রুপক্ষকে যুক্তিতর্কে বুঝিয়ে দিয়ে আসি বলপূর্বক পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করায় তাদের কোনো অধিকার নেই। আহা, যুক্তিতর্ক শোনবার জন্যে কান তারা খাড়া করে আছে আর কি। এগিয়ে এল পুরোহিতের দল। বললে, আমরা যা বলছি তাই সেরা কথা, তাই পালন করুন। গ্রহদেবতার সন্তোষ করুন। যাগযজ্ঞ করুন, শান্তিস্বস্ত্যয়ন করুন—

যার যেমন স্বার্থ সে তেমনি বলছে। তারপর শুরু হয়ে গেল অন্তঃকলহ, আত্মসাধনসংঘাত।

ঠাকুর বলতেন, সবাই মনে করে আমার ঘড়িই ঠিক যাচ্ছে। সূর্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার কথা কারু মনে হয়না।

সেই সূর্য কি? সেই সূর্য ঈশ্বর।

ঈশ্বর কি? স্বার্থস্পর্শলেশশূন্য নিরন্তর কর্ম।

'প্রভুর মত কাজ করো, ক্রীতদাসের মত নয়।' বলছে স্বামীজি : 'নির্বিশ্রাম কাজ করো। শতকরা নিরানব্বুই জন দাসের মত কাজ করে, তাই তার ফল দুঃখ, সেরূপ কাজ স্বার্থপর। স্বাধীনতার সঙ্গে কাজ করো, ভালোবাসার

সঙ্গে কাজ করো। স্বাধীনতা না থাকলে ভালোবাসা কোথায়? ক্রীতদাসের কি ভালোবাসা থাকে? একটি দাস কিনে এনে শিকলে বেঁধে যদি তাকে কাজ করাও সে বাধ্য হয়ে কষ্টেসৃষ্টে কাজ করবে বটে, কিন্তু তাতে ভালোবাসার নাম-গন্ধও থাকবে না। স্বার্থের জন্যে যে কর্ম তাতে শুধু ক্ষোভ, আর ভালোবাসার জন্যে যে কর্ম তাতে শুধু আনন্দ।'

'শরীর তো যাবেই, কুড়েমিতে কেন যায়?' আবার বলছেন স্বামীজি : 'মর্চে পড়ে-পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে মরা ভালো। মৃত্যু যখন অনিবার্য তখন ইট-পাটকেলের মত মরার চেয়ে বীরের মত মরা ভালো। এ অনিত্য সংসারে দুদিন বেশি বেঁচেই বা লাভ কি। জরাজীর্ণ হয়ে একটু-একটু করে মরার চেয়ে বীরের মত অপরের এতটুকু কল্যাণের জন্যে লড়াই করে নিমেষে মরে যাওয়াও সুখের। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি। হে বৎস, সৎকর্মকারীর কখনো দুর্গতি হয়না।'

বেলগাঁও থেকে বাঙ্গালোর।

স্বামীজি ভাবল, গাঢাকা দিয়ে থাকব। কিন্তু সূর্য কতক্ষণ থাকতে পারে মেঘাবৃত হয়ে? মহীশূর রাজার দেওয়ান শেষাদ্রি আয়ারের কাছে খবর গেল।

এ কে অত্যাশ্চার্য পুরুষ! সমস্ত শাস্ত্র নখাগ্রে, প্রতিভাভাসিত ললাট, জ্যোতির্ময় চক্ষু, কে এ তরুণ সন্ন্যাসী! সমস্ত উপস্থিতি এই শুধু উচ্চারণ করছে সে ঈশ্বরপ্রেরিত।

নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল আয়ার।

'কোরানের এ জায়গাটা বুঝিয়ে দিতে পারেন?' মহীশূরের রাজার সভাসদ আবদুল রহমান এসে বললে।

'কোন জায়গাটা?' কুণ্ঠার এতটুকুও কুয়াশা নেই এমনি নিশ্চিন্ত সারল্য স্বামীজির কণ্ঠস্বরে।

জায়গাটা আওড়াল রহমান।

আবৃত্তি শেষ হতে না হতেই অর্থের গ্রন্থিমোচন করল স্বামীজি। সন্দেহের মীমাংসা করে দিল।

আয়ারের ইচ্ছে হল রাজা উদিয়ারের সঙ্গে স্বামীজির আলাপ করিয়ে দেয়। রাজা একবার চোখ মেলে দেখুক কাকে বলে ত্যাগ কাকে বলে বিদ্যা কাকে বলে ধর্মদৃষ্টি। কাকে বলে বহ্নিদীপ্তিময় ব্যক্তিত্ব।

প্রথম দর্শনেই বিমোহিত হল উদিয়ার। সন্ন্যাসী বটে, রাজপুত্রের মত শোভান্বিত। এ কি গেরুয়া, না, ত্যাগ ও প্রেম, কর্ম ও জ্ঞানের বহ্নিপতাকা!

রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেল রাজা। একসার কুঠুরি ছেড়ে দিল স্বামীজিকে। স্বামীজি বললে, 'এতগুলো ঘর দিয়ে আমার কি হবে?'

'বেশ একটু মেলে-ছড়িয়েই থাকুন।'

'প্রসারিত হব শুধু কক্ষে নয়, বিশ্বে। শুধু খিলে নয় নিখিলে। আঙিনা ও আকাশকে এক করে।'

কদিনেই রাজার অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল স্বামীজি।

কিন্তু একাকী না হতে পারলে সেই অন্তরঙ্গতা স্বাদু হয়না। রাজা মানেই একটা ভিড়, পারিষদের বাহিনী। পারিষদেরা রাজাকে কিছুতেই একা থাকতে দেবে না। তাতে স্বামীজির কি। সে বিগতভী, তার কাছে একাও যা একশোও তাই।

সপার্ষদ সভাগৃহে বসে আছে রাজা, স্বামীজিকে জিগগেস করল, 'তুমি আমার পার্ষদদের কি রকম মনে কর?'

আর যেন প্রশ্ন পেলনা রাজা।

যতই অস্বস্তিকর হোক, স্বামীজি পেছপা হবার পাত্র নয়। বললে, 'পার্ষদরা সব জায়গাতে সব সময়েই একরকম। চাটুকারিতার শুধু একটাই নাম। আর, তা চাটুকারিতা।'

সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

'আমি কারু মুখ চেয়ে কথা বলিনা। মনে যা অনুভব করি তাই খুলে প্রকাশ করি।' ধীর স্বরে বললে স্বামীজি।

কিন্তু রাজার বড় ভাবনা হল। নিভৃতকক্ষে ডেকে নিয়ে গেল স্বামীজিকে। বললে, 'এ আপনি করেছেন কি?'

'কি করেছি?'

'এমন স্পষ্টবক্তা কি হতে আছে?'

'সত্য সব সময়েই স্পষ্ট। সরল, সুস্ফুট, বোধগম্য।'

'আমার পার্ষদরা সব ভীষণ চটেছেন, দেওয়ানও ক্ষুণ্ণ হয়েছেন—' রাজারও যেন খানিকটা মনোভঙ্গ হয়েছে মনে হচ্ছে।

'অন্ধকারে যারা থাকতে চায় তারা কি সূর্যকে সহ্য করতে পারে?'

"আপনার জন্যে আমার ভয় হচ্ছে স্বামীজি।'

'আমার জন্যে?' স্বামীজি হাসল।

'স্পষ্টবাদিতা নিরাপদ নয়, তার ফল শত্রুসৃষ্টি। ভয় হয় শত্রুর দল আপনার ক্ষতি, এমন কি আপনার মৃত্যুর জন্যে না ষড়যন্ত্র করে।' রাজার মুখ কালো, ঘোরালো হয়ে উঠল : 'এমন ক্ষেত্রে বিষপ্রয়োগে সাধুর জীবননাশের কথাও আমার জানা আছে।'

'জীবননাশ?' উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল স্বামীজি। 'আপনি কি মনে করেন ঠিক-ঠিক যে সন্ন্যাসী সে প্রাণভয়ে সত্য বলতে কুণ্ঠিত হয়?'

'তবুও—'

'যদি আপনার ছেলে এসে জিগগেস করে, তার বাবা কেমনতরো লোক, আমি তাহলে বলব তিনি সর্বগুণাধার? যে গুণ আপনাতে নেই তাই আপনার ভয়ে, স্পষ্টবাদিতা নিরাপদ নয় বলে, বলব আপনাতে আছে? যে চাটুবাদকে ধিক্কার দিচ্ছি, নিজেই করব সেই চাটুবাদ? তবে এক কথা—'

উৎসুক হয়ে তাকাল রাজা।

'যার যা দোষ বা দুর্বলতা তা তার মুখের উপরই বলি। অগোচরে নিন্দা করিনা।'

'যদি তার সম্বন্ধে তার অসাক্ষাতে কথা ওঠে?'

'তখন যেটুকু তার মধ্যে গুণ তার উল্লেখ করি।'

'বৎসগণ, কামড়ে পড়ে থাকো, আমার সন্তানদের মধ্যে কেউ যেন কাপুরুষ না থাকে।' আলাসিঙ্গাকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি : 'তোমাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা সাহসী সর্বদা তার সঙ্গ করবে। সময়, ধৈর্য ও অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে তবে কাজ হয়। আমি লৌহবৎ দৃঢ় হৃদয় ও ইচ্ছাশক্তি চাই, যা কিছুতেই কম্পিত হয় না। দৃঢ়ভাবে লেগে থাকো; প্রভু তোমাদের আশীর্বাদ করুন।'

আবার লিখছেন মেরি হিলকে : 'মধুভাষী হওয়া লোকের সাংসারিক উন্নতির পক্ষে কতটা সহায়ক তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি মধুভাষী হতে চেষ্টা করি, কিন্তু যেখানে তা হতে গেলে আমার অন্তরস্থ সত্যের সঙ্গে একটা উৎকট রকমের আপোষ করতে হয়, সেখানে আমি পিছিয়ে যাই। আমি দীনতায় বিশ্বাসী নই, আমি সত্যে বিশ্বাসী, আমি সমদর্শিতার ভক্ত।'

'ভগিনী', আরো লিখছেন, 'আমি যে প্রত্যেক ঘোর মিথ্যার সঙ্গে মিষ্টমুখে আপোষ করতে পারিনা তার জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু সত্য করে তোমাকে বলি, কিছুতেই পারি না আপোষ করতে। সারাজীবন এর জন্যে আমি ভুগেছি, তবু পারি না, শতশতবার চেষ্টা করেও পারি না। ঈশ্বর মহিমময়, তিনি আমাকে ভণ্ড হতে দেবেন না। যৌবন ও সৌন্দর্য নশ্বর, নাম যশ ধন বৈভব নশ্বর, এমন কি বন্ধুতা ও ভালোবাসাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, একমাত্র সত্যই চিরস্থায়ী। হে সত্যরূপী ঈশ্বর, তুমিই আমার একমাত্র নিয়ন্তা হও। শুধু মিষ্ট শুধু মধু করে আমাকে রেখোনা। আমি যেমন আছি যেন তেমনিই থাকি। নিত্য নিয়ত আমাকে যেন কে বলছে, হে সন্ন্যাসী, তুমি নির্ভয়ে দোকানদারি ত্যাগ করে শত্রু-মিত্র ভেদ না রেখে সত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকো। আমি হৃদয়বাসী সত্যের বাণী না শুনে কেন বাইরের লোকের খেয়ালমাফিক কথা কইব? ভগিনী, আমি ভীত নই। ভয়ই সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ—এইই আমার ধর্ম। আমার ধর্মের শিক্ষা।'

রাজপ্রাসাদের কুয়াশা অন্তর্হিত হয়ে গেল।

দেওয়ান নিজেই এসে একদিন বললে, 'কিছু একটা উপহার নিন।'

'কি আশ্চর্য, আমি কি উপহার নেব?'

'আপনার সঙ্গে আমার সেক্রেটারিকে দিয়ে দিচ্ছি, যে কোনো দোকানে গিয়ে যা আপনার ইচ্ছে একটা কিছু কিনে আনুন—'

'যা আমার ইচ্ছে?'

সেক্রেটারি চেক-বই সঙ্গে নিল। যত মোটা টাকাই হোক দিয়ে দেবে অনায়াসে। স্বামীজিকে নিয়ে এ-দোকান ও-দোকান ঘুরতে লাগল। মনিহারি, জামা-কাপড়, বিলাস-প্রসাধন, এমন কি খেলনার দোকান। যা দেখে শিশুর মত তাতেই

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আবার দ্রব্যান্তরে চলে যায়। সব কিছুই সুন্দর, সব কিছুই নয়নহরণ। কিন্তু কিনি কি?

'কিছু একটা কিনুন। কিছুই না কিনলে দেওয়ানজি অসন্তুষ্ট হবেন।' বললে সেক্রেটারি, 'বলবেন আমিই সব ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাইনি আপনাকে।'

কিছু একটা কিনতেই হবে? হাসতে লাগল স্বামীজি।

কি রকম লোক! দোকানভরা জিনিস, পকেটভরা টাকা, তবু কেমন নিশ্চেতন! হেঁটে-হেঁটে ক্লান্ত হয়ে গেলাম তবু কিনা লোকটার সাড়া নেই।

'কিছু একটা কিনতেই হবে, না? একটা চুরুট কিনি।'

চুরুট কিনল স্বামীজি। ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

রাজা জিগগেস করল, 'স্বামীজি, আমি কি আপনার কোনো কাজে আসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পারেন।' বললে স্বামীজি, 'দেশের কাজই আমার কাজ।'

'দেশের কাজ?'

'হ্যাঁ, দেশকে বড় করে তুলুন।' স্বামীজির মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল : 'সম্পদে, সমৃদ্ধিতে, প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে। কৃষি-শিল্প-বিজ্ঞান-বাণিজ্যে। আপনি রাজা, আপনি না করবেন তো কে করবে? কিন্তু সকলের চেয়ে বড় রত্ন মানুষ। মানুষ গড়ে তুলুন।'

মুক্তি? কিসের মুক্তি? ক্ষুধার থেকে মুক্তি, দারিদ্র্যের থেকে মুক্তি, দৌর্বল্যের থেকে মুক্তি। এক হাত যে লাফাতে পারেনা তার কিসের সমুদ্রলঙ্ঘন!

অহিংসা ঠিক, নির্বৈর বড় কথা, বলছেন স্বামীজি, কিন্তু শাস্ত্র বলছে, তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে তাকে দশ চড় যদি ফিরিয়ে না দাও, তুমি পাপ করবে। আততায়ী গুরু হোক ব্রাহ্মণ হোক বহুশ্রুত হোক বিনা বিচারে তাকে হত্যা করবে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য প্রকাশ করো। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড চার নীতি পালন করে পৃথিবী ভোগ করো, তবেই তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরক-ভোগ, পরকালেও নরকভোগ।

সোজা স্বধর্ম করো। অন্যায় কোরো না অত্যাচার কোরো না, আর যথাসাধ্য পরোপকার কোরো। গৃহস্থের পক্ষে অন্যায় সহ্য করাই পাপ, তার প্রতিবিধানে তৎপর হওয়াই পুণ্য। মহোৎসাহে অর্থোপার্জন করে স্ত্রী-পরিজন দশজনকে প্রতিপালন করা, দশটা হিতকর কার্যানুষ্ঠান করাই ধর্ম। এ যদি না করতে পারো তো তুমি কিসের মানুষ। গৃহস্থই হলে না, বলছ কিনা মোক্ষ চাই! নিজেই শুতে পেলে না, ডাকছ কিনা শঙ্করাকে।

ধার্মিকের লক্ষণ কি? ধার্মিকের লক্ষণ নিয়তকর্মশীলতা। যে অনলসভাবে অনবচ্ছিন্ন কর্ম করে সেই ধার্মিক। কার্মিকই ধার্মিক।

ওঁকারধ্যানে সর্বার্থসিদ্ধি। হরিনামে সর্বপাপনাশ। শরণাগতিই সর্বাপ্তি। এ সমস্ত শাস্ত্রবাক্য, সাধুবাক্য সত্য। বলছেন আবার স্বামীজি। কিন্তু দেখতে

পাচ্ছে, লাখো লোক ওঁকার জপে মরছে, হরিনামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিনরাত 'প্রভু যা করেন' বলছে, কিন্তু পাচ্ছে কি? পাচ্ছে—ঘোড়ার ডিম। তার মানে বুঝতে হবে যে কার জপ যথার্থ হয়? কার মুখে হরিনাম বজ্রবৎ অমোঘ? কে যথার্থ শরণ নিতে পারে? যার কর্ম করে করে চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, অর্থাৎ যে ধার্মিক।

কর্ম করতে গেলেই কিছু না কিছু পাপ আসবেই। এলোই বা। উপবাসের চেয়ে আধপেটা ভালো নয়? কিছু না করার চেয়ে—জড়ের চেয়ে ভালোমন্দমিশ্র কর্ম করা ভালো নয়? বলছেন আবার স্বামীজি। গরুতে মিথ্যা কথা হয় না, দেয়ালে চুরি করে না, তবু তারা গরুই থাকে, দেয়াল ছাড়া আর কিছু হয় না। মানুষেই চুরি করে, মিথ্যা কথা কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়। সত্ত্ব-প্রাধান্যে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, পরমধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রজঃপ্রাধান্যে ভালোমন্দ ক্রিয়া করে, তমঃপ্রাধান্যে আবার নিষ্ক্রিয় হয়। এখন বাইরে থেকে, এটা সত্ত্বপ্রধান না তমঃপ্রধান বুঝি কি করে? সুখদুঃখের পার ক্রিয়াহীন শান্তরূপ সত্ত্ব অবস্থায় আমরা আছি, কি প্রাণহীন জড়প্রায় শক্তির অভাবে ক্রিয়াশূন্য মহাতামসিক অবস্থায় পড়ে চুপ করে ধীরে ধীরে পচে যাচ্ছি—এ কথার জবাব দাও। জবাব আর কী দেবে? ফলেন পরিচীয়তে। ফল দেখেই বুঝতে পাচ্ছি বৃক্ষটি তমোবৃক্ষ।

শোনো। সত্ত্বপ্রাধান্যে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয় শান্ত হয়, কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়ত্ব মহাশক্তিকেন্দ্রীভূত হয়ে যায়, সে শান্তি মহাবীর্যের পিতা। সে মহাপুরুষের আর আমাদের মত হাত-পা নেড়ে কাজ করতে হয় না, তাঁর ইচ্ছামাত্রে অবলীলাক্রমে সব কার্য সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই পুরুষই সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণ, সর্বলোকপূজ্য। তাঁকে কি আর 'পূজা কর' বলে পাড়ায়-পাড়ায় কেঁদে বেড়াতে হয়? জগদম্বা তার কপালফলকে নিজের হাতে লিখে দেন যে এই মহাপুরুষকে সকলে পূজা কর আর জগৎ তাই অবনত মস্তকে শোনে। সেই মহাপুরুষই অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। সেই অনপেক্ষ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ। সেই তুল্যনিন্দা-স্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেনকেনচিৎ।

কিন্তু ঐ যে মিনমিনে পিনপিনে ঢোক গিলে কথা কয়, ছেঁড়ান্যাতা, সাত দিন উপবাসীর মত সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না, স্বামীজি জ্বলে উঠলেন, ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, পচা দুর্গন্ধ। অর্জুন ঐ দলে পড়েছিলেন বলেই তো ভগবান এত করে বোঝাচ্ছেন না গীতায়? প্রথম ভগবানের মুখ থেকে কি কথা বেরুল দেখ—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'—ক্লীবের ভাব, তমের ভাব প্রাপ্ত হয়ো না, তারপর শেষে আবার বললেন, 'তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ, যশো লভস্ব, জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্'—যুদ্ধার্থ উত্থিত হও, শত্রু জয় করে যশস্বী হও, নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ কর। ঐ জৈন-বৌদ্ধদের পাল্লায় পড়ে আমরা ঐ তমোগুণের দলে পড়েছি—দেশশুদ্ধ পড়ে-পড়ে কতই হরি বলছি, ভগবানকে ডাকছি, ভগবান শুনছেনই না আজ হাজার বছর। শুনবেনই বা কেন? আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না—তা ভগবান! এখন উপায় হচ্ছে ঐ ভগবদ্বাক্য শোনা, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' আর 'তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব।'

'স্বামীজি, আপনার এই প্রাণোচ্ছল কণ্ঠস্বরের একটা রেকর্ড করে রাখতে চাই।' রাজা পিড়াপিড়ি করতে লাগল।

সহাস্যে রাজি হল স্বামীজি।

রেকর্ড তোলা হল।

মহীশূরের রাজপ্রাসাদের সে রেকর্ড অস্পষ্ট হয়ে এসেছে এত দিনে, কিন্তু স্বামীজির সমস্ত উপস্থিতিই তো 'তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ' এই উদার-উজ্জ্বল শঙ্খনাদ।

বিদায় নেবার দিন ঘনিয়ে এল।

রাজা বললেন, 'আমি আপনার পা পুজো করব।'

লাফিয়ে উঠল স্বামীজি। অসম্ভব। শত অনুনয়ে-অনুরোধেও টললনা এক পা।

'তবে যাবার আগে কিছু একটা উপহার নিন।'

'উপহার? কি উপহার নেব?'

'যা আপনার খুশি। যে কোনো জিনিস।'

স্বামীজি হাসল। বললে, 'যদি নিতান্তই দিতে চান একটি থেলো হুঁকো দিন।'

'সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিই? অন্তত রুপো দিয়ে?'

'না, কোনো ধাতুস্পর্শ না থাকে। এমনিই সাদাসিদে একটি হুঁকো।'

একতাড়া নোট নিয়ে এল দেওয়ান, হাতের মধ্যে গুঁজে দিতে চাইল।

'টাকা? এত টাকা নিয়ে কি হবে? তবে হ্যাঁ, কোচিনের একখানা টিকিট কিনে দাও। রামেশ্বরের পথে কোচিনে ক'দিন থেকে যাব ভাবছি।'

কোচিন থেকে ত্রিবান্দ্রমে এসেছে স্বামীজি। সঙ্গে একটি মুসলমান অনুচর। এসে উঠেছে প্রফেসর সুন্দররমনের বাড়িতে।

'কি খাবেন?'

'আমার জন্যে ভাববেন না।' বললে স্বামীজি, 'আগে এর খাবার ব্যবস্থা করুন।' বলে অনুচরের দিকে ইঙ্গিত করল।

'না, না, আমার জন্যে নয়।' অনুচর ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠল : 'স্বামীজি দুদিন শুধু দুধ খেয়ে আছেন—'

'আছি তো আছি। কিন্তু আগে আমার এই বন্ধুর ব্যবস্থা না হলে আমি নেবনা আতিথ্য।'

'কিন্তু এ তো মুসলমান।' সুন্দররমন কুণ্ঠিতের মত বললে।

'জানিনা। শুধু এইটুকু জানি আমার সহচর, আমার বন্ধু। কোচিন সরকারের একজন পিওন। আমাকে এখানে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে আমার সঙ্গে এসেছে।' স্বামীজির হাত বন্ধুতায় প্রসারিত হল পিওনের দিকে : 'ওকে সম্বল করেই আমি এখানে চলে এসেছি। কারু কোনো পরিচয়পত্র নিয়ে আসিনি। বললাম, কোনো প্রফেসারের বাড়ি নিয়ে চল। ও আপনার এখানে নিয়ে এসেছে। আমি যদি আপনার অতিথি ও-ও আপনার অতিথি। ওকে দয়া করে হোটেল দেখিয়ে দেবেন না।'

অগত্যা পিওনের আপ্যায়ন হল সর্বাগ্রে।

'কি দেব আপনাকে খেতে?' প্রশ্ন করল সুন্দররমন।

'যা দেবেন তাই খাব। যা জোটে তাতেই আমি আনন্দিত। যদি কিছু না জোটে তাতেও।'

দুদিন পরে পেট ভরে খেল স্বামীজি।

সন্ধ্যায় সুন্দররমন স্বামীজিকে ক্লাবে নিয়ে গেল। নারায়ণ মেনন ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান-পেশকার। কিন্তু জাতে শূদ্র। আরো একজন দেওয়ান-পেশকার এসেছে ক্লাবে, কিন্তু সে ব্রাহ্মণ। ক্লাব থেকে বিদায় নেবার সময় নারায়ণ সেই ব্রাহ্মণ-পেশকারকে করজোড়ে নমস্কার করল, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পেশকার করজোড়ে সেই নমস্কার ফিরিয়ে দিলনা। শূদ্রকে প্রত্যভিবাদনের রীতি হচ্ছে ডান হাতটা বাঁ হাতের থেকে কিছুটা উপরে তুলে ধরা। তেমনি একটা ভঙ্গি করল ব্রাহ্মণ।

স্বামীজির চোখে পড়ল।

ক্লাব ভেঙে যাবার মুহূর্তে ব্রাহ্মণ-পেশকার করজোড়ে নমস্কার করল স্বামীজিকে।

স্বামীজি শুধু বললে, নারায়ণ।

রেগে উঠল ব্রাহ্মণ। বললে, 'নমস্কার ফিরিয়ে দিতে জানেন না এ কোন দিশি শিষ্টাচার?'

স্বামীজি শান্তস্বরে বললে, 'নমস্কারের বিনিময়ে নারায়ণ-উচ্চারণই সন্ন্যাসীর রীতি। আপনি যদি আপনার রীতিনীতি ছাড়তে না পারেন সন্ন্যাসীই বা ছাড়বে কেন?'

'আমার রীতিনীতি?'

'হ্যাঁ, শূদ্রের বেলায় নমস্কারে তাকে সম্মানিত করেননি আপনি, হৃদয়হীন শুষ্ক রীতিকেই আঁকড়ে ছিলেন। তবু তো আমি নারায়ণ বলেছি। আপনার মধ্যেও স্বীকার করে নিয়েছি নারায়ণের অস্তিত্ব।'

৪০

সুন্দররমনের বাড়িতে, খাবারের ডাক পড়েছে, স্বামীজি নেই। কোথায় গেলেন এমন সময়? যারা খোঁজ করতে বেরিয়েছিল ফিরে এসে বললে সরকারী অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল মন্মথ ভটচাজের বাড়ি গিয়েছেন। বলে দিয়েছেন ওখানেই খাবেন এ বেলা।

মন্মথ ভটচাজ তো মাদ্রাজে। সে এখানে এল কি করে?

ত্রিবান্দ্রমে রেসিডেন্টের ট্রেজারিতে তবিল-তছরূপ হয়েছে। তার তদন্তে এসেছে মন্মথ। শহরে কোথায় বাসা নিয়েছে।

বিকেলে সেই বাসায় সুন্দররমন এসে হাজির। স্বামীজিকে পাকড়াও করে

বললে অভিমানের সুরে, 'এ কি, আপনি এখানে চলে এলেন কি রকম?'

'ভাই, অপরাধ নিও না,' স্নিগ্ধসহাস্যমুখে বললে স্বামীজি, 'কত দিন মাছ-মাংস খাইনি। তোমাদের দেশে, দক্ষিণ-ভারতে এসে অবধি এই আমিষের দুর্ভিক্ষ। মন্মথ আমার বন্ধু, সহপাঠী, তার খবর পেয়ে মাছ-মাংসের লোভে ছুটে এসেছি।'

মাছ-মাংস? সুন্দররমন নাক সিঁটকালো।

ভাই, কাকে ঘৃণা করছ, এবং কেন? পুরাকালে ব্রাহ্মণেরা রীতিমত মাংস খেতেন, তাঁদের যজ্ঞে অন্যান্য পশুবধ তো হতই, এমনকি গোবধ পর্যন্ত হত। অতিথিকে মধুপর্ক দেবার বেলায়ও তাই। মাছ-মাংস না খেয়েই আমাদের এই শারীরিক দৌর্বল্য। যদি ক্ষাত্রতেজ আনতে চাও তো মাংসাশী হও।

'তোমরা মাংসাহারী ক্ষত্রিয়ের কথা বলছ।' চিঠি লিখছেন স্বামীজি: 'ক্ষত্রিয়েরা মাংস খাক আর নাই খাক, তারাই হিন্দুধর্মের ভিতর যা কিছু মহৎ ও সুন্দর জিনিস রয়েছে তার জন্মদাতা। উপনিষদ লিখেছিলেন কারা? রাম কি ছিলেন? কৃষ্ণ কি ছিলেন? বুদ্ধ কি ছিলেন? জৈনদের তীর্থঙ্করেরা কি ছিলেন? যখনই ক্ষত্রিয়েরা ধর্ম উপদেশ দিয়েছেন, তাঁরা জাতিবর্ণনির্বিশেষে সব্বাইকে ধর্মের অধিকার দিয়েছেন; আর যখনই ব্রাহ্মণেরা কিছু লিখেছেন তাঁরা অপরকে সকল রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। গীতায় সকল নর-নারী, সকল জাতি, সকল বর্ণের জন্যে পথ উন্মুক্ত রয়েছে; আর ব্যাস গরিব শূদ্রদের বঞ্চিত করবার জন্যে বেদের স্বকপোলকল্পিত মানে করছেন। ঈশ্বর কি তোমাদের মত আহাম্মক, তিনি কি এতই ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যান যে এক টুকরো মাংসে তাঁর দয়া-নদীতে চড়া পড়ে যাবে? যদি তিনি সেই রকম হন, তবে তাঁর মূল্য এককড়া কানাকড়িও নয়।'

কিন্তু আবার লিখছেন অখণ্ডানন্দকে : 'বসে-বসে রাজভোগ খাওয়ায় আর 'হে প্রভু রামকৃষ্ণ' বলায় কোনো ফল নেই, যদি কিছু গরিবদের উপকার করতে না পারো। গ্রামে গ্রামে যাও, উপদেশ করো, বিদ্যাশিক্ষা দাও। কর্ম, উপাসনা আর জ্ঞান—এই তিন কর্ম করো, তবেই চিত্তশুদ্ধি হবে, নতুবা ভস্মে ঘৃত ঢালার মত সব নিষ্ফল। রাজপুতানার গ্রামে-গ্রামে গরিব দরিদ্রদের ঘরে-ঘরে ফের। যদি মাংস খেলে লোকে বিরক্ত হয়, তদ্দণ্ডেই মাংস ত্যাগ করবে। পরোপকারার্থে ঘাস খেয়ে জীবনধারণ করা ভালো।'

বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় আর বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গেই মাংস খাওয়া উঠে যেতে লাগল দেশ থেকে। স্বামীজি বললে, এই উঠে যাওয়ার দরুনই প্রাচীন হিন্দু-রাজ্যের পতন ঘটতে সুরু করল। যদি হিন্দু জাতটাকে খাড়া হয়ে উঠতে হয়, পাল্লা দিতে হয় জগতের আর সব জাতের সঙ্গে, তাহলে তাদের নিরামিষ খাওয়া ছাড়তে হবে।

সুন্দররমন কিছুতেই মানতে চায়না। বললে, বুদ্ধের বাণী অহিংসার বাণী—

বুদ্ধের কথা উঠতেই বিহ্বল হল স্বামীজি। বললে, 'আমি একমাত্র কর্ম বুঝি। সে কর্ম পরোপকার। বাকি সমস্ত কুকর্ম। তাই তো আমি শ্রীবুদ্ধের পদানত।'

ঈশ্বরে বা আত্মায় বিশ্বাসী নন বুদ্ধ, কিন্তু একটা ছাগশিশুর জন্যে তিনি অকাতরে প্রাণ দিতে পারেন। নিজের মুক্তির জন্যে ধ্যান করতে বসে যাননি, সকলের মুক্তির জন্যে গিয়েছেন। আর এই তত্ত্ব লাভ করে এসেছেন—মানুষ নিজেই নিজের উদ্ধারকর্তা।

প্রাদেশিক কথ্য ভাষায়, পালিতে, উপদেশ দিয়েছেন বুদ্ধ। তাঁর ব্রাহ্মণ শিষ্যরা বললে, আপনার কথাগুলি সংস্কৃতে অনুবাদ করে রাখি।

বাধা দিলেন বুদ্ধ। বললেন, 'আমি গরিবদের জন্যে, নিরক্ষরদের জন্যে, আপামর সর্বসাধারণের জন্যে। আমাকে জনগণের ভাষায় কথা বলতে দাও।'

আকাশবৎ অনাদি অনন্ত বোধির নামই বুদ্ধ। আমি গৌতম, লাভ করেছি সেই বুদ্ধাবস্থা। সাধনার দ্বারা তোমরাও এই বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারো। এই বুদ্ধের চরম কথা।

নাস্তিক ছিলেন কি আস্তিক ছিলেন তাতে কিছুই যায় আসে না। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেনা, যার কোনো দার্শনিক মতবাদ নেই, যে কোনো মন্দিরে বা গির্জায় যায় না, যে নিছক জড়বাদী সেও এই মহাবোধির পরাপ্রজ্ঞার অধিকারী হতে পারে। এই বুদ্ধের পরমবাণী।

'যদি বুদ্ধ-হৃদয়ের এককণাও আমার থাকত!' স্বামীজি বললে গদগদ হয়ে।

সুন্দররমন বললে, 'আপনার একটা বক্তৃতার ব্যবস্থা করি—'

'ওরে বাবা! ভাবতেও গা কাঁপছে।' ত্রস্ত মুখে বললে স্বামীজি, 'কোনো-দিন দিইনি বক্তৃতা।'

'একদিন দিন। লোকে শুনতে চায় আপনার কথা।'

'শেষকালে কথা বেরুবেনা, আমতা-আমতা করব, ঢোঁক গিলব, মাথা চুলকোব—যারা শুনতে চেয়েছিল তারাই বসে পড়তে বলবে। জনতাকে আমার ভীষণ ভয়।'

'তাহলে শিকাগোর ধর্মসভায় যাবেন কি করে?'

'যাব নাকি?'

'মহীশুরের মহারাজা যাবার সব ব্যবস্থা করে দেবেন বলে শুনেছি। কিন্তু সে তো বিদেশ, জনতার ভাষা বিদেশী। সেখানে তাদের সামনে দাঁড়াবেন কি করে?'

মুখমণ্ডল ভাস্বর হয়ে উঠল স্বামীজির। বললে, 'ঈশ্বর যদি আমার হাত ধরে আমাকে সেখানে নিয়ে যান ও আমাকে দিয়ে কিছু বলাতে চান, তাহলে আমি নিশ্চয়ই তাঁর হাতের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে উঠব। যদি আমাকে তিনি তার পতাকা দেন, তিনি নিশ্চয়ই তা বহন করবার শক্তিও দেবেন।'

সুন্দররমন মুখ ফেরাল। ভাবখানা এই, টিকিট কেটে জাহাজে চেপে শিকাগোতে গেলাম, সভামণ্ডে গিয়ে দাঁড়ালাম নিমন্ত্রিত হয়ে, আর যে আমি কোনোদিন কোনো বক্তৃতা দিইনি, ভিড়ের থেকে শুধু আত্মগোপন করে এসেছি, আমার মুখ থেকে তক্ষুনি-তক্ষুনি অনর্গল বাক্যস্ফূর্তি হতে লাগল—এ কখনো হয়?

'হয়।' বজ্রনাদ করে উঠল স্বামীজি : 'মূকও বাচাল হয়। মাটির যে স্তূপ সেও অগ্নিবর্ষণ করে। যিনি অনন্ত শক্তিমান তাঁকে তুমি তোমার দাঁড়িপাল্লায় মাপবে? স্থানে-কালে যাঁর অবধি নেই তাঁকে মাপবে তোমার ফুট-গজ দিয়ে? তিনি যাকে ডাকেন হাত ধরে তাকে তিনি শুধু সাধক করেননা, অসাধ্যসাধক করেন।'

সভামঞ্চে না হোক সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলতে দোষ কি।

বঙ্কিশবর শাস্ত্রী সুন্দররমনের ছেলেকে সংস্কৃত পড়ান। হেন শাস্ত্র-ব্যাকরণ নেই যা নয় তাঁর নখাগ্রে। কদিন ধরে আসতে পারছেন না পড়াতে। শুনেছেন উত্তর-ভারতের কে এক মহাপণ্ডিত সাধু সুন্দররমনের বাড়িতে অতিথি, এ যাত্রায় আলাপ হলনা বোধহয়। একবার পরীক্ষা করে দেখা হলনা তার ব্যুৎপত্তি। সেই দুঃখেই মরমে মরে আছেন।

কত না জানি পাণ্ডিতি করে নিচ্ছে লোকটা। জারিজুরি কেউ বোধহয় ধরতে পারলনা। একবার দেখা হয়না কোনোরকমে?

না, পেয়েছেন সুযোগ।

সুন্দররমনের বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে স্বামীজি, নামছে সিঁড়ি দিয়ে, বঙ্কিশবরের সঙ্গে দেখা। সুন্দররমন আলাপ করিয়ে দিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতেই সংস্কৃতে কি একটা দুরূহ প্রশ্ন জিগগেস করলেন বঙ্কিশবর। স্বামীজি হাসল। সংস্কৃতে উত্তর দিলে।

আবার একটা প্রশ্ন। আবার উত্তর।

এমনি চলল প্রায় দশমিনিট।

'এবার আমি প্রশ্ন করি?'

বঙ্কিশবর বঙ্কিতের মত মুখ করে রইলেন। তাঁর সমস্ত অহঙ্কার হরণ করে নিয়েছে স্বামীজি।

সুন্দররমনকে বললে, 'শুধু ব্যাকরণে নয় ভাষাজ্ঞানেও এই সাধু অসাধারণ। এঁকে ছেড়ে দিলেন কেন?'

একে কে বাঁধে।

গিরিশ ঘোষ বলত, মহামায়া দড়ি দিয়ে দুজনকে বাঁধতে চেয়েছিলেন, এক স্বামীজি আরেক নাগমশাই। দুজন দু উপায়ে বাঁধন কাটালে। দড়ির যা দৈর্ঘ্য তার চেয়েও স্বামীজির আয়তন বড়, যত দড়ি জোড়েন মহামায়া ততই বেশি ফুলতে থাকে স্বামীজি, দড়িতে আর কুলোলনা শেষ পর্যন্ত। আর নাগমশাই? নাগমশাই কেবল ছোট হয়। ক্ষুদ্রের সঙ্গে দড়ি কি করে পারবে? গ্রন্থির ছিদ্রের মধ্য দিয়ে পালিয়ে গেল দুর্গাচরণ।

একজন বেরিয়ে গেল জ্ঞানে, বীর্যে; আরেকজন বেরিয়ে গেল ভক্তিতে, দীনতায়।

দাক্ষিণাত্যের বারাণসী, রামেশ্বরে এসে পৌঁছুল স্বামীজি। লঙ্কাজয়ের পর দেশে ফেরবার মুখে সেতু পার হয়ে এসে এইখানেই প্রথম শিবপূজা করেন রামচন্দ্র। এই সেই কর্পূরগৌরধবল দারিদ্র্যদুঃখদহন শিব। এই সেই

সংসাররোগহর অনঘ পুরুষ।

ভারতবর্ষের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে কন্যাকুমারীর মন্দিরের শেষ প্রস্তরটুকুতে এসে বসল স্বামীজি। ধ্যাননেত্রে দিব্যদর্শন হল। জগন্মাতাকে সাক্ষাৎ করল দেশ-মাতারূপে।

রুক্ষকেশী চীরবাসা ধূলিধূসরিতা ম্লানমূর্তি। শৃঙ্খলবদ্ধা।

এ শৃঙ্খল দাসত্বের নয় দারিদ্র্যের।

'দারিদ্র্যমোচনের ব্রত নাও সকলে।' স্বামীজি আহ্বান করল : 'আমি জানি ভগবান সাহায্য করবেন। আমি এদেশে অনাহারে বা শীতে মরতে পারি, কিন্তু তোমাদের কাছে গরিব, অজ্ঞ, অত্যাচারপীড়িতদের জন্যে এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করছি। যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করতে সঙ্কুচিত হননি, যিনি তাঁর বুদ্ধাবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে এক অধমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাকে উদ্ধার করেছিলেন—যাও, তাঁর কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে পড়ে যাও, এবং তাঁকে এক মহাবলি প্রদান কর—বলি, জীবন-বলি, তাদের জন্যে, যাদের জন্যে তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন, যাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালোবাসেন, সেই দীনদরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্যে। তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্যে ব্রত গ্রহণ করো—যারা দিন দিন ডুবছে।'

লণ্ডন ছাড়বার আগে মিস্টার সেভিয়ারকে বলছেন বিবেকানন্দ : 'আমার একমাত্র ধ্যান ভারতবর্ষ। আমার মন শুধু ভারতের দিকে ধাবমান।'

'প্রায় চার বছর কাটালেন পশ্চিমে,' বললে সেভিয়ার, 'কাটালেন বীর্যবান ও সমৃদ্ধিমান সভ্যতার সঙ্গে, এখন কি আর নিজের দেশকে ভালো লাগবে? পদানত পরাধীন দেশ!'

'বলো কি।' গর্জে উঠলেন বিবেকানন্দ : 'যখন ছেড়ে আসি তখন সমস্ত দেশটাকেই ভালোবাসতাম একটা অনবচ্ছিন্ন ভাবমূর্তিরূপে, এখন আমার দেশের প্রতিটি ধূলিকণাকে ভালোবাসছি।'

আর ঈশ্বর?

ঈশ্বর এমন একটি বৃত্তের কেন্দ্র যার পরিধি কোথাও শেষ হয়নি আর যার কেন্দ্র সর্বত্র। যে কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে সে বৃত্ত আঁকো সে বৃত্তের বেষ্টনী-রেখা খুঁজে পাবে না। আর যেখানেই কেন্দ্র নির্ধারণ করোনা সেইটিই সমানভাবে অনন্ত বৃত্ত নির্মাণ করবে। আমাদের ব্যক্তিসত্তাকে কেন্দ্র করো বিশ্বসত্তার বৃত্ত তৈরি হবে, আর তুমি জানতেও পারবেনা কোথায় তার সীমান্ত!

স্বামীজি বলছেন, ধরো পৃথিবী থেকে সূর্যের একটা ফোটোগ্রাফ নেওয়া হল। ধরো, আমরা সূর্যের দিকে এগুচ্ছি, বহু সহস্র মাইল এগিয়ে আবার একটা নেওয়া হল ফোটোগ্রাফ। দেখা গেল, যা আগে দেখা গিয়েছিল সূর্য তারও চেয়ে বৃহৎ। যাত্রাপথে বারেবারে ছবি নিচ্ছি, প্রতিবারেই বৃহত্তর প্রতিমূর্তি। যাত্রায় আমি যত

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

বৃহৎ হব, উপস্থিতিতে সে ততই বৃহত্তর হবে।

কিন্তু যাত্রা আমি ছাড়বনা। আমি জানি আমি এগোচ্ছি বলেই তাকে বৃহত্তর বলে দেখতে পাচ্ছি। শুধু চলাতেই এই বৃহত্তরের উপলব্ধি।

আর কিছু করতে না পারো, চলো, পথ ভাঙো। না চললে বুঝবে কি করে পথ দীর্ঘ, বুঝবে কি করে তুমি পথিক হবার উপযুক্ত। যতই ক্লেশকণ্টকবন্ধুর হোক, তোমার উপযুক্ততার উপলব্ধির মত আনন্দ আর কি আছে!'

'আমার যদি একটি ছেলে থাকত,' স্বামীজি বলছেন, 'তবে সে ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র আমি তাকে বলতে সুরু করতাম, ত্বমসি নিরঞ্জনঃ। পুরাণে মদালসার কাহিনী পড়োনি? তাঁর পুত্র হওয়ামাত্র তিনি তাকে দোলনায় শুইয়ে নিজ হাতে দোল দিতে-দিতে গান গাইতে লাগলেন, ত্বমসি নিরঞ্জনঃ। নিজেকে মহান বলে ভাবো, মহান হয়ে যাবে। নিরঞ্জন বলে ভাবো নিরঞ্জন হয়ে যাবে। কিন্তু ভাববে কি করে? ভাবনার সে বীর্য কই? কই সেই মাংসপেশী?'

আসলে কি জানো? শারীরিক দৌর্বল্যই সকল অনিষ্টের মূল। আবার বলছেন স্বামীজি: তোমাদের জ্ঞানের কি কোনো কমতি আছে? ওরে বাবা, তোমাদের জ্ঞান যে অতিরিক্ত। যতটা জানলে কল্যাণ তোমরা তার চেয়ে বেশি জেনে ফেলেছ এই হয়েছে মুশকিল। আসলে অনিষ্টের মূল কারণ, আর কিছু নয়, তোমরা দুর্বল। তোমাদের শরীর দুর্বল, মন দুর্বল, আত্মবিশ্বাস দুর্বল। শত শত বছর ধরে অভিজাত আর রাজা আর বৈদেশিকদের দল তোমাদের নিপীড়ন করে পিষে ফেলেছে। তোমাদের স্বজনরাই কেড়ে নিয়েছে তোমাদের বলবুদ্ধি, মেরুদণ্ডহীন কীট করে ছেড়েছে। কে আর তোমাদের বল দেবে যদি নিজে একবার না ওঠো না জাগো, যদি নিজে একবার না মুষ্টিবদ্ধ করে করাঘাত করো।

বীর্য লাভের উপায় কি?

বীর্য লাভের উপায় বেদান্তে বিশ্বাস। আমিই সেই, এই জ্বলন্ত সিংহাসনে আরূঢ় হওয়া। আমাকে তরবারি ছিন্ন করতে পারেনা, শর আমাকে বিদ্ধ করতে পারেনা, প্রস্তর আমাকে দীর্ণ করতে পারেনা, অগ্নি আমাকে দগ্ধ করতে পারেনা, বায়ু আমাকে শুষ্ক করতে পারেনা। আমিই সেই সর্বশক্তিমান, সর্বাত্মা। বারে-বারে এই আশাপ্রদ পরিত্রাণপ্রদ বাক্যগুলি উচ্চারণ করো। 'বোলোনা আমরা দুর্বল। বলো আমরা সর্বার্থসাধক, অসাধ্যসাধক। নচিকেতার মত বিশ্বাসী হও। নচিকেতার পিতা যখন যজ্ঞ করছিলেন তখন তার মধ্যে শ্রদ্ধা প্রবেশ করল। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই শ্রদ্ধা আবির্ভূত হোক। বীরদর্পে দণ্ডায়মান হও। সর্বপ্রকারে অনন্ত ঈশ্বরতুল্য হও। ঈশ্বরায়িত হও। উপনিষদই দেবে তোমাদের সেই অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য। ইঙ্গিতে জগৎ-চালক মহামনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষ হও।

দেহচৈতন্যের ঊর্ধ্বে ব্রহ্মচৈতন্যে অবস্থিত হও। সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমাপ্নুতে। অথবা আত্মচৈতন্যে। সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। কিম্বা ভাগবতচৈতন্যে। যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি। সেই অবস্থিতিই অমৃতত্ব।

সুখেদুঃখে যার সমভাব সেই এই অমৃতত্বের অধিকারী।

তাড়িঘাট জংশনে নেমেছে স্বামীজি। প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন, অগ্নিস্পর্শ বালির ঝড় বইছে। প্রতপ্ত মরুভূমির নিশ্বাস।

শুধু একটি কম্বল সম্বল, প্ল্যাটফর্মের ছায়ায় বসতে চাইল স্বামীজি। পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, এ কে ছন্নছাড়া বাজে লোক, চৌকিদার টিকিট দেখতে চাইল। থার্ড ক্লাশের টিকিট দেখাল স্বামীজি। কেন কে জানে চৌকিদার তাড়া করল। চোরছ্যাঁচড় হবে হয়তো, কে জানে কোথা থেকে একটা টিকিট কুড়িয়ে নিয়ে হয়তো সাধু সেজেছে।

প্ল্যাটফর্মের বাইরে কম্বল পাতল স্বামীজি। একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসল নিশ্চিন্তে।

যদি এক গ্লাশ ঠাণ্ডা জল খেতে পেতো। হায়, সঙ্গে একটি সামান্য কুঁজোও তার নেই। কুঁজো সামান্য কিন্তু তার মধ্যে যদি জলভরা থাকে, পিপাসার সময় তবে তা অমৃতশ্রাবণ।

মনে পড়ল লাটুর কথা। কাশীপুরে থাকতে একবার তার খেয়াল হল নরেনকে লেকচার দিতে হবে। লাটু বললে, 'দ্যাখ ভাই লোরেন, কিশুব বাবু টাউন হোলে কিমন লিকচার কোরে। তুই ভাই ইমন লিকচার করবি আর আমি তোর জন্যে এক কুজু জোল নিয়ে বোসে থাকব।'

যদি এখন লাটু এক কুঁজো জল নিয়ে বসে, তবে নিশ্চয় স্বামীজি এখুনি এই ক্লান্ত দেহে শুষ্ক কণ্ঠে বক্তৃতা দেয়। হাততালি পাবার লোভে নয়, লাটুর কুঁজোর একটুকু জল খাবার প্রত্যাশায়।

নিদারুণ পিপাসা পেয়েছে। ক্ষুধার চেয়েও পিপাসা গুরুতর। মনে হচ্ছে দেহের রক্তও যেন তপ্তবালু, এতটুকু তাতে জলকণিকা নেই।

সমস্ত রাস্তা ঐ লোকটা জ্বালিয়েছে স্বামীজিকে, পশ্চিমা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, ব্যবসায়ী বেনে। স্টেশনে যখনই গাড়ি থেমেছে, পানিপাঁড়েদের কাছে জল চেয়েছে স্বামীজি। পয়সা? পয়সা কিসের? পয়সা ছাড়াই তো জল দেবে। বয়ে গেছে, ঐ দেখ, পয়সা দিচ্ছে কেউ-কেউ। যারা পয়সা দিচ্ছে তাদেরকেই জল দেব।

স্বামীজির কাছে একটাও পয়সা নেই।

ঐ বেনে ভদ্রলোক একই ক্লাশে যাচ্ছে একই কামরায়। নিচু ক্লাশে যাচ্ছে বটে কিন্তু ট্যাঁক উঁচু। পয়সা দিয়ে লোটা-ভরতি জল যোগাড় করছে আর স্বামীজির দিকে তাকিয়ে মুচকে-মুচকে হাসছে। এক আঁজলা জল দেওয়া দূরের কথা, পরন্তু বলছে বিদ্রূপ করে অবজ্ঞা মিশিয়ে, 'কি হে সাধু, এমনই ত্যাগ করেছ একটি পয়সাও নেই যে জল কিনে খাও। আঃ, কি ঠাণ্ডা জল! ভগবানের এমন জিনিস তাও হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় না। শ্রম করে পয়সা রোজগার করে তবে তা কিনতে হয়। যদি এরকম সর্বত্যাগী সাধু না সেজে আমার মত, আর পাঁচজনের মত, শ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটা-খাটনি করে পয়সা রোজগারের চেষ্টা করতে, তা হলে আজ আর এ দুর্দশা ভোগ করতে হত না।'

সেই বেনেও নেমেছে এই স্টেশনে। বসেছে প্ল্যাটফর্মের ছাউনিতে। স্বামীজির দিকে চোখ রেখে।

পুঁটলি খুলে একরাজ্যের খাবার বের করেছে সেই বেনে। ধারে-পারে কোথায় জল আছে কে জানে, তাই ধরে এনেছে লোটায় করে।

স্বামীজির দিকে তাকিয়ে সেই বেনে শ্লেষভরে বলছে, 'কি হে, একবার এদিকে একটু মুখ ফেরাও। পয়সার ক্ষমতাটা দেখ। পুরি কচুরি পেঁড়া রাবড়ির স্তূপটা দেখ। চারদিকে জলের এত টানাটানি, তবু, দেখ, পয়সার জোরে তাও যোগাড় হয়েছে এক লোটা। আর তোমার? ঠনঠন।'

স্বামীজি স্তব্ধ হয়ে রইল। শান্ত হয়ে রইল।

'বাবাজি, আপনি এই রৌদ্রে কেন বসে আছেন? ছাউনির ভিতরে চলুন, সেখানে বিশ্রাম করবেন।'

'কে?' চোখ মেলল স্বামীজি।

দেখল কে-একজন অপরিচিত হিন্দুস্থানী লোক সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার ডানহাতে একটা পুঁটলি আর লোটা আর বাঁ হাতে এক কুঁজো জল ও বগলের নিচে একটা ভাঁজ-করা শতরঞ্চি।

'কে তুমি?' খাড়া হয়ে বসল স্বামীজি।

'আমি আপনার জন্যে খাবার আর জল নিয়ে এসেছি।'

'আমার জন্যে? না। তোমার ভুল হয়েছে।' স্বামীজি আবার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসল। চোখ নিমীলিত হল।

'না বাবাজি, আমার ভুল হয়নি। কাছেই আমার এক পুরি-মেঠায়ের দোকান, আমি একজন হালুইকর।' বলতে লাগল সেই হিন্দুস্থানী। 'খেয়েদেয়ে ঘুমুচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখলাম এক সন্ন্যাসী এসে আমাকে বলছেন, আমার সাধু স্টেশনের হাতায় ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ে আছে, কাল থেকে তার পানাহার নেই। তুই শিগগির গিয়ে তার সেবা কর। ঘুম ভাঙতে মনে হল কি না কি স্বপ্ন দেখলাম, যত সব আজগুবি বাজে খেয়াল। আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লাম। বলব কি মহারাজ, আবার সেই স্বপ্ন। সেই সন্ন্যাসী এসে তর্জন করে উঠল, কি রে গেলিনা এখনো? আমার সাধুকে আর কত কষ্ট দিবি? আবার খেয়াল ভেবে পাশ ফিরলাম। যেই আবার তন্দ্রার একটু ঘোর লেগেছে সেই সন্ন্যাসী আবার এসে উপস্থিত। এবার আর তর্জন-তিরস্কার নয়, আমার হাত ধরে টেনে তুলে দিল সেই সন্ন্যাসী। তাই তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি স্টেশনে, এই সামান্য কিছু খাবার আর জল নিয়ে। আপনি আসুন।'

'তোমার ভুল হয়েছে। দেখ তোমার সেই সন্ন্যাসীর সাধু অন্যত্র কোথাও হয়তো অপেক্ষা করছেন।'

'আমি দেখেছি।' সেই হালুইকর বললে জোড় করে, 'সমস্ত স্টেশনে আপনি ছাড়া আর কেউ সাধু নেই।'

সেই বেনে ভদ্রলোকের সামনেই শতরঞ্চি পেতে স্বামীজিকে বসাল হালুইকর।

মেঠাই-মণ্ডার স্তূপ মেলে ধরল। পাশে বসে খাওয়াতে লাগল। কুঁজো থেকে লোটার পর লোটা জল ঢেলে দিতে লাগল।

বেনের তো চক্ষুস্থির।

শুধু তাই? খাওয়া-দাওয়ার পর সেই হালুইকর স্বামীজিকে পান খাওয়াল, তামাক সেজে দিল। শতরঞ্চির পুঁটলির মধ্যে হুঁকো কলকে নিয়ে এসেছে হালুইকর।

'কে হে এই সাধু?' হালুইকরকে জিগগেস করল বেনে।

'জানিনা। শুধু এইটুকু বলতে পারি এমন একজন লোক যার কাছে কোন এক শক্তি তিন-তিনবারের ধাক্কায় আমাকে ঠেলে এনেছে।'

বেনে তখন যুক্তকরে বসল স্বামীজির পা ঘেঁসে।

৪১

সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ছবি, আরেকখানি গীতা। এই স্বামীজির ইহজীবনের সম্বল।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি। সর্বাধিবাস বাসুদেব। যিনি সমস্ত বিশ্ব আচ্ছাদন করে আছেন, সর্বভূতে যাঁর বসতি, তিনিই বাসুদেব। লীলাবশে ব্যক্তস্বরূপে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ।

তিনিই গতি, তিনিই ভর্তা, তিনিই প্রভু, তিনিই সাক্ষী। নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। তিনিই বাসস্থান, তিনিই রক্ষাকর্তা, তিনিই বান্ধবস্বরূপ। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই সংহর্তা, তিনিই আধার, তিনিই নিধান। তিনিই অব্যয়বীজ, অবিনাশী কারণ।

মেথরদের সঙ্গে আছে স্বামীজি। ছিন্ন কাঁথার নিচেই রয়েছে উত্তপ্ত জীবন, পথের ধুলোর মধ্যেই ধনরত্ন। হাজা-মজা সংস্কার করে পূর্ণ ফসল, পুণ্য ফসলের আবাদ করো।

'পরোপকারই এই সার্বজনীন মহাব্রত।' ব্রহ্মানন্দকে লিখছে স্বামীজি, 'শুধু নেগেটিভ ধর্মে কিছু হবেনা। পাথরে অন্যায় করে না, গরুতে মিথ্যা কথা কয়না, বৃক্ষেরা চুরি-ডাকাতি করেনা, তাতে আসে যায় কি? তুমি চুরি করোনা, মিথ্যা কথা কওনা, অন্যায় করোনা, চার ঘণ্টা ধ্যান করো, আট ঘণ্টা ঘণ্টা বাজাও—মধু, তা কার কি?' কলকাতার ডোমপাড়া হাড়িপাড়া বা গলিঘুঁজিতে অনেক গরিব আছে, তাদের সাহায্য করো। বোঝাও তাদের তুমি ভালোবাসো। দয়া আর ভালোবাসায়ই জগৎ কেনা যায়। লেকচার বই ফিলসফি সব তার নিচে। গরিবদের সাহায্যের জন্যে শশীকে ঐরকম একটা কর্মবিভাগ খুলতে বলো। ঠাকুর পুজো-ফুজোতে যেন টাকাকড়ি বেশি ব্যয় না করে। এদিকের ঠাকুরের ছেলেপুলে যে না খেয়ে মরছে। শুধু জল-তুলসীর পুজো করে ভোগের পয়সাটা দরিদ্রের

শরীরস্থিত জীবন্ত ঠাকুরকে ভোগ দাও। তাহলেই সব কল্যাণ।'

মরুভূমির মধ্য দিয়ে চলছে স্বামীজি। সূর্যের চেয়েও বালির তাত বেশি। বাতাসে আগুনের হলকা। তবু পথ ভাঙছে স্বামীজি। যখন মরুভূমি আছে তখন নিশ্চয়ই আছে স্নেহময় শ্যামলতা।

অদূরেই একটি গ্রাম চোখে পড়ল। কি আশ্চর্য, সরোবরের জল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, তীরে গাছগাছালির সবুজ স্তূপ। স্বামীজি উৎফুল্ল হয়ে উঠল। শুষ্ক-কণ্ঠ স্নিগ্ধ তো হবেই, বৃক্ষতলে মিলবে নিশ্চয় শীতল শান্তি। শ্যামলসজলের সংস্পর্শে এসে বাতাসও হবে সুখাবহ।

জোরে পা চালাচ্ছে স্বামীজি। কিন্তু কোথায় সেই ঘনপল্লব গ্রাম। যতই এগুচ্ছে ততই সেই স্বপ্নচ্ছবি দূরে সরছে।

বুঝতে আর বাকি রইলনা, এরই নাম মরীচিকা। গ্রাম মিথ্যা, শান্তির নীড় মিথ্যা, বৃক্ষচ্ছায়া মিথ্যা, মিথ্যা ঐ তৃষ্ণার পানীয়।

জীবনও বুঝি এমনি। চারদিকেই শুধু মায়ার ছলনা কুহকের কুয়াশা। সর্বোর্ধ্বসংস্থিত সত্য কোথায়? কোথায় সেই অতন্দ্র সূর্য?

সত্য শুধু ঈশ্বর। সত্য শুধু পথ চলা।

আবার এগুলো স্বামীজি। আবার দেখল নয়নসম্মুখে সেই মনোহর গ্রাম, সেই কালোজলভরা সরোবরের সঙ্কেত। স্বামীজি মনে-মনে হাসল। গতি এক-বিন্দু শিথিল করলনা, চোখে আনতে দিল না স্বপ্নের মুগ্ধতা। উপেক্ষা করে চলল এগিয়ে। পিপাসিত মৃগের মত আর ধাবিত হল না ভ্রান্ত জলের পিছনে।

আমি তোমাতেই শরণ নেব।

হে অর্জুন, একমাত্র আমাতেই চিত্ত রাখো। আমাতেই প্রণত হও, পূজাপরায়ণ হও। তাহলে আমাতেই তুমি পরিণত হবে। পরিণত হওয়াই প্রাপ্ত হওয়া।

সমস্ত ধর্ম ছেড়ে আমাতেই শরণাগত হও। শোক কোরোনা, আমিই তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে ত্রাণ করব। বললেন শ্রীকৃষ্ণ।

সমস্ত ধর্ম ছাড়ব? হ্যাঁ, যেহেতু আমিই একমাত্র ধর্ম। সমস্ত ধর্ম ছাড়া অর্থ সমস্ত বিধিনিষেধের দাসত্ব ছাড়া। কোন ধর্ম গ্রহণ করব, গার্হস্থ্যধর্ম না সন্ন্যাসধর্ম, রাজধর্ম না দানধর্ম, বেদোক্ত ধর্ম না শাস্ত্রোক্ত ধর্ম, শ্রুতি, স্মৃতি না লোকাচার—গোলমালের মধ্যে যেওনা, শুধু ঈশ্বরেরই শরণ নাও। ঠাকুর বলেছেন, গোলমালের মধ্যে গোলও আছে মালও আছে—গোলটুকু ছেড়ে মালটুকু নাও। তেমনি এ দিক না ও দিক, এ পথ না ও পথ, চিন্তার এ সব সঙ্কটের মধ্যে যেওনা, শুধু ঈশ্বরকে আঁকড়াও। আর ধর্মসংমূঢ়চেতা থাকবার প্রয়োজন নেই, আমাতেই প্রপন্ন হও।

শরণাগতির ছয় লক্ষণ। ভগবানের অনুকূল কার্যে প্রবৃত্তি, প্রাতিকূল্যে বিতৃষ্ণা, তিনিই রক্ষক এই সুদৃঢ় বিশ্বাস, তুমিই রক্ষাকর্তা এই বলে মনে মনে ঈশ্বরকে বরণ, তাঁতে আত্মনিক্ষেপ এবং রক্ষা করো বলে দৈন্য ও আর্তিনিবেদন।

অর্জুন কি বলল?

বললে, হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হয়েছে, আমার স্মৃতি আমার কর্তব্যজ্ঞান ফিরে এসেছে, আমি স্থির হয়েছি, নিঃসংশয় হয়েছি—'করিষ্যে বচনং তব', তোমার কথামতই কাজ করব। অর্থাৎ যুদ্ধ করব।

'মাম্ অনুস্মর, যুধ্য চ।' আমাকে স্মরণ করো আর যুদ্ধ করো।

এক হাতে ধনুক আরেক হাতে তীর। দুহাতে সংগ্রামের আয়ুধ। দুহাতে কাজ। আর বুকের মধ্যে ভগবান। হৃদয়সন্নিহিত সকলসুন্দরসন্নিবেশ।

হৃষীকেশে এক সাধুর সঙ্গে দেখা।

তুমি কোন সাধু? আমি সেই চোর সাধু। স্বামীজি তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। 'গাজীপুরে পওহারী বাবাকে দেখনি? যিনি শুধু নুন খেয়ে থাকতেন। শোননি তাঁর কাছে সেই চোরের গল্প?' সাধুর দুচোখ ছলছল করে উঠল।

শুনেছে সেই কাহিনী। পওহারী বাবার আশ্রমে এক চোর ঢুকেছিল। জিনিসপত্র চুরি করে পালাচ্ছে, টের পেয়েছে পওহারী। পওহারীও তার পিছু নিয়েছে। চোর যত ছোটে পওহারীও তত পা বাড়ায়। যখন প্রায় ধরো-ধরো চোর তখন হাতের পোঁটলা ফেলে দেয় পথের উপর। চোরাই মাল ফেলে দিয়েছি, এখন আর কেন অনুসরণ করো? পওহারী তবুও বিরত হয়না, যে করে হোক যত দূরেই হোক, তোকে ধরবই ধরব। অনেক দূর ছুটে চোরকে ধরল পওহারী। চোর কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, আমাকে ছেড়ে দাও। পওহারী সহসা করজোড়ে তাকে বন্দনা করতে লাগল, বললে, 'প্রভু, নারায়ণ, তুমি ছদ্মবেশে চোরবেশে আমার ঘরে এসেছিলে। আমি কিছুই তোমার সেবা করতে পারিনি। আমার এমন কিছু সম্পদ নেই যা দিয়ে তোমার যথার্থ প্রীতি উৎপাদন করতে পারি। এই পোঁটলা তুমি গ্রহণ করো। আরো চলো আমার ঘরে, দেখ, আরো কিছু তোমার নেবার মত উপযুক্ত আছে কিনা।'

এ কি আশ্চর্য ঘটনা! চোর যত অনুনয় করে, পওহারীর তার চেয়ে বেশি কাতরতা! শেষ পর্যন্ত চোরেরই হার হল। পওহারীর যথাসর্বস্ব গ্রহণ করতে হল তাকে।

সেই চোরের দিকে এখন তাকিয়ে দেখ। মর্চে-পড়া লোহা কাঞ্চন হয়ে গিয়েছে। পওহারীর সংস্পর্শে সাধু বনে গিয়েছে। 'যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে না মানো মণি—' সে ধনের সন্ধানে দেশান্তরী হয়েছে।

স্বামীজি প্রণাম করল সাধুকে। এই সেই ঠাকুরের বাণীরূপ। 'ডাকাতরূপী নারায়ণ!' কে অবিশ্বাস করবে পাপীর মধ্যেও রয়েছে সাধুতার সম্ভাবনা।

কন্যাকুমারিকা থেকে স্বামীজি চলে এল পণ্ডিচেরি। সেখান থেকে মাদ্রাজ। হৈ-হৈ পড়ে গেল। পরনে গেরুয়া আলখাল্লা মাথায় পাগড়ি হাতে দণ্ড-কমণ্ডলু—কে এ জ্যোতিষ্মান সন্ন্যাসী! যেন এক প্রাণ-অগ্নিশিখা ঊর্ধ্বমুখে জ্বলছে অনির্বাণ। মৃত্তিকা থেকে যেন এক পুঞ্জীভূত স্তব উঠেছে আকাশের দিকে। কি উদাত্ত কণ্ঠস্বর, কি অনর্গল বাগ্মিতা। যেমন দার্ঢ্য তেমনি বিনয়। যেমন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা তেমনি আবার পরিহাসের তারল্য। তর্ক-যুক্তিতে কে

এ'টে উঠবে? কার সাধ্য থাকবে অনভিভূত?

'আচ্ছা স্বামীজি, যাদের বেদান্ত আছে সেই তাদেরই আবার মূর্তিপূজা কেন?' কে একজন প্রশ্ন করল।

উদার হাস্যে স্বামীজি বললে, 'যেহেতু আমাদের মাথার উপরে হিমালয় বিরাজমান। কে আছে যে হিমালয় দেখে প্রণত হবেনা? প্রাণে জাগবেনা ভক্তির বিহ্বলতা?' পরে আবার বললে, 'ঠাকুর বলতেন যার যেমন পেটে সয় মা তার জন্যে তেমনি বন্দোবস্ত করেছেন। কারু জন্যে পোলাও-মাংস কারু জন্যে লুচি, কারু জন্যে বা খই-বাতাসা। দেয়ালের ছোট্ট ফোকরের মধ্য দিয়ে যেমন আকাশ দেখা যায়, তেমনি প্রতিমার মধ্য দিয়ে দেখা যায় ঈশ্বরকে।'

'ঈশ্বর আছে তার প্রমাণ কি?' আরেকজন কে প্রশ্ন করল।

'কি বলব! বেদ পড়েছ? অলৌকিক বিষয়ে বেদই প্রমাণ। বেদ মানে ঋষিদের অতীন্দ্রিয় জগতের অনুভূতি.'

'অতীন্দ্রিয় আবার কি!'

'চোখের লেন্স্ বদলানো। এমনি শাদা চোখে দেখছ একটা পাতা—কতটুকু দেখছ? স্বচ্ছ কাচের উপর সেই পাতাটি রেখে যদি চোখে অনুবীক্ষণ যন্ত্র লাগাও দেখবে তার রূপের কী সূক্ষ্ম কারিকুরি। চোখে দেখা যায়না অথচ যা আছে তাই অতীন্দ্রিয়। যেমন করে পারো চক্ষুষ্মান হও দেখতে পাবে সেই সুন্দরোজ্জ্বলকে।'

'রিয়্যালিটির কথা বলুন।'

'রিয়্যালিটি? যাকে রিয়্যালিটি বলছ তা হচ্ছে স্বল্প মনের আচ্ছন্ন দৃষ্টি। নৌকোয় বসে দেখছ তীরের গাছ চলেছে। ঐটেই হচ্ছে রিয়্যালিটির চেহারা।'

'মশাই', আরেকজন প্রশ্ন করল, 'আমি যদি ব্রহ্ম, তাহলে তো আমার সব দায়িত্ব চুকে গেল। তখন পাপ করলেও আমাকে লাগবেনা।'

গর্জে উঠল স্বামীজি : 'যদি সত্যি বিশ্বাস করতে পারো আমিই সেই ঈশ্বর, সাধ্য কি তুমি ক্ষুদ্র হও, নীচ হও, সাধ্য কি তুমি পাপ করো অন্যায় করো?'

সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়ার নামকরা নাস্তিক। খৃষ্টান কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক। স্বামীজির সঙ্গে তর্ক করতে এসেছে।

বেশ তো নাই বা বিশ্বাস করলে। নাস্তিকও ধার্মিক হতে পারে। এস আমরা যার-যার আদর্শ নিয়ে কাজ করি। জল যখন আগুনে বসানো হয় একটার পর একটা বুদ্বুদ ওঠে। তারপর জল টগবগ করে, পাত্র আলোড়িত হয়। প্রত্যেক মানুষ বুদ্বুদ, সমস্ত উত্তপ্ত জলের আলোড়নই সমাজ। বৈজ্ঞানিকে-দার্শনিকে ভেদ নেই। এক জলের মধ্যেই বহু বুদ্বুদের সামঞ্জস্য।

নাস্তিকতা নিয়ে এসেছিল উর্জিতা ভক্তিতে রূপান্তরিত হল মুদালিয়ার।

'সেই মহান অজানা ব্রহ্মকে কি কখনো দেখা যায়?' রামনাদের রাজার প্রাসাদে একজন বিদ্রূপের সুরে জিগগেস করল স্বামীজিকে।

স্বামীজি হুঙ্কার করে উঠল : 'যায়। আমি দেখেছি সেই অজানাকে।'

'মশাই, ঈশ্বরের স্বরূপ কি বলতে পারেন?' খৃস্টান কলেজের ছাত্র, সুব্রহ্মণ্য

আয়ার জিগগেস করল স্বামীজিকে।

মহীশূরের রাজার দেওয়া হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে স্বামীজি। চোখ খুলে তাকালো একবার প্রশ্ন শুনে। বললে, 'তুমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র। শক্তি, এনার্জি জিনিসটা কি বলো তো বুঝিয়ে।'

ছাত্র হিমসিম খেতে লাগল। দেখল এমন জিনিসও আছে যা বোঝা যায় অথচ বোঝানো যায়না।

'তুমি কুস্তি লড়তে পারো?' জিগগেস করল স্বামীজি।

'একশোবার। লড়বেন?'

'এসোনা।'

মুহূর্তে ঘায়েল হল আয়ার। কি দেখছ? মাংসপেশীর দৃঢ়তা না ব্যায়ামের কৌশল? সমস্ত কাঠিন্য-নৈপুণ্যের মধ্যেই অদৃশ্য শক্তি। কাঠের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আগুন। বীজের মধ্যেই প্রসুপ্ত বনস্পতি।

ঈশ্বরের স্বরূপ জিগগেস করছিলে না?

ঈশ্বর কে? যার দ্বারা জন্ম স্থিতি ও লয় হচ্ছে তিনিই ঈশ্বর। যিনি অনন্ত, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, সর্বশক্তিমান। যিনি সর্বজ্ঞ, পরমকারুণিক, গুরুর গুরু। যিনি অনির্বচনীয়-প্রেমস্বরূপ।

তবে কি ঈশ্বর দুজন? এক নির্গুণ ব্রহ্ম, আরেক সগুণ ভগবান?

একই জিনিসের দুইরকম চেহারা। জল আর বরফ। তন্তু আর পট। মাটি আর মূর্তি। যিনি জ্ঞানীর সচ্চিদানন্দ তিনিই ভক্তের প্রেমের ঠাকুর।

জ্ঞানে এমন এক অবস্থায় আসা যায় যেখানে সৃষ্টি সৃষ্ট বা স্রষ্টা নেই, জ্ঞাতা জ্ঞেয় বা জ্ঞান নেই, প্রমাতা প্রমেয় বা প্রমাণ নেই। আমি তুমি বা তিনি নেই। সেখানে কে কাকে দেখে, কে কার কথা শোনে? সেখানে বাক্যও নেই মনও নেই। শুধু নেতি-নেতি, শুধু একমেবাদ্বিতীয়ং। সে এক অনবচ্ছিন্ন মুক্তি, ব্রহ্ম-নির্বাণ। কিন্তু মুক্তির আনন্দ কোথায় যদি না একটা ব্যক্তিত্বের চেতনা থাকে? শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, আমি চিনি হতে চাইনা, আমি চিনি খেতে ভালোবাসি। তাই যে জীবন্মুক্ত, আত্মারাম অর্থাৎ অন্তরেই যার সকল তৃপ্তি, সে জ্ঞানীমুনিরাও অবশেষে ভক্ত হয়ে ওঠে। ভক্তিই সমস্ত আস্বাদের গুরু। প্রহ্লাদ যতক্ষণ আত্মনিমগ্ন ছিলেন, জগৎ ও তার কারণ কিছুই দেখতে পেলেন না, সমুদয়ই অবিভক্ত, শুধু অনন্তরূপে প্রতীয়মান মনে হল। কিন্তু যখনই বোধ হল আমি প্রহ্লাদ অমনি তাঁর চোখের সামনে দেখা দিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

নারদ ব্রহ্মকে বললে, হে ভূতভাবন, আপনাকে নমস্কার। এখন বলুন এই বিশ্ব কার সৃষ্ট কার স্বরূপ, কাকেই বা আশ্রয় করে আছে আর কাতেই বা লীন হবে? আপনিই কি সেই স্ব-তন্ত্র পুরুষ?

ব্রহ্ম বললে, আমার চেয়েও আছে একজন শ্রেষ্ঠ। সূর্য অগ্নি চন্দ্র তারা যেমন দৃশ্য পদার্থকে দৃষ্ট করায় আমিও তেমনি এই স্বপ্রকাশ বিশ্বকে সৃষ্টরূপে সর্ব-সমক্ষে প্রকাশিত করছি মাত্র।

যা ভূতং ভব্যং ও ভবৎ, অর্থাৎ যা হয়ে গিয়েছে, যা হবে, বা যা হচ্ছে সকলই সেই পুরুষ। সর্বং পুরুষ এবেদং। তিনিই সমস্ত বিশ্ব আবৃত করে আছেন, বিতস্তি-পরিমিত হয়েও অধিকার করেছেন সমগ্রকে। আমি সর্বলোকপূজিত, তবু তাঁকে জানতে পারলাম না।

কি করে জানা যায় তাঁকে?

দেহ ও মন সম্পূর্ণ নির্মল হলেই তাঁকে জানা যায়।

আর দেখা পাওয়া যায় কি করে?

হৃদয়ে উৎকণ্ঠা নিয়ে অহরহ তাঁকে ডাকলে।

শুধু জেনে আমার কী সুখ! আমার সুখ দেখে। আমার সুখ আস্বাদে। সে দর্শন-স্পর্শনের অধিকারী কে? সে আস্বাদন কার পুরুষার্থ? একমাত্র ভক্ত। একমাত্র ভক্তের।

সুতরাং অমৃতবর্ষিণী ভক্তি তোমাতে সঞ্চারিত হোক। তুমি মধু হয়ে ওঠ, স্বাদু হয়ে ওঠ। শ্রীনিকেতন ভগবান প্রসন্ন হলে কী অলভ্য থাকতে পারে? কিন্তু অহেতুকী ভক্তির এমন মজা যে সে কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেনা।

তুমিও ভালোবাসো, আকাঙ্ক্ষা কোরোনা।

রাঁধুনে বামুন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে হুঁকোর দিকে। স্বামীজি জিগগেস করলে, 'কি হে, তুমি এ হুঁকোটা চাও?'

এ যে একেবারে কল্পনার বাইরে। রসিকতারও একটা সীমা আছে। নইলে মহীশুরের মহারাজের দেওয়া চন্দনকাঠের হুঁকো দিয়ে দেবেন অনায়াসে?

'কি হে, কথা বলছনা কেন? নেবে এই হুঁকোটা?' হুঁকোশুদ্ধু হাত বাড়াল স্বামীজি।

'আপনার এত সাধের হুঁকো, কতদিনের সাথি—' বললে রাঁধুনে বামুন।

'আমার প্রিয় যদি তোমারও প্রিয় হয় তো মন্দ কি। আমার নেই আর তোমার আছে এ একই কথা।' রাঁধুনে বামুনের হাতে হুঁকোটি গুঁজে দিল স্বামীজি।

'যদি আমি সহস্র দেহে জ্বর ও অন্যান্য রোগ ভোগ করছি, আবার আমি লক্ষ-লক্ষ দেহে সম্ভোগ করছি স্বাস্থ্য। যেমন সহস্র দেহে উপবাস করছি তেমনি প্রচুর আহার করছি সহস্র দেহে।' বলছেন বিবেকানন্দ, 'যেমন সহস্র দেহে দুর্বহ দুঃখ তেমনি সহস্র দেহে দুঃসহ সুখ। কে কার নিন্দা করবে, কে কার স্তুতি? কাকে চাইবে, ছাড়বেই বা কাকে? আমি কাউকে চাইনা, কাউকে ছাড়িও না। যেহেতু আমিই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। আমি নিজেরই স্তুতি করছি, নিজেরই অপযশ। নিজের দোষেই আমার কষ্ট, নিজের ইচ্ছাই আমার সুখ। আমি স্বাধীন, সর্বতঃ-স্বাধীন।'

এই হচ্ছে জ্ঞানীর ভাব, যে জ্ঞানী মহাসাহসী, ছিন্নসর্বসংশয়। যে জ্ঞানী সমুদয় পুতুল ভেঙে ফেলতে পারে, শুধু কুসংস্কারের পুতুল নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়সমূহের পুতুল। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়ে গেলেও সে হেসে বলে,

এ জগৎ কোথাও ছিল নাকি, মিলিয়েই বা গেল কোথায়? ক গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ?

বিবেকানন্দ একদিকে জ্ঞানী, অন্যদিকে ভক্ত। একদিকে বৃহত্তেজা সূর্য, অন্যদিকে সুধাস্যন্দী চন্দ্র।

নৃসিংহ অবতীর্ণ হলে প্রহ্লাদ স্তব করতে লাগল : হায় আমি অসুর থেকে উৎপন্ন, হরিতোষণে আমার যোগ্যতা কোথায়? কিন্তু আমি জানি সম্পত্তি, সৎকুল, সৌন্দর্য, তপস্যা বা পাণ্ডিত্য—এ সব গুণে পরমপুরুষের আরাধনা হয় না। কারণ ভগবান শুধু ভক্তিতেই তুষ্ট। গুণমণ্ডিত বিপ্রের চেয়ে ভক্ত চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ। তাই আপনার করাল রূপ দেখে আমি ভয় পাচ্ছিনা। দেহে অহং-বুদ্ধি নিয়ে ভ্রমণ করছি এই আমার ভয়। আমি কালচক্রে ইক্ষুদণ্ডের মত নিষ্পীড়িত হচ্ছি, আমাকে উদ্ধার করুন। আমাকে ভক্তি দিয়ে দাস্য দিয়ে উদ্ধার করুন। আয়ু স্ত্রী বিভব কিছু যাচ্ঞা করিনা, অণিমাদি সিদ্ধিও আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। সব আপনার হাতেই লয় পাচ্ছে। শ্রেয় শ্রবণমাত্রই সুখজনক কিন্তু আসলে মৃগ-তৃষ্ণিকার মত মিথ্যা। শুধু সেবাই আপনার প্রসন্নতার কারণ। হে অচ্যুত, নানা ইন্দ্রিয় নানা দিকে আমাকে টানছে, আপনার দিকে টেনে আমাকে উত্তীর্ণ করুন। কিন্তু আমি একাকী মুক্ত হতে চাইনা, আমার সঙ্গী এই সব অসুর বালকেরা অত্যন্ত দীন, এদের আমি ছাড়তে পারবনা। তাই আমার সঙ্গে এদেরকেও টেনে তুলুন। শুধু ষড়ঙ্গ সেবা করেই ভক্তি লাভ করতে দিন। ষড়ঙ্গ সেবা মানে নমস্কার, স্তব, কর্মার্পণ, অর্চন, চরণস্মরণ আর কথাশ্রবণ। ভক্তি ছাড়া মুক্তি নেই। আর সেবা ছাড়া ভক্তি কোথায়? আর দাস্যই সেবার ভিত্তি। সুতরাং আমাকে দাস্য দিন। সহাস্য দাস্য।

'কি দেখছ আমার দিকে তাকিয়ে?' পথচারী যুবককে জিগগেস করল স্বামীজি।

'কি দেখছি? আপনাকে দেখছি না, দেখছি আপনার হাতের ঐ লাঠি! কি সুন্দর জিনিসটা!'

'তুমি নেবে?'

'সে কি কথা? এই লাঠি আপনার নিত্যসঙ্গী—'

'তা হোক। নিত্যসঙ্গী আমার ঈশ্বর।'

'তা ছাড়া তীর্থে-তীর্থে ঘুরেছেন এই লাঠি নিয়ে।' বললে যুবক, 'কত তীর্থের অম্লান স্মৃতি বহন করছে এই লাঠি—'

'তা করুক। তীর্থের স্মৃতি আমার অন্তরে, আমার দেহের অণুতে-রেণুতে।'

'তাহলে দেবেন আমাকে?' ঔৎসুক্যে যুবক কাছে এল এগিয়ে।

'দেব। কেননা তোমার প্রাণ যা চায় তা তোমারই।'

আমার প্রাণ ঈশ্বরকে চায়, অতএব ঈশ্বর আমারই।

প্রেতলোকের কতগুলি প্রাণী নির্জনে বারেবারে আবির্ভূত হয়ে স্বামীজিকে বিরক্ত করছে। কি চাই তোমাদের? কি তোমাদের বক্তব্য?

আমরা দুঃখী, শান্তিহীন, কামনাপীড়িত। আমাদের শান্তির ব্যবস্থা করুন।

একা-একা স্বামীজি চলে গেল সমুদ্রতীরে। দুই মুষ্টি বালি তুলে নিল। অন্নপিণ্ড কোথা পাব, এই বালির পিণ্ড গ্রহণ করো। সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে প্রার্থনা করি তোমরা শান্ত হও, তোমাদের সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হোক।

প্রেতলোকবাসীরা কি স্থূলবস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে? প্রার্থনারত মানুষের অন্তরের স্নিগ্ধতায়ই তারা তৃপ্ত। নিঃসীম শুভাভিলাষেই তারা পরিস্নাত।

তারপর এ কার প্রার্থনা? কার শুভাভিলাষ?

স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের।

সমস্ত মাদ্রাজ শহর উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। মন্মথবাবুর বাড়ি, যে বাড়িতে আছে স্বামীজি, তীর্থস্থানে পরিণত হল। দলে-দলে আসতে লাগল জনতার ঢেউ।

গৈরিকবসনে কি উজ্জ্বলরূপ দেখ একবার তাকিয়ে। মুণ্ডিতমস্তকে কি সৌম্য শোভা! কি উদাত্তশান্ত শঙ্খকণ্ঠ! যেন বিশ্বের গভীর যে অন্তরাত্মা তাকেই সম্ভাষণ করছে নিভৃতে। বলিষ্ঠ, মোহমুক্ত, ঊর্জস্বী। অথচ শিবের মত সদানন্দ, পরিহাসমুখর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট, অথচ অপার-অগাধ বিদ্যা। ঋগ্বেদ থেকে রঘুবংশ মুখস্থ। বেদান্তদর্শন থেকে সুরু করে আধুনিক পাশ্চাত্ত্যদর্শন ও বিজ্ঞান নখদর্পণে। সমস্ত অন্ধতা ও অযুক্তির উপর খড়্গহস্ত। সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করলেও এক ভালোবাসায় বন্দী। সে তার সুতীব্র দেশপ্রেম। এক দুঃখে আহত-আর্ত। সে তার দেশবাসীর অধঃপতন। বিদ্যুৎশিখার মত তার বাণী আর অস্ত্রের মত তার অর্থ। সমস্ত কিছু মিলে একটা উদ্বেল ঈশ্বর-উৎসাহ।

ক্ষুদ্র প্রাণে নিয়ে এসেছে বিশ্বাস। অল্পদৃষ্টিতে অপরিমেয় আকাশের উন্মুক্তি। এবার তবে দাঁড়াই একবার জগতের মুখোমুখি। সর্বদেশকালের মানুষের প্রতিনিধি হয়ে। স্থানে-কালে কুলোচ্ছেনা আমাকে। প্রতিষ্ঠিত করি আমার অনশ্বর মহিমা।

চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল স্বামীজি বিদেশে যেতে ইচ্ছা করেছেন।

'ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন,' বলছেন বিবেকানন্দ, 'তুই কাঁধে করে আমাকে যেখানে নিয়ে যাবি আমি সেখানেই যাব, সেখানেই থাকব। তা গাছতলাই কি আর কুঁড়েঘরই কি। বা রাজপ্রাসাদই কি।'

জগৎ যা ইচ্ছে বলুক, আমার কর্তব্য কাজ করে যাব এই হচ্ছে বীরের ভঙ্গি। কে কি বলছে কে কি লিখছে কাগজে কে মাথা ঘামায়। হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং—মরলে স্বর্গ জিতলে বসুন্ধরা—এই সংকল্পে জাগ্রত হই।

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং
অদ্যেব করণমস্তু শতাব্দান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥

লোকে স্তুতিই করুক বা নিন্দাই করুক, লক্ষ্মী আসুন বা ফিরেই যান, দেহপাত আজ হোক বা শতবৎসর পরেই হোক, যেন সত্যপথ থেকে স্খলিত না হই।

বেদান্তই সেই সত্যপথ। তার বাণী নিয়ে যাব বিদেশে।

উন্মুক্ত সূর্যকে দর্শন করার শক্তি নাই বা থাক, প্রতিবিম্বিত সূর্যকে দেখা কঠিন নয়। মানুষই সেই প্রতিবিম্বিত ঈশ্বর। মানুষের মধ্যেই সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে নিশ্চয় করো।

৪২

দেখতে-দেখতে পাঁচশো টাকা চাঁদা উঠে গেল। স্বামীজির ভক্তদের আনন্দ আর ধরে না। এবার বিদেশে গিয়ে হিন্দুধর্মের উদার পতাকা উড়িয়ে দিয়ে এস।

কিন্তু এ কি আমি শুধু নিজের খেয়াল মেটাবার জন্যে চলেছি? না কি ঈশ্বরের কোনো নির্দেশ আছে প্রচ্ছন্ন? জিজ্ঞাসায় দুলতে লাগল স্বামীজি।

মা গো, তোর কি ইচ্ছে তাই বল। তুইই তো কর্ত্রী, কারয়িত্রী, করণগুণময়ী, কর্মহেতুস্বরূপা। তোর হাতে আমি তো কলের পুতুলমাত্র। বল তোর কি ইচ্ছে? যাব, না, যাব না?

যারা চাঁদা সংগ্রহ করছিল তাদের ডাকল স্বামীজি। বললে, 'যা টাকা যোগাড় হয়েছে তা গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দাও।'

'সে কি কথা?' সবাই অবাক মানল : 'যাবেন না বিদেশে?'

'মার কি অভিলাষ তা না জানবার আগে ঝাঁপ দেব না অন্ধকারে।' বললে স্বামীজি।

কে মা? যিনি জগজ্জননী মহামায়া তিনি?

হ্যাঁ, তিনিই তো। তিনিই তো মর্ত্যের ঘরে সারদামণি। শ্রীরামকৃষ্ণের অভেদস্বরূপিনী।

'দাদা, জ্যান্ত দুর্গাপূজা দেখাব, তবে আমার নাম।' শিবানন্দকে চিঠি লিখছেন বিবেকানন্দ : 'মায়ের কথা মনে পড়লে সময়-সময় বলি, কো রামঃ? দাদা, ঐ যে বলছি ঐখানেই আমার গোঁড়ামি। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন—যা হয় বল দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নেই তাকে ধিক্কার দিও।'

শ্রীশ্রীমাকে চিঠি লিখল স্বামীজি। মাগো, বিদেশে যেতে চাই, তুমি কি বলো?

শ্রীশ্রীমা বলছেন আপন মনে : 'নরেন বলেছিল, মা, আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে। সব দেখছি উড়ে যায়। আমি বললুম, দেখো, আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না। নরেন বললে, মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞানে গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে তো অজ্ঞান। গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায়? আমি বললুম, জ্ঞান হলে? নরেন বললে, জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টিশ্বর সব উড়ে যায়। মা, মা—শেষে দেখে, মা আমার জগৎ জুড়ে। সব তখন এক হয়ে দাঁড়ায়।

এই তো সোজা কথা।'

'মাতৃভাবই সাধনার শেষ কথা।' বলেছেন ঠাকুর।

'জগতে মায়ের স্থান সকলের উপরে।' বলছেন বিবেকানন্দ, 'এই অবস্থায়ই মানুষ আয়ত্ত করতে পারে চরম নিঃস্বার্থপরতা। শুধু আয়ত্ত করতেই পারে না, পারে প্রকাশ করতে।'

মাকে প্রথম দেখার দিনটি মনে পড়ে।

ঠাকুর বললেন শ্রীমাকে, 'আমার নরেনকে তো দেখনি—'

'কি করে দেখব?' বললেন শ্রীমা, 'আমি কি ছেলেদের সামনে বেরুই?'

'না, তুমি দেখো। কি সুন্দর তার চোখ দুটি!'

শ্রীমা চোখ নত করলেন। পদ্মপলাশনেত্রকে কি করে দেখি যদি তুমি না দেখাও।

কি একটা জিনিস আনতে ঠাকুর নরেনকে পাঠালেন নহবৎখানায়। 'যা তো জিনিসটা চেয়ে নিয়ে আয় তো।'

'কার কাছে চাইব?' নরেন এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

'কার কাছে আবার! তোর মার কাছে।'

দরমা দিয়ে ঘেরা নহবৎখানার খাঁচার বাইরে দাঁড়াল নরেন। ডাকল, 'মা আমি এসেছি।'

করুণাময়ী বেড়ার ফাঁকে রাখলেন তাঁর চোখ। দেখলেন কি বৃহৎ উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ সেই চোখ। দুই চোখ নয় যেন তিন চোখ একসঙ্গে।

কুমারী পূজা করার সময় স্বামীজি একবার রক্তচন্দন তার কপালে পরিয়ে দিয়েছিল। শিউরে উঠে বলেছিল, 'আহা, দেবীর তৃতীয় নয়নে আঘাত দিয়ে ফেললুম—'

তৃতীয় নয়নেই তৃতীয় নয়নকে দেখ।

নরেন দক্ষিণেশ্বরে এলে ঠাকুর বলতেন শ্রীমাকে, নরেন আজ এখানে থাকবে, শ্রীমা তখুনি নরেনের জন্যে ময়দা ঠাসতে বসতেন আর চড়িয়ে দিতেন ছোলার ডাল। মোটা-মোটা রুটি আর ছোলার ডালই যে নরেনের পছন্দ এ কে না জানে।

'মা, আমার জ্বর করে দাও।' মঠে যেবার প্রথম দুর্গাপূজা হয়, লোকে লোকারণ্য, হাজার কাজের ঝক্কি, হঠাৎ নরেন এসে বললে মাকে।

সঙ্গে-সঙ্গেই হাড় কাঁপিয়ে জ্বর এল নরেনের।

'ওমা, এ কি হল?' শ্রীমা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন: 'এখন কি হবে?'

'কোনো ভয় নেই মা।' বললে নরেন। 'আমি সেধে জ্বর নিলুম। ছেলেগুলো প্রাণপণ করে খাটছে, তবু কোথায় কি ত্রুটি হবে আর আমি রেগে যাব, বকব, চাইকি দুটো থাপ্পড়ই বা দিয়ে বসব। তখন ওদেরও কষ্ট, আমারও কষ্ট। তাই ভাবলুম, কাজ কি, থাকি কিছুক্ষণ জ্বরে বেহুঁস হয়ে।'

কাজকর্ম চুকে আসতেই মা বললেন, 'ও নরেন, এখন তা হলে ওঠ।'

'হ্যাঁ মা, এবার উঠি।' নরেন পাশ ফিরল।

'কই, উঠলেনা?'

'এই উঠে বসলুম।' সুস্থ হয়ে যেমন-তেমন উঠে বসল নরেন।

সেবার পুজোর সঙ্কল্প মায়ের নামে হয়েছিল। নরেন বললে, 'আমরা তো কপনিধারী, আমাদের নামে হবেনা।' মায়ের হাত দিয়ে পঁচিশ টাকা প্রণামী দেওয়াল তন্ত্রধারককে। চৌদ্দশ টাকা খরচ করলে।

'সব সময়ে জপধ্যান করতে পারে কজন?' বলছেন শ্রীমা, 'মনটাকে বসিয়ে আলগা না দিয়ে কাজ করা ঢের ভালো। মন আলগা পেলেই যত গোল বাধায়। নরেন আমার ঐ সব দেখেই তো নিষ্কামকর্মের পত্তন করলে।'

নিষ্কাম কর্মযোগে ফলনাশের ভয় নেই যেহেতু ফলকামনাই নেই। কাম্যকর্মেই বিঘ্ন। নিষ্কামকর্ম বিঘ্নহীন। স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। এর অল্প আচরণও সংসাররূপ মহৎ ভয় থেকে ত্রাণ করে। নিষ্কামকর্মে অখণ্ড চিত্তশুদ্ধি। কর্তৃত্ববুদ্ধির নাশেই চিত্তশুদ্ধি। কর্তৃত্ববুদ্ধিই বন্ধন। চিত্তশুদ্ধিতেই চিরন্তন প্রসন্নতা। তাই ব্রাহ্মী স্থিতি।

'নরেন হল ঠাকুরের হাতের যন্ত্র।' বলছেন শ্রীমা, 'তিনি তাকে দিয়ে তাঁর কাজ করাবেন বলেই তাকে দিয়ে লেখাছেন, বলাচ্ছেন। নরেন যা লিখছে যা বলছে, খুব সত্যি, কালে সব হবে।'

বেলুড়ে গঙ্গাতীরে নীলাম্বর মুখুজ্জের বাড়িতে আছেন তখন শ্রীমা। পূর্ণিমার রাত। নদীর ঘাটে বসে অনিমেষে তাকিয়ে আছেন জলের দিকে। হঠাৎ দেখতে পেলেন পিছন থেকে কে এসে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নামছে দ্রুত পায়ে। সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল শ্রীমার। একি? এ যে ঠাকুর!

গঙ্গায় নেমে গেলেন, ডুবে গেলেন, মিশে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

আরো আছে বিস্ময়। দেখতে পেলেন পাড়ে বহু লোকের জনতা হয়েছে। আর তাদের মধ্যে নরেন।

নরেন কি করছে? দু হাতে করে গঙ্গাজল নিয়ে সেই জনতার মধ্যে ছিটিয়ে দিচ্ছে। আর মুখে মন্ত্র বলছে শ্রীরামকৃষ্ণ। যার গায়েই সেই মন্ত্রপূত জল পড়ছে সেই পাচ্ছে সদ্য মুক্তি।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর কামারপুকুরে আছেন তখন শ্রীমা, মনে একটু বা ক্ষোভ, এখানে গঙ্গা নেই। নাই থাক, হেঁটেই চলে যাবেন কলকাতা, এমনি ভাবছেন মনে-মনে, হঠাৎ দেখতে পেলেন সামনের রাস্তা দিয়ে ঠাকুর চলেছেন। একা নয়, তাঁর পিছু-পিছু নরেন আর রাখাল আর বাবুরাম।

এ কি! রাস্তা কই? এ যে নদী! ঠাকুরের পাদপদ্ম থেকে অনর্গল জলস্রোত বেরুচ্ছে, সে স্রোত ঢেউ তুলে সবেগে ছুটছে সামনে। পথঘাটের চিহ্ন নেই, শুধু জলতরঙ্গ।

'দেখছি, ইনিই সব। এঁর পাদপদ্ম থেকেই গঙ্গা।' উল্লাসে কথা কয়ে উঠলেন। রঘুবীরের ঘরের কাছ থেকে মুঠো মুঠো জবাফুল ছিঁড়ে এনে গঙ্গায় দিতে লাগলেন পুষ্পাঞ্জলি।

যেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানেই গঙ্গা, সেখানেই বারাণসী।

কত বড় বিশ্বাস তাঁর নরেনের উপর। নরেন নিজের গোঁতে চলত, নিজের মতে কাজ করত, কিছু বলতেননা। ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হয়েছিল নরেন, সমাজে তার অবাধ যাতায়াত। সেখানে মেয়েরাও যায় বলে ঠাকুরের মনঃপূত নয়, মেয়েদের সামনে রেখে কি ধ্যান জমে? কিন্তু আশ্চর্য, নরেনকে কিছু বলতেননা। বরং বলতেন চুপিচুপি, 'তুই যাস যাস, কিন্তু রাখালকে যেন বলিসনি। রাখালকে বললে ওরও যেতে ইচ্ছে হবে।'

তার মানে নরেনের মনের জোর বেশি। নরেন বেশি নির্ভরযোগ্য।

নরেন গান গাইছিল তানপুরা বাজিয়ে : নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে। গান শুনতে শুনতে ঠাকুরের সমাধি হল। উন্নত দেহে পূর্ব-আস্য হয়ে বসে আছেন করজোড়ে। সমাধি দেখে তানপুরা ফেলে নরেন চলে গেল বারান্দায়। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর তাকালেন ব্যাকুল হয়ে, এক ঘর লোক কিন্তু নরেন নেই। শূন্য তানপুরা পড়ে আছে।

সবাই উৎসুক হয়ে উঠল : কোথায় নরেন?

ঠাকুর বললেন, 'ও এখন থাকল আর গেল। আগুন জ্বেলে দিয়ে গেছে।' নরেন সেই নিরিন্ধন বহ্নি।

বলতেন, 'ওর ঘর বলে দিলে ও দেহ রাখবেনা। ওকে আমি ভুলিয়ে রেখেছি। যখন প্রথম আসে তখন ওর বুকে হাত দিতে বেহুঁস হয়ে গেল। চৈতন্য হলে কাঁদতে লাগল, ওগো, আমার এমন করলে কেন? আমার যে বাবা আছে, মা আছে। আমি বললুম কেউ তাঁরা তোর নন, সব ঈশ্বরের, আর তুই আমার।'

মাস্টার মশাইকে বলছে নরেন, 'ঠাকুর কি নম্র কি নিরহঙ্কার। কি সর্বঢালা বিনয়। বলতে পারেন আমার কিসে বিনয় হয়? বুঝি আমার ভিতরে অহঙ্কার আছে। আমি বড় হাঁকডেকে।'

'ঠাকুর বলতেন, এ অহং কার? এ কার দেওয়া?' বললেন মাস্টার মশাই : 'ঈশ্বরই তোমার মধ্যে এ অহঙ্কারটুকু রেখে দিয়েছেন যাতে তুমি অনেক কাজ করো। যাতে পারো অনেক হাঁকতে-ডাকতে।'

'আমি বললুম আমাকে সমাধিস্থ করে দিন—'

'তিনি কি বললেন?'

'বললেন, সমাধি তো তুচ্ছ কথা। তুই সমাধির পারে যা।'

'তার মানে ছাদে উঠে আবার সিঁড়িতে আনাগোনা কর। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান নিয়ে কারবার কর। তুমি যাবে কোথায়? তোমার পরে যে ঠাকুরের সব ভার অর্পণ করা। তুমিই যে তাঁর আমমোক্তার।'

যখন আশার শেষ আলোটিও নিবে যাচ্ছে, ঠাকুর চলেছেন মহাযাত্রায়, শ্রীমা কাঁদতে লাগলেন। চোখ মেলে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'তোমার ভাবনা কি? তোমার নরেনই তো আছে। আমার যেমন করেছে তোমারও তেমনি করবে।'

মা যখন যাচ্ছেন রামেশ্বরে, তখন রামনাদের রাজা লিখছেন তার কর্মচারীদের, "আমার গুরুর গুরু পরমগুরু যাচ্ছেন, ব্যবস্থার যেন এতটুকুও ত্রুটি না হয়।

রামেশ্বর তখন রামনাদের অধীন। রামনাদের রাজার গুরু বিবেকানন্দ। আর বিবেকানন্দের গুরু শ্রীমা।

'যার ঠাকুরকে বিশ্বাস নেই, মায়ের উপর ভক্তি নেই,' ব্রহ্মানন্দকে লিখছে স্বামীজি : 'তার ঘোড়ার ডিমও হবে না, শাদা বাঙলায় বললুম, মনে রেখো।'

মাদ্রাজ থেকে হায়দ্রাবাদে এল স্বামীজি। হায়দ্রাবাদের নবাব খুরশিদ জা স্বামীজির ঈশ্বরব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়ে গেল। বললে, 'আমি আপনাকে এক হাজার টাকা দিচ্ছি আপনার বিদেশ যাত্রার সাহায্যে।'

স্বামীজি হাসল। বললে, 'এখনো সময় হয়নি। এখনো পাইনি মার হুকুম।'

গণ্যমান্য কত লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে রোজ, কত রাজা-রাজড়া, কত উঁচু দাঁড়ের সরকারী কর্মচারী, কিন্তু এমন লোক তো কখনো দেখিনি। হায়দ্রাবাদের সে এক অদ্ভুত যোগী, অলৌকিক তার মনের ক্ষমতা। মন যা বলে তাই সে করে তুলতে পারে। ও ডালে ফুল ফুটুক, ফুল ফুটে ওঠে। এ ভারি বস্তুটা নড়ে উঠুক, জিনিস অমনি নড়ে ওঠে। বৃষ্টি পড়ুক, অমনি বৃষ্টি পড়ে।

কিন্তু জ্বর ছাড়ুক বললেই জ্বর ছাড়ে কই? স্বামীজি যখন এল যোগীর কাছে, দেখল যোগী তীব্র জ্বরে শুয়ে আছে বিছানায়। নিজের জ্বর নামাতে পারো না কেমন তোমার মনোবল?

ভাবখানা এমনি, তোমার জন্যে বসে আছি।

স্বামীজি বসল তার শয্যাপাশে। যোগী স্বামীজির একখানা হাত টেনে নিয়ে রাখল নিজের মাথার উপর। ধীরে ধীরে তপ্ত জ্বর নেমে গেল শীতল হয়ে। কত দিনের রোগী উঠে বসল বিছানায়।

আমার মনের চেয়েও তোমার স্পর্শের শক্তি বেশি। আমি কী ছাই পারি, তুমি পারো লোহাকে কাঞ্চন করতে।

হায়দ্রাবাদেও টাকা তোলবার হিড়িক পড়ে গেল। চাঁদার দরকার কি, বেগম বাজারের মতিলাল শেঠ একাই দিয়ে দেবে সব টাকা।

স্বামীজি হাসল। বললে, 'ধনীর টাকা নেব না। যদি বিদেশে যাই ভারতের দরিদ্র সাধারণ মানুষের জন্যেই যাব। সুতরাং পাথেয় যদি তারা জুটিয়ে দেয় তবেই যাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু সর্বাগ্রে মায়ের আদেশ।'

স্বপ্ন দেখলেন শ্রীমা। দেখলেন উত্তাল সমুদ্র, তার ঢেউয়ের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন ঠাকুর আর তাঁর পিছনে নরেন।

মায়ের সমস্ত ভয়-ভাবনা দূর হয়ে গেল। তক্ষুনি চিঠির উত্তর দিলেন স্বামীজির। লিখলেন, মনে-প্রাণে আশীর্বাদ করছি, নির্ভয়ে চলে যাও বিদেশে।

কি আশ্চর্য, অনুরূপ স্বপ্ন দেখল স্বামীজি। ঢেউয়ের উপর দাঁড়িয়ে ঠাকুর তাকে ডাকছেন। সেই ডাকে সেও চলেছে ঠাকুরের পিছে-পিছে।

ঘুম ভাঙবার পর দেখল মার চিঠি এসেছে।

মহাবীর যেমন রামনাম করে লাফ দিয়েছিল, আমিও তেমনি মা ও ঠাকুরের নাম করে লাফ দিলাম।

আমি মায়ের ছেলে, আমাকে আর পায় কে।

প্রলয়ঙ্করী কালীশক্তির অঙ্কে ঝাঁপিয়ে পড়ব। তিনি আমার অষ্ট পাশের গ্রন্থি মোচন করে দেবেন। ঘৃণা লজ্জা ভয় শঙ্কা জুগুপ্সা কুল শীল আর জাতি এই অষ্ট পাশ। মায়ের জন্যে ব্যাকুল হলে মা নিজে এসেই বন্ধন খুলে দিয়ে নিজের বুকে তুলে নেবেন।

'যাই যাই তোর বাঁধন খুলে দিগে যাই—'

গোদোহনকালে বাছুরকে দড়ি দিয়ে দূরে বেঁধে রাখা হয়েছে। মাতৃস্তন্য-বঞ্চিত হয়ে বাছুর আর্তনাদ করছে। সে কান্না শুনতে পেয়েছে সারদা, সাত বছরের বালিকা। কান্না শুনে প্রতিধ্বনি করে উঠেছে, 'যাই যাই তোর বাঁধন খুলে দিগে যাই।' ছুটে এসে খুলে দিয়েছে বাঁধন। তেমনি আমরা অমৃতের সন্তান হয়েও অমৃত থেকে বঞ্চিত হয়ে আছি, আছি সংসাররজ্জুতে বাঁধা পড়ে। যদি পারি তেমনি আর্তনাদ করতে, মা মা বলে ডাকতে, বালিকা জগতের মাতা ছুটে এসে তুলে নেবেন তাঁর মুক্ত অঙ্কে।

কালী অর্থ কালশক্তি। সর্বভাবের কলন বা সংহার করেন বলেই কালী। কাল স্থৈর্যের প্রতিমূর্তি, কালী গতির। আসলে স্থিতি আর গতি অভিন্ন। কালাতীত সত্তায় নিয়ে যাবেন বলেই মা আমার কালীমূর্তি।

ভ্রূকুটিকুটিলাত্তস্যা, করালবদনা, শুষ্কমাংসাতিভৈরবা, জিহ্বাললনভীষণা, নাদাপূরিতদিঙ্মুখা। জীবত্বের সমস্ত সংস্কার বিলয় করবার জন্যেই মায়ের এই সংহারমূর্তি। এই মূর্তি ধরেছেন তোমাকে তাঁর কোলের মধ্যে টেনে নেবেন বলে। আসলে তিনি শ্যামা, মেদুরকোমলা, পীযূষস্যান্দিনী। কালকঙ্কালের নিচে করুণার নির্ঝরধারা। তাঁর মাত্রাবিহীন মিত্রতা। জ্ঞানাধিদেবী চিদানন্দলতিকা।

আর আমার দোষ কি, কষ্ট কি। মা-ই ভবাব্ধিকষ্টহারিনী, সর্বদোষবিঘাতিকা।

৪৩

অভিন্নচক্ষুতে দেখ। সমত্ববুদ্ধি অবলম্বন করো। যে সর্বভূতে আমাকে ভজনা করে সে যে অবস্থাতেই থাকুক আমাতেই অবস্থিত থাকে। গীতায় অর্জুনকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ।

ভাগবতেও সেই কথা। বলছেন শ্রীকৃষ্ণ। আমি সর্বভূতে ভূতাত্মস্বরূপে অবস্থিত। তবু আমাকে অবজ্ঞা করে মানুষকে অবজ্ঞা করে যে শুধু প্রতিমার পূজা করে তার আরাধনা বিড়ম্বনামাত্র। তার ভজনা ভস্মে ঘৃতাহুতি। কিন্তু আমি সর্বমানুষে আছি জেনে যে সমান মৈত্রীর দৃষ্টিতে সকলকে দেখে, দান-মান দিয়ে অর্চনা করে আমি তারই পূজা গ্রহণ করি।

জীবে প্রেম হলেই ভগবানে ভক্তি।

কিন্তু জীবে প্রেম অসম্ভব যতক্ষণ স্বার্থ প্রতাপান্বিত। স্বার্থত্যাগ ছাড়া জীবে

প্রেম নেই। জীবে প্রীতি ছাড়া ভক্তি নেই ঈশ্বরে।

তাই ভালোবাসাই ভগবান।

কিন্তু ভালো তুমি বাসবে কি করে যতক্ষণ তোমার আমিত্ব-মমত্ব থাকে। সুতরাং স্বার্থের উচ্ছেদই সমত্ববুদ্ধির ভিত্তি।

তাই কেউই পর নয়, সকলেই পরম। সমস্ত বিশ্বই বিষ্ণুর বিস্তার। পুত্রকে পুত্রের জন্যে ভালোবাসিনা আত্মার জন্যে ভালোবাসি। বন্ধুকে বন্ধুর জন্যে ভালোবাসিনা আত্মার জন্যে ভালোবাসি। নিজেকে ভালোবাসি বলেই অন্যকে ভালোবাসা। তাই আপনও যা পরও তাই। সবই সেই একের পূর্ণতা। খণ্ডও যে সমগ্রও সে।

হিরণ্যকশিপু জিগগেস করল প্রহ্লাদকে, 'শত্রুর সঙ্গে রাজার কি রকম ব্যবহার করা উচিত?'

প্রহ্লাদ বললে, 'শত্রু? শত্রু কে? সকলই বিষ্ণুময়। শত্রুমিত্রের ভেদ কোথায়?'

হে অর্জুন, সুখই হোক আর দুঃখই হোক যে আত্মসাদৃশ্যে সর্বত্র সমদর্শী সেই যোগীই সর্বশ্রেষ্ঠ।

তাই স্বামীজি যে আমেরিকা যাচ্ছে বিদেশে যাচ্ছে না, যাচ্ছে যিনি চরাচর নিখিলে প্রাণরূপে প্রকাশমান সেই আরেক প্রাণলোকে। বিশ্ববিধাতার থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে দাঁড়াবে সমুদয় মানুষের সামনে। এষো দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। যে মহান আত্মা বিশ্বকর্মা জনগণের হৃদয়ে সমাসীন তিনি আমার হৃদয়েও জাগ্রত, উদবোধিত। তাই সেই অধিকারে এসেছি তোমাদের কাছে। যে নিখিলেশ্বরকে জেনেছে সেই সকলকে অবাধে আহ্বান করবার অধিকারী।

যাবার সব ঠিকঠাক, খেতড়ির রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি এসে উপস্থিত।

কবে দুবছর আগে খেতড়ির রাজাকে আশীর্বাদ করেছিল স্বামীজি, তোমার ছেলে হবে, তাই এখন ফলেছে নাকি সেই আশীর্বাদ। সন্দেহ কি, স্বামীজির জন্যেই নিঃসন্তানের পুত্রলাভ ঘটেছে, সুতরাং সেই শিশুর জন্মোৎসবে যাওয়া চাই স্বামীজির। মহারাজা অনেক করে বলে দিয়েছেন।

'কিন্তু, অসম্ভব, একত্রিশে মে আমি রওনা হচ্ছি আমেরিকা'। প্রতিবাদ করল স্বামীজি।

জগমোহনলাল, রাজার সেক্রেটারি, ছাড়বার পাত্র নয়। বললে 'আপনি না গেলে উৎসব ম্লান হয়ে যাবে রাজা মনঃক্ষুণ্ণ হবেন।'

'বলেন কি, আমার গোছগাছ এখনো বাকি।'

'তা হোক, সব ব্যবস্থা করে দেবেন মহারাজা। অন্তত একদিনের জন্যেও চলুন।'

সেই আন্তরিকতার আতিশয্য এড়াতে পারলনা স্বামীজি। বললে, 'চলো, কিন্তু একদিন।'

সে কি বিপুল সংবর্ধনা! সমস্ত নগর আলোকে-আনন্দে ইন্দ্রপুরী হয়ে উঠেছে। নৃত্যগীতবাদ্য উদ্বেলিত চারদিকে। কিসের উৎসব আজ? মহারাজের পুত্র হয়েছে তার জন্যে? না, মহারাজের গুরুজি এসেছেন তার জন্যে?

প্রাসাদের সিংহদ্বারে দাঁড়াল এসে গাড়ি। প্রহরীরা খাপের থেকে তলোয়ার তুলে অভিবাদন করলে একযোগে। রাজা কোথায়? খবর পেয়ে রাজা ছুটে এসে স্বামীজির পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। স্বামীজি তুলল তার হাত ধরে।

রাজসভাগৃহে নিয়ে যাওয়া হল স্বামীজিকে। চারদিকে অতিথি-অমাত্যদের ভিড়। সবাই উঠে নতশিরে প্রণাম করল। সালঙ্কার সিংহাসনে বসানো হল স্বামীজিকে। একে-একে সকলের সঙ্গে পরিচয় করে দিল রাজা।

সবচেয়ে বড় পরিচয় ইনি বেদান্তকেশরী ইনিই পুরুষোত্তম। যেমন সর্ব-সংকল্পসন্ন্যাসী তেমনি নিয়তকর্মী। সম্প্রতি চলেছেন পশ্চিমে। ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দুধর্মের প্রচারে।

যুদ্ধ ও যোগ এই ভারতবর্ষের সার কথা। যুদ্ধও করো ও যোগীও হও—এই গীতার মর্মবাণী। যিনি সর্বলোকমহেশ্বর সর্বভূতের সুহৃদ তিনি আবার সমস্ত বিষয়কর্মের ভোক্তা। সুতরাং জীবন্মুক্ত হয়ে কর্ম করো। সেই কর্মই জ্ঞানীর কর্ম। আর জ্ঞান হলেই ঈশ্বরে অনন্যা ভক্তি।

শিশু রাজকুমারকে আনা হল। তার মাথায় হাত রেখে স্বস্তিবচন উচ্চারণ করল স্বামীজি।

এবার তবে যেতে হয় বম্বে।

'সেখানে কি?'

'সেখান থেকেই আমার জাহাজ ছাড়বে।'

'চলুন আপনাকে জয়পুর পর্যন্ত পেঁৗছে দিয়ে আসি।' রাজা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

'কেন, জয়পুর কেন?'

'জয়পুরই আমার রাজ্যের শেষসীমা।' বললেন রাজা। 'অতিথিকে বিদায় দিতে হলে রাজ্যের শেষসীমা পর্যন্ত যাওয়া উচিত।'

রাজাকে নিরস্ত করা গেলনা। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াই এমন আমার সাধ্য কি, আপনি যান সমুদ্রপারে, কিন্তু ঈশ্বর জানেন আপনাকে ছেড়ে দিতে বুক বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। রাজার দুই চোখ ছলছল করে উঠল।

স্বয়ং জয়পুর পর্যন্ত পেঁৗছে দিলেন। জগমোহনলালকে বললেন, একেবারে বম্বে গিয়ে তুলে দিয়ে এস জাহাজে। এই নাও টাকা, যা লাগে যত লাগে। সব বন্দোবস্ত পাকা করে দিয়ে এস।

জয়পুরে রাজপ্রাসাদের এক প্রকোষ্ঠে রাত্রে বিশ্রাম করছে স্বামীজি, পাশেই দরবারকক্ষে মহারাজার নৃত্যসভা বসেছে। বীণা বাজিয়ে গান গাইছে নাচওয়ালী। মহারাজ স্বামীজিকে খবর পাঠালেন, একবারটি আসুন, গান শুনে যান।

স্বামীজি উত্তর পাঠাল : 'আমি সন্ন্যাসী, আমার অভিরুচি নেই।'

গায়িকা মর্মাহত হল। এ বুঝি তাকেই প্রত্যাখ্যান, যেহেতু সে হেয়, পঙ্ক-কলঙ্কে তার বসবাস। মনে দুঃখ হল, কণ্ঠে এল সেই নম্র আকৃতি। গান ধরল নর্তকী :

'প্রভু মেরো অওগুণ চিত না ধরো
সমদরশী হ্যায় নাম তুমারো।
এক লোহ পূজামে রহত হৈ
এক রহে ব্যাধ ঘর পরো।
পারশকে মন দ্বিধা নাহি হোয়
দুঁহু এক কাঞ্চন করো।'

প্রভু, আমার দোষ ধরোনা। তুমি তো সমদর্শী। স্পর্শমণির অন্তর দ্বিধাহীন, সে সব লোহাকেই সোনা করে, সে পূজার ঘরের অস্ত্রই হোক বা ব্যাধের হাতের খড়্গই হোক। তা হলে আমাকে তুমি কেন কৃপা করবেনা? আমি কলঙ্কী বলে তুমি কেন কৃপণ হবে?

বৈষ্ণবসাধু সুরদাসের গান। রাতের হাওয়ায় সে করুণ সুর স্বামীজির কানে গেল। এ আমি কাকে পরিত্যাগ করতে চেয়েছি? এ গায়িকাও কি ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া নয়? আমার এখনো ভেদাভেদ? আমি সন্ন্যাসী আর ও পতিতা? এই আমার সর্বভূতে ব্রহ্মানুভূতি? স্বামীজি দাঁড়াল এসে দরবার কক্ষে। প্রণামে লুণ্ঠিত হল নর্তকী। স্বামীজি আশীর্বাদ করে বিদায় নিল।

রাত্রে আবু রোড স্টেশনে নেমে পড়ল স্বামীজি। নিবিড় পর্বতপুঞ্জের মধ্যে যেন কোন গূঢ়গহনের শুনতে পেল সম্ভাষণ।

একটি রেলকর্মচারীর সঙ্গে আলাপ ছিল, রাত্রে তার ওখানে গিয়ে উঠল। কোথায় রাজার বিলাসপুরী আর কোথায় এক রেলকেরানির কোয়ার্টার। উপল ও উৎপল দুইই স্বামীজির কাছে এক।

পরদিন সকালে দুই পদব্রজী সন্ন্যাসীকে দেখতে পেল পথে। কত সাধু চলেছে তীর্থভ্রমণে তার ঠিক কি।

সন্ন্যাসীরা তাকাল পিছন ফিরে। এ কে গৈরিকের দীপ্তশিখা। হাতে তেজোদ্ধত লাঠি। চলেছে উদাসীনের মত, আবৃত্তি করছে সংস্কৃত শ্লোক। সে শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে অহঙ্কার আর অলঙ্কার, গৌরব আর প্রতিষ্ঠা—সমস্তই ভস্মমুষ্টি। কি হবে আমার স্বর্ণে-রৌপ্যে, কাষ্ঠে-লোষ্ট্রে, বসনে-ভূষণে, করণে-উপকরণে? স্তূপীভূত জড়ের জঞ্জালে? খেতড়ির রাজপ্রাসাদ আমাকে কি দেবে, পাশ্চাত্য ভূখন্ডই বা আমাকে কি দেবে, যে জিনিস ধুলো হয়ে যাবে তার ধুলো ঝেড়ে দিন কাটাতে আমি প্রস্তুত নই। আমি প্রতিষ্ঠা চাইনা, সম্মান চাইনা, সিংহাসন চাইনা, সমস্ত ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে যিনি মূলশক্তি তাঁকে চাই।

আরে, একি রাখাল যে। আর তুমি হরি?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ আর স্বামী তুরীয়ানন্দ।

দুইজনকেই প্রণাম করল স্বামীজি। বললে, 'জানিস রাজা, আমেরিকা যাচ্ছি।' উৎসাহে ফেটে পড়ছে। নিজের বুকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, 'দেখছিস কি? এই এঁরই জন্যে এ সব হচ্ছে।'

'দেখবি আরো কত হবে।' বললে রাখালরাজা।

'মেচে যাবে, মেচে যাবে—চারদিকে শুধু ঠাকুরের নাম আর ঠাকুরের প্রেম।'

'আমাদের জাতের কোনো ভরসা নেই। কোনো একটা স্বাধীন চিন্তা কারু মাথায় আসেনা।' আমেরিকা থেকে চিঠি লিখছেন বিবেকানন্দ : 'সেই ছেঁড়া কাঁথা সকলে পড়ে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন তেমন ছিলেন; আর আষাঢ়ে গপ্পি—গপ্পির আর সীমাসীমান্ত নেই। হরে হরে, বলি একটা কিছু করে দেখাও যে তোমরা কিছু অসাধারণ—খালি পাগলামি! আজ ঘণ্টা হল, কাল তার উপর ভেঁপু হল, পরশু তার উপর চামর হল, আজ খাট হল কাল খাটের ঠ্যাঙে রুপো বাঁধানো হল—আর লোকে খিচুড়ি খেলে আর লোকের কাছে আষাঢ়ে গল্প দু'হাজার মারা হল—একেই ইংরেজিতে ইমবেসিলিটি বলে। ঘণ্টা ডাইনে বাজাবে না বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়—পিদ্দিম দুবার ঘুরবে না চারবার—ঐ নিয়ে যাদের মাথা ঘামতে চায়, তাদেরই নাম হতভাগা, আর ঐ বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া জুতোখেকো—আর এরা ত্রিভুবনবিজয়ী। কুড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ।'

তুরীয়ানন্দ স্বামীকে কাছে টেনে নিল স্বামীজি। বললে, 'হরি ভাই, তোমাদের ধর্ম কি জিনিস আমাকে বলতে পারো? আমি তো চারদিকে কেবল দুঃখই দেখতে পাচ্ছি, অপার অনপনেয় দুঃখ।' বলতে-বলতে স্বামীজির বিশাল চক্ষু থেকে বড়-বড় জলের ফোঁটা পড়তে লাগল। নিজের বুকের উপর হাত রেখে বললে, 'সমগ্র মানুষের দুঃখ যেন এই বুকের মধ্যে এসে বাসা নিয়েছে। হৃদয় তাই বিস্তীর্ণ হয়েছে, দূরতম দীনতম মানুষের দুঃখও যেন আমারই দুঃখ। কে বোঝে আমার এই দুঃখের কথা? কেউ না কেউ না।' শিশুর মত কাঁদতে লাগল স্বামীজি।

একটি বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প হচ্ছে ট্রেনের কামরায়। এমন সময় শ্বেতাঙ্গ এক টিকিট কলেকটর উঠে টিকিট দেখতে চাইল। ভদ্রলোক বললে, টিকিট নেই। তবে এই কামরাতে বসে আছো কোন অধিকারে? ভদ্রলোক বললে, গাড়ি স্টেশনে থেমে আছে, আমি তাই উঠে বসেছি। গাড়ি না ছাড়া পর্যন্ত আমি যাত্রী নই।

'নেমে যান বলছি।'

'কোন আইনে?'

এই নিয়ে সুরু হল তর্ক। ক্রমে বিতণ্ডা, প্রায় হাতাহাতির কাছাকাছি।

স্বামীজি এল মধ্যস্থতা করতে। বললে, 'আমাকে দেখে আমার সঙ্গে কথা কইতে উঠেছে। গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা দিলেই নেমে যাবে।'

'তুম কাহে বাত করতে হো?' শ্বেতাঙ্গ টিকিট-কলেক্টর হুমকে উঠল।

'তুম বলছ কাকে?' পালটা গর্জন করে উঠল স্বামীজি : 'ভদ্রতা শেখনি? আপ্ বলতে জানোনা?'

স্বামীজির ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে কুঁকড়ে গেল সাহেব। ভেবেছিল সামান্য ভেকধারী কিন্তু এ যে দেখছি কেশরফোলানো সিংহ।

সাহেব বললে, 'আমি হিন্দি ভালো জানিনা কিনা! কিন্তু ঐ লোকটা—' এবার ইংরেজিতে বলল সাহেব।

'ঐ লোকটা?' স্বামীজি আবার ধমকে উঠল : 'ইংরিজিও ভালো জানোনা দেখছি। লোক না বলে ভদ্রলোকে বলতে পারো না?'

গুটিগুটি নেমে গেল সাহেব।

জগমোহনকে বললে স্বামীজি, 'অপ্রতিবাদে নেবনা কখনো অপমান। আত্ম-মর্যাদাকে সব সময়েই অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। পরাধীনতার নাগপাশ এমনি করেই মোচন হবে।'

গাড়ি ছেড়ে দিল। জানলা দিয়ে মুখ বের করে গুনগুন করে আবৃত্তি করতে লাগল স্বামীজি : 'রামং চিন্তয় চিত্তবর্বর চিরং চিন্তাশতৈঃ কিং ফলং।' রে বর্বরচিত্ত, সর্বদা রামকে চিন্তা করো, অন্য শত শত চিন্তাতে কি ফল? মুখ, সর্বদা রামনাম করো, বহু অনর্থক কথায় কি ফল? কর্ণ, রামচন্দ্রচরিত শ্রবণ করো, গীত-বাদ্য শুনে কি হবে? চক্ষু, সকল জিনিস রামময় দেখ, রাম ছাড়া আর সব কিছু ত্যাগ করো। চক্ষুস্ত্বং রামময়ং নিরীক্ষ সকলং রামাৎ পরং ত্যজ্যতাম।

নাভাগের পুত্র অম্বরীষ। সপ্তদ্বীপা পৃথ্বীর অধিপতি, কিন্তু ভগবানে ভক্তি ছাড়া আর তার কোনো ধন নেই। আর যা সব তার পার্থিব বিষয়, সমস্ত মৃৎপিণ্ডের মত অসার, স্বপ্নের মত মিথ্যা।

শ্রীহরির আরাধনায় সম্বৎসর দ্বাদশীব্রত অনুষ্ঠান করছেন অম্বরীষ। ব্রতশেষে ত্রিরাত্রি উপবাসে থেকে যমুনায় স্নান করে মধুবনে শ্রীহরির অর্চনা সুরু করলেন। ব্রতপারণের উপক্রম করছেন, দুর্বাসা এসে উপস্থিত। মহাভাগ অতিথিকে অভ্যর্থনা করে ভোজনে আমন্ত্রণ করলেন। দুর্বাসা গেল নদীতে স্নান করতে, কিন্তু আর ফেরবার নাম নেই। দ্বাদশী অতিক্রান্ত হতে আর অর্ধ মুহূর্ত মাত্র বাকি আছে তবু ঋষি অনুপস্থিত। ঋষিকে অভুক্ত রেখে কি করে পারণ সম্ভব, অথচ দ্বাদশী-মধ্যে পারণ না করলে ব্রতবৈগুণ্য ঘটবে। নিরুপায় অম্বরীষ বাসুদেবকে চিন্তা করতে-করতে বিন্দুমাত্র জল পান করলেন। আর সেই মুহূর্তেই ফিরল দুর্বাসা। অতিথিকে না দিয়ে নিজে আগে খেয়েছে এই জেনে দুর্বাসা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠল। এই রাজ্যমত্ত ঈশ্বরদর্পিত রাজার ধৃষ্টতা দেখ, আমন্ত্রণ করেও আমাকে অভুক্ত রেখেছে। এর সমুচিত শিক্ষা না দিয়েছি তো কি। রোষে একটি জটা উৎপাটন করে এক কৃত্যা নির্মাণ করল, সেই কৃত্যা খড়্গহস্তা হয়ে ধাবিত হল রাজার দিকে। অম্বরীষ পদমাত্রও বিচলিত হলেন না। স্থিরশান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন স্বস্থানে।

তখন কি হল? বাসুদেবের সুদর্শন চক্র এসে আবির্ভূত হল। নিমেষে দগ্ধ করল কৃত্যাকে। শুধু তাই নয় দুর্বাসাকে লক্ষ্য করল। প্রাণভয়ে ছুটল দুর্বাসা। যেদিকে ছোটে সেদিকেই চক্র, সাপকে যেন তাড়া করেছে দাবাগ্নি। সুমেরু পর্বতের গুহার দিকে ছুটল, সেখানেও চক্রের আগমন। স্থলে জলে অন্তরীক্ষে কোথাও দুর্বাসার ত্রাণ নেই। এমনকি স্বর্গেও সেই দুঃসহ সুদর্শন।

ব্রহ্মার কাছে আশ্রয় চাইল দুর্বাসা। ব্রহ্মা বললে, বিষ্ণুর চক্রকে নিরোধ করতে পারি আমার এমন শক্তি নেই। তারপর গেল শঙ্করের কাছে। শঙ্কর বললে, আমার কিছুই করণীয় নেই, তুমি বিষ্ণুরই শরণাপন্ন হও। দুর্বাসা বৈকুণ্ঠে গিয়ে বাসুদেবের শরণ নিল। বাসুদেব বললে, আমি ভক্তপরাধীন, সুতরাং অম্বরীষের কাছে যাও। ভক্তই আমার হৃদয়, আমিও হৃদয় ভক্তেরই। আমাকে ছাড়া তাঁরা আর কিছু জানেননা, আমিও তাঁদের ছাড়া আর কিছু জানিনা। তোমার পরিত্রাতা তাই অম্বরীষ।

দুর্বাসা হেঁট মুখে চলল অম্বরীষের সন্ধানে। অম্বরীষের কথায় চক্র শান্ত হল।

চরমশরণ বাসুদেবের ভজনা করো।

৪৪

বম্বেতে আলাসিঙ্গা পেরুমাল এসে হাজির।

'এ কি, কোত্থেকে?' এগিয়ে গেল স্বামীজি।

'সটান মাদ্রাজ থেকে।'

'কি মতলব?'

'অতি সামান্য।' হাসিতে বিস্তৃত হল আলাসিঙ্গা : 'আপনাকে জাহাজে তুলে দিতে এসেছি।'

'একা জগমোহনই যথেষ্ট ছিল—যথেষ্টরও বেশি।' স্বামীজি বললে সসম্ভ্রমে : 'জানো রাজপুতানার ও তাজিমি সর্দার। তাজিমি সর্দারদের নাম জানোতো? ওরা সভায়-দরবারে গিয়ে দাঁড়ালে স্বয়ং রাজাকেও উঠতে হয় আসন ছেড়ে। তারপর, জানো তো, খেতড়ির রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি। কিন্তু একবিন্দু জাঁক নেই শরীরে। বৃষ্টির জলের মতই অনাড়ম্বর। এমন তার সেবা আর পরিচর্যা যে লজ্জা হয় নিজের কাছে।'

বিদেশে যেতে এ লাগবে ও লাগবে কত জিনিস যে কিনে দিচ্ছে জগমোহন তার ইয়ত্তা নেই। এখন বলছে আলখাল্লা আর পাগড়ি সিল্কের হওয়া চাই। তা যেমন-তেমন সিল্ক নয়, একেবারে দামী প্রথম শ্রেণীর। তুমিও যেমন! সন্ন্যাসীর আবার ধড়াচূড়া কি—স্বামীজি আপত্তি করল—খানিকটা মোটা গেরুয়া কাপড় হলেই যথেষ্ট। তা কি হয়! 'রাজার মত সাজাব তোমাকে।' বললে জগমোহন : 'তুমি তো নিজের পক্ষে যাচ্ছনা, তুমি যাচ্ছ ভারতবর্ষের হয়ে। ভারতের জাগ্রতাত্মা হয়ে। তুমি তো দীন দরিদ্র সন্ন্যাসী নও, তুমি জ্যোতিষাং রবিরংশুমান, পূর্ব-দিগন্ত থেকে তোমার নবীন উদয়, সেই বেশেই সাজবে তুমি।'

কিন্তু কি নাম নিই। আগে ছিল সচ্চিদানন্দ, বিবিদিষানন্দ, এখন মহারাজের কথায় বিবেকানন্দ!

মাদ্রাজে বালাজী রাও-এর ছেলেটি মারা গেছে, খবর পেয়ে মুষড়ে পড়ল স্বামীজি। ডাক্তার নাঞ্জুণ্ড রাওকে সে সম্পর্কে লিখছে : প্রভুই দিয়ে থাকেন, প্রভুই নিয়ে থাকেন, সুতরাং প্রভুরই জয় হোক। আমরা শুধু জানি কিছুই নষ্ট হয়না, সবই নিটুট থাকে, নিখুঁত থাকে। যাই আসুক না তাঁর কাছ থেকে শান্ত মনে নিতে হবে মাথা পেতে। সেনাপতি যদি সৈন্যকে কামানের মুখে যেতে বলে, সৈন্যের তাতে নালিশ করবার কিছু নেই। বালাজীকে বোলো আমরা নির্বিবাদে মেনে নিয়েছি সে সেনাপতিত্ব।'

বালাজীকেই লিখল সরাসরি : 'ভাই, দিনরাত তাঁর কাছে প্রার্থনা কোরো, আর ব্লোলো, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

কোনো প্রশ্নে আমাদের নেই অধিকার।
কাজ করো, করে মরো, এই হোক সার।

ভাই, শোকার্তরাই ধন্য, তারাই সান্ত্বনা পাবে। তারাই সমীপবর্তী হবে প্রভুর সিংহাসনের। দৃঢ়তা ও নির্ভরের সঙ্গে বলো, ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু। প্রভু তোমার হৃদয়ে শান্তি দিন এই দিবারাত্র সচ্চিদানন্দের প্রার্থনা।'

'এ জগতের সব কিছুই মূলতঃ সৎ।' বিহারীদাস দেশাইকে লিখছে স্বামীজি : 'উপরের ঢেউ যে চেহারারই হোক, তার গভীরতম দেশে শাশ্বত এক শান্তির ক্ষেত্র বিরাজমান। যতক্ষণ সেইখানে পেঁছুতে না পারছি ততক্ষণই অশান্তি, বিক্ষোভ-বিক্ষেপ। একবার সেই শান্তিমণ্ডলে পেঁছুতে পারলে ঝঞ্চার তর্জনগর্জন কিছুই করতে পারেনা। পাষাণভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে গৃহ তার গায়ে একটা রেখাও পড়েনা।'

বিহারীদাসও শোক পেয়েছে। তাই লিখছে স্বামীজি : 'যে আঘাত আপনি পেয়েছেন তা আপনাকে বিরাট সত্তারই কাছাকাছি নিয়ে যাক, যিনি এলোক ও ওলোক উভয় লোকেরই একমাত্র প্রেমাস্পদ। আর তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন, তিনিই সর্বত্র, সর্বকালে সর্বভূতান্তরাত্মরূপেই তাঁর অধিষ্ঠান।'

ওরিয়েণ্ট কোম্পানির জাহাজ "পেনিনসুলার"-এ ফার্স্টক্লাশের টিকিট কাটা হয়েছে। আলাসিঙ্গা আর জগমোহন স্বামীজিকে তুলে দিতে এল। সব ব্যবস্থা নিখুঁত। খেতড়ির মহারাজা কোথাও এতটুকু ফাঁক রাখেননি।

১৮৯৩ সালের একত্রিশে মে স্বামীজির জাহাজ ছাড়ল।

কত পুরোনো কথা মনে পড়ছে এখন। বেশি করে মনে পড়ছে বরানগর মঠের কথা, গুরুভায়েদের কথা—কে কোথায় আছে নাজানি। কোন বনে-পর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানেই যাক আর থাক, অন্তহীন রহস্য যে ঈশ্বর তাকে পাবারই তাদের অনির্বাণ অন্বেষণ।

শুধু মেঝেতে বা একটা ছেঁড়া চ্যাটাইয়ে সবাই পড়ে আছে। মুষ্টিভিক্ষা করে চাল নিয়ে এসেছে তাই সেদ্ধ করে একটা কাপড়ে ঢেলে সবাই খাচ্ছে। কি দারুণ কৃচ্ছ্র! রাত্রে উনুন জেবলে একটা কেরোসিনের বাক্সের উপর বসে রুটি সেঁকা, হাঁড়ি মাজা, পুকুর থেকে জল আনা। কিন্তু দারুণ দুঃখদুর্দৈব সত্ত্বেও পরস্পরের

প্রতি কি ভালোবাসা! কি অপার্থিব আকর্ষণ!

কারু থেকে একবিন্দু সাহায্য নেবনা এই তখন পণ সকলের। অনিকেত ও স্থিরমতি হয়ে থাকব। সাধু ও সাপ পরের গর্তে বাস করে, নিজেদের জন্যে কোনো গৃহ নেই, আশ্রয় নেই, আসক্তি নেই। আমরাও তেমনি নিরাশী, নির্মম, জ্বরশূন্য।

হীরানন্দ এসেছে, সিন্ধু প্রদেশে হায়দ্রাবাদে বাড়ি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তেরা বরানগরে মঠ করেছে খবর পেয়ে খুঁজতে-খুঁজতে এসেছে এখানে। কেশব সেনের বাড়িতেই প্রথম দেখে ঠাকুরকে আর সেই থেকে ঠাকুরেই মনপ্রাণ।

জিগগেস করল, 'আপনাদের চলে কি করে?'

'সকলে মুষ্টি ভিক্ষে করে নিয়ে আসে তাইতেই চলে যায় একরকম।' বললে নরেন।

হীরানন্দ পকেট হাতড়িয়ে দেখল ছ আনা পয়সা আছে। বললে, 'এই পয়সায় এবেলা চলুক।'

'না, না, পয়সার দরকার নেই। এবেলার মত চাল আছে। আর আছে তেলাকুচো পাতা। তাই দিয়ে নুন লঙ্কা মিশিয়ে অপূর্ব ঝোল হবে। তুমি আজ থেকে যাও হীরানন্দ। জল খাবার কিন্তু একটিমাত্র ঘটি।'

লোভ সামলাতে পারলনা হীরানন্দ। থেকে গেল সেবেলা।

ছ আনায় কি হবে? বাড়ি নিয়ে নরেনের আবার মোকদ্দমার খরচ। শরীরের উপর আবার মনের যন্ত্রণা। একদিকে ঈশ্বর আরেকদিকে মা ভাই বোন। একদিকে মঠ আরেকদিকে মা ভাই বোনের মাথা গোঁজবার ঠাঁই। উভয় সঙ্কট। এই সংগ্রামে কে পারে নিরপেক্ষ থাকতে? নরেন পারে।

কিন্তু টাকা কই?

শরৎ আর শশী বললে, 'ভাই আমরা এক কাজ করি। আমরা গিয়ে স্কুলের মাস্টারি নিই। যদি কিছু পাই মাইনেবাবদ তা যাবে না হয় তোমার মামলার খরচে। কিছু অন্তত উপকারে আসতে পারি তোমার।'

নরেন বললে, 'তোরা আমার জন্যে প্রাণ দিতে পারিস তা কি আমি জানিনা? কিন্তু আমার জন্যে টাকা রোজগার করতে যাবি এ পারবনা সইতে।' বলেই হাঁক দিল যোগেনকে : 'ওরে যোগে, আমার ঠিকুজি দেখবি? কি আছে জানিস? তাম্রবর্ণ কেশ হবে, ভস্মমাখা দেহ হবে, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে বেড়াব, আর—'

'আর?'

'উন্মাদ হয়ে যাব। যা হবার হোকগে। মরণের যেন বড় ভয়-ডর রাখি!'

রাখালের বাপ হারান ঘোষ এসেছে সেবার মঠে। গুপ্ত মহারাজ, মানে সদানন্দ স্বামী তাঁকে খুব সম্মান করে বসাল। বললে, 'আপনার ছেলে তো সাধু হয়েছেন, আপনি কেন হননা?'

'ওরে বাবা', ভয়ে আঁতকে উঠলেন হারান। 'বললেন, 'আমি সাধু হব কি! আমি ঘোর বিভবশালী, আরাম-বিরামের ডিপো। আমাকে তেল মাখিয়ে দেবে কে? আমাকে তামাক সেজে দেবে কে? কে দেবে আমার গা টিপে? তারপর তোমাদের

মত এসব কচু-ঘেঁচু খেতে পারব? বাবা, পালাই, চোখের উপর তোমাদের এই কষ্ট দেখতেও বুক ফেটে যায়।' তাড়াতাড়ি রওনা হলেন হারান ঘোষ।

সবাই বললে, 'দাঁড়ান, একটা গাড়ি ডাকিয়ে দি।'

'দরকার নেই, পায়ে হেঁটেই চলে যাব। ছেলের হালচালটা একটু দেখতে এসেছিলাম, এসে হালে আর পানি পাচ্ছিনা। তোমরা এত কঠোর সাধনা করছ আর আমি সামান্য পথ পায়ে হেঁটে যেতে পারবনা?'

তখন বরানগর বাজার থেকে গরানহাটার চৌমাথার গাড়িভাড়া এক আনা, আর যদি গাড়ির ছাদে বসে যাও, তা হলে তিন পয়সা।

একদিন অমনি কোচবাক্সে চড়ে যাচ্ছে নরেন। খালি পা, ময়লা কাপড়, কোঁচা খুলে গায়ে জড়ানো, ছন্নছাড়ার মত দেখতে, কিন্তু দিব্য দীপ্তিতে স্নান করা। বাগবাজারের পোলের কাছে গিরিশ ঘোষের ভাই অতুলের সঙ্গে দেখা।

নরেনের পোশাক দেখে চমকে উঠল অতুল। 'এ কি, কি হল?'

নরেন বললে, 'আমার মা মারা গেছে।'

'বলো কি? কবে? কি অসুখ করেছিল?'

'আমার মা নয়, আমার মায়া মরে গেছে।' নরেন হেসে উঠল : 'যে মায়ার বন্ধন কাটিয়ে ফেলতে পেরেছে তার পথইবা কি, বিপথই বা কি। কি তার নিয়ম কি বা তার বারণ?'

সে কি কথা! এই সেদিনের ডেঁপো ইয়ার, দিব্যি বড় লোকের ছেলে, উকিল হতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার এই তীব্র বৈরাগ্য? এত তীব্র যে দিকবিদিক হুঁশ নেই। খালি পায়ে খালি গায়ে গাড়ির কোচবাক্সে চড়ে চলেছে। দুজনেই তো যেতুম ঠাকুরের কাছে। হঠাৎ ওর এই অবস্থা আর আমি কিনা সামান্য এক হাইকোর্টের উকিল। কিন্তু কি করব, তিনি যেমন করান তেমনি করি। নরেনকে দিয়ে নরেনের কাজ, আমাকে দিয়ে আমার। আমি তো আর নরেন নই!

শরীরে আর সহ্য হচ্ছেনা বৈরাগ্য, বহন করা যাচ্ছেনা আর কষ্টের গন্ধমাদন। অনেকেরই মুখ ম্লান হয়ে উঠেছে। তার উপর বাড়ি থেকে আসছে নানান সুরের অনুনয়বিনয়। নানান আরামের প্রলোভন। কেউ-কেউ ভাবলে ফিরে যাই, হ্রস্ব পরিমিত জীবনেই নিজের আয়তন খুঁজি। এখানে নিরবয়ব নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছাড়া আর কী প্রাপ্তি, কী ভবিষ্যৎ? প্রাণহীন, প্রতিধ্বনিহীন স্তব্ধতার সমুদ্রই কি ঈশ্বর? কী হচ্ছে দিবারাত্র এই দুঃসহ কষ্টের বোঝা টেনে, অনাহারে অনিদ্রায় নিরুত্থান আসনে বসে জপধ্যান করে? দ্বার কি কখনো খোলে? খোলে তো তার কত দেরি?

শশী বললে, 'নরেন, আর তো পারিনা সইতে। এ তুমি কোথায় সকলকে নিয়ে এলে, কোন শোকাবহ মৃত্যুর গহ্বরে?'

নরেনের মুখ মেঘাক্রান্ত আকাশের মত গম্ভীর। বললে, 'শশী, একখানা বাইবেল দে।'

শশী বাইবেল এনে দিল।

বাইবেলটা খুলেই সহসা এক জায়গায় আঙুল রাখল নরেন। বললে, 'পড়, কি আছে এখানটায়?'

শশী পড়ল : 'লাঙলে একবার হাত দিয়ে আর পিছন ফিরে তাকানো চলবেনা। লাঙলে হাত দিয়েও যে পিছন ফিরে তাকায় তার ফসল হয়না।'

'কী বলতেন ঠাকুর?' লাফিয়ে উঠল নরেন : 'বলতেন, যে খানদানী চাষা শত অজন্মা হলেও সে চাষ ছাড়েনা। এক ক্ষেপ বৃষ্টি হয়নি বলেই তোরা চাষবাস বন্ধ করে দিয়ে দোকানপাট করবি? এক ডুবে রত্ন না পেলেই কি বলবি সমুদ্রে রত্ন নেই?'

সেই বজ্রভরা আশার মন্ত্রে সবাই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

'কি হয় এক জন্ম যদি এমনি দরজায় করাঘাত করতে-করতেই কেটে যায়, দেয়ালে মাথা কুটতে-কুটতে? কত জন্ম গিয়েছে এর আগে, না হয় আরো একটা গেল। সংকল্পের ধনেই আমরা বিত্তবান, আরেকটা জন্মের অপব্যয়ে কি এমন এসে যাবে আমাদের? ডুব যখন দিয়েইছি তখন দেখেই যাইনা কোথায় সেই তল-অতল রসাতল!'

অভয়মন্ত্রের, আশ্বাসমন্ত্রের প্রতিমূর্তি নরেনের দিকে সবাই তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

'নে, পড় পড় আবার এ জায়গাটা।' বাইবেলের আরেক পৃষ্ঠা খুলে ধরল নরেন : 'সমস্ত জগৎ যদি লুপ্ত হয়েও যায় তবু আমি আমার পথ ছাড়বনা। সমস্ত পরাভূত মানুষ যদি তার আত্মসুখের বিবরে গিয়েও আশ্রয় নেয়, আমি একা সন্ন্যাসী হয়ে থাকব।'

'তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও।' সবাই বলে উঠল একবাক্যে।

'কি, বৃষ্টি হয়নি সত্ত্বেও আরেকবার চাষ করবি', হাসল নরেন : 'না দোকান দিবি?'

'দ্বিতীয়বার চাষ করব।'

'সহস্রবার চাষ করব। পাথর বিদীর্ণ করে ফোটাব তৃণাঙ্কুর।'

ডেকে দাঁড়িয়ে স্বামীজি তাকাল তটভূমির দিকে, তার ভারতবর্ষের তটভূমি। তার মহিমময় ভারতবর্ষ, তার পরাধীন পরপদপীড়িত ভারতবর্ষ। একদিকে সে কত ধনী আবার আরেকদিকে সে কত দুঃস্থ কত দুর্গত। একদিকে সে কত উজ্জ্বল, আরেকদিকে সে কত নির্জীব। মাথায় তার সোনার মুকুট পায়ে তার দাসত্বের শৃঙ্খল। ভারতবর্ষ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছেনা স্বামীজি। ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাই তার একমাত্র স্বপ্ন।

আমি কি পারব? প্রভু কি আমাকে এ সাধনের যোগ্য করে তুলবেন?

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

প্রথম খণ্ড লিখতে নিম্নলিখিত পুস্তকাবলীর উপর নির্ভর করেছি :

শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
স্বামী সারদানন্দকৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ
প্রমথনাথ বসু লিখিত স্বামী বিবেকানন্দ
মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত শ্রীমৎ বিবেকানন্দস্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী
The Life of Swami Vivekananda (Advaita Ashrama)
স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী
স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থনিচয়
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকৃত স্বামীশিষ্যসংবাদ

3.12.58